বাক্যার্থবোধের স্বরূপ ঃ ন্যায় ও বৈশেষিক মতের পর্যালোচনা

গবেষক

শ্রীমতী মন্দিরা ঘোষ

পি এইচ. ডি রিসার্চ স্কলার

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: AOOPH1100416

দর্শন বিভাগ (কলা সংসদ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে পিএইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ড. রত্না দত্ত শর্মা

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

"বাক্যার্থবোধের স্বরূপ ঃ ন্যায় ও বৈশেষিক মতের পর্যালোচনা" submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of **Dr. Ratna Dutta Sharma**, Professor (Retired), Department of Philosophy, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Ratna Dutta Sharma

Supervisor: Dr. Ratna Dutta Sharma

Dated: 8.1.2024

Professor (Retired)

Department of Philosophy

Jadavpur University

Mandira Ghosh

Candidate: Smt. Mandira Ghosh

Dated: 08.01.2024

Scanned with CamScanner

মুখবন্ধ

এই গবেষণা নিবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত হল। আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের বলাবল বিচার। এই গবেষণা নিবন্ধটি রচনার একটি প্রেক্ষিত রয়েছে। দর্শন বিভাগে পঠনরত অবস্থায় দর্শনের ছাত্রী হিসাবে ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলির নানা তত্ত্ব আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো। পূর্বপক্ষের উপস্থাপনাপূর্বক স্বীয় যুক্তিজাল বিস্তারের দ্বারা পরমত খণ্ডন এবং স্বমত প্রতিষ্ঠা – ভারতীয় দর্শন আলোচনার এই বিশেষ রীতি বা পদ্ধতির দ্বারা আমি বিশেষভাবে প্রভাবিত হই। প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে বিবিধ মতপার্থক্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন বিভিন্ন সময় আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যেত। যেমন, ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতসাম্য থাকলেও প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে মতপার্থক্য স্পষ্ট। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ ভেদে চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করলেও বৈশেষিকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদে দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। বৈশেষিকমতে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত শব্দ প্রমাণ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন বৈশেষিকগণ শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দেননি – এই বিষয়ে আমার মনে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বাক্যার্থবোধের স্বরূপ কিভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে আমি তা অনুসন্ধানের প্রয়াস চালিয়েছি। এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন আমার মধ্যে জেগেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে, সাধারণতঃ বর্ণ, পদ, বাক্য সকলেই শব্দ পদবাচ্য। এদের সকলকেই কি শব্দ প্রমাণরূপে গণ্য করা হয়? কিন্তু ভারতীয় দর্শনে শব্দ প্রমাণের কথা বলা হয় তখন বাক্য বিশেষকেই বোঝানো হয়ে থাকে। প্রশ্ন থেকে যায় কেন বাক্যকেই শব্দ প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়, সেই বাক্যের বিশেষত্ব কী? এই শব্দ – লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ। বাক্য থেকে বাক্যার্থবোধ তথা, পদার্থসংসর্গবোধ বা শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। সেই বাক্যার্থবোধ যে প্রমাত্মক হতে পারে – এই কথা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত। শব্দকে প্রমাণরূপে অস্বীকার করা বেদ প্রামাণ্যবাদী বৈশেষিক পক্ষে অসম্ভব। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কি তাঁরা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন কিন্তু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন? ভারতীয় দর্শনে এইরূপ মতের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় আছে। কিন্তু লৌকিক বাক্যকে প্রমাণরূপে অস্বীকার করার অবকাশ কি তাঁদের পক্ষে আছে? বাক্য শ্রবণ করে যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় তথা ঐ বোধ যে প্রমাত্মকও হয় এই বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনই সহমত। কিন্তু ন্যায় দর্শনে শব্দ স্বতন্ত্র প্রমা তথা শব্দ অতিরিক্ত প্রমাণ রূপে স্বীকৃত হলেও বৈশেষিক দর্শনে তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে বৈশেষিকগণ কি কারণে শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলেন না? তাঁদের মতের পক্ষে তাঁরা কীরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন? নৈয়ায়িকও অবশ্যই তাঁদের মত সমর্থনের জন্য নিজ পক্ষে বিভিন্ন যুক্তির

অবতারণা করেন। সেই যুক্তিগুলি কি এবং সেগুলি কতোটা সমর্থনযোগ্য তা জানার বিষয়। উভয়ের পক্ষেই বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিষয়ে উভয়ের খণ্ডনের প্রক্রিয়া কীরূপ সেবিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এই উভয় মতের মধ্যে কোন্ পক্ষটি গ্রহণযোগ্য – এটি একটি অনুসন্ধানের বিষয় বলে আমার মনে হয়েছে এবং সেই কারণে এটিকে আমি আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমেই আমি বোঝার চেষ্টা করেছি বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের মূল বক্তব্য এবং তাদের মধ্যে ঠিক কোন্ অংশে মতপার্থক্য রয়েছে। এই বিষয় আমি ভূমিকা হিসাবে উল্লেখ করেছি। কারণ, আমার গবেষণাপত্রে আমি আলোচনাকে কিভাবে বিন্যস্ত করেছি তার আভাসও দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই অংশের আলোচনাতে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার গবেষণা প্রবন্ধ রচনার এই সীমিত সামর্থ্য নিয়ে উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে আমি এই বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করার প্রয়াস চালিয়ে যাব, এই আশা রাখছি।

এই গবেষণা প্রবন্ধের আলোচনা আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ড: রত্না দত্ত শর্মার অধীনে থেকে সম্পূর্ণ করেছি। তিনি আমার গবেষণাপত্র প্রস্তুত করতে আমাকে নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি সর্বদাই আমার চিন্তাভাবনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করানোর পথ প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের

অন্যান্য সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দের প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, তাঁদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছে। মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজের শ্রদ্ধেয়া অধ্যক্ষা ড. সীমা চক্রবর্ত্তী মহাশয়া সহ উক্ত মহাবিদ্যালয়ের আমার সকল সহকর্মী তথা সহমর্মী ব্যক্তিবর্গ আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে তাঁদের প্রতি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও আমি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও দর্শন বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দকে, যাঁদের সহযোগিতায় আমি আমার প্রয়োজনীয় অসংখ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করার সুযোগ লাভ করেছি।

যাঁদের আশীর্বাদ সর্বদা আমার সাথে থাকায় আজ আমি এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করতে সমর্থ হয়েছি আমার সেই স্বর্গীয় পিতা, মাতা, মামণি (মাসী), ও শ্বশ্রুমাতার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। আমার পরমশ্রদ্ধেয় মেসোমশাই শ্রী দুলাল দত্ত, শ্বশুর মশাই শ্রী সন্তোষ কুমার মণ্ডল ও আমার স্বামী শ্রী গোপীনাথ মণ্ডল যাঁরা সর্বদা আমার পাশে থেকে আমার মধ্যে অফুরন্ত মনোবল সঞ্চার করে গেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বিনম্র চিত্তে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। সেইসঙ্গে আমি প্রণাম জানাই আমার পরিবারের অন্যান্য গুরুজনদের। আমার জীবনের সেই সকল হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যাঁরা প্রত্যেক মুহূর্তে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমার চলার পথকে সুগম করতে আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয়া শ্রীমন্তী দত্ত শর্মা মহাশয়াকে যিনি গবেষণাপত্রের রচনায়

বিভিন্নভাবে সাহায্য করে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পরিশেষে যার কথা উল্লেখ না করলে আমার এই মুখবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, আমার স্নেহের সেই ছোট্ট কন্যারত্নটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। যখন অধ্যয়ন, অধ্যপনা, পেশাগত ও সাংসারিক নানান দায়িত্ব পালনের পর দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বিবিধ ক্লেশে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, আত্মপ্রত্যয় তলানিতে এসে ঠেকেছে, ঠিক তখনই আমার অন্বীক্ষা তার আধো আধো বুলিতে আমাকে নতুন করে সজীবতার রসে সিঞ্চিত করেছে, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলে আগামী দিনের প্রস্তুতি নিতে।

সর্বোপরি, একথা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই যে, ভাষার দীনতা এবং রচনাবিন্যাসগত ত্রুটি যদি আমার প্রবন্ধপত্রে বিদ্যমান থাকে, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে মার্জনাপ্রার্থী। অতি অল্প সময়ে দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব উপস্থাপন করার মতো ধী-শক্তি আমার নেই, তবু আমি আমার সাধ্যমতো প্রয়াস চালিয়েছি। আমার এই প্রবন্ধপত্র কোনো একজন ব্যক্তির দর্শনঋদ্ধ মনকেও যদি স্পর্শ করতে পারে তবেই আমি আমার এই প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করবো। পরিশেষে, যাঁর ইচ্ছায় প্রস্তাবিত প্রবন্ধটি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, সেই পরমকল্যাণময় পরমেশ্বরের প্রতি আমার শত সহস্র প্রণাম নিবেদন করছি।

বিনীতা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৭০০০৩২

(মন্দিরা ঘোষ)

সূচীপত্র

মুখবন্ধ...i

প্রথম অধ্যায় ১

ভূমিকা ১

ন্যায় ও বৈশেষিক মতানুসারে বাক্যার্থবোধের স্বরূপ...................................১

দ্বিতীয় অধ্যায় ১০

অনুমানের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মত...................................১০

তৃতীয় অধ্যায় ৬৪

ন্যায়মতে অনুমান... ৬৪

চতুর্থ অধ্যায়...৯৪

ন্যায়সম্মত শব্দ প্রমাণ...৯৪

পঞ্চম অধ্যায়...১২২

পদপক্ষক অনুমান ও তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তি...................................১২২

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৬৫

পদার্থপক্ষক অনুমান ও তার খণ্ডন... ১৬৫

সপ্তম অধ্যায়... ১৮২

বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়মতের পক্ষে সাধক যুক্তি............................ ১৮২

উপসংহার... ১৯৬

গ্রন্থপঞ্জী... ২০০

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ন্যায় ও বৈশেষিক মতানুসারে বাক্যার্থবোধের স্বরূপ

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় সমানতন্ত্ররূপে স্বীকৃত হলেও তাদের মধ্যে যে যে বিষয়ে মতপার্থক্য আছে তার মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা অন্যতম। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ – এই চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে।[১] অপরপক্ষে, বৈশেষিক দর্শনে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদে দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে।[২] শব্দকে নৈয়ায়িক অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও

---

[১] "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।। ১/১/৩ ।।" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা:।

[২] (ক) বিভিন্ন কণাদসূত্রের মাধ্যমে এটি সূচিত হয়েছে, যেমন: –

"সংশয়নির্ণয়ান্তরাভাবশ্চ জ্ঞানান্তরত্বে হেতুঃ।।

তয়োর্নিষ্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্।। ১০/১/২ – ১০/১/৩।।" – মহর্ষি কণাদ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, *বৈশেষিক - দর্শনম্,* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদক), কলিকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, পৃষ্ঠা: ১৮৫ – ১৮৬।

(খ) এছাড়া, বৈশেষিক সূত্রের উপর রচিত উপস্কারটীকাতেও অনুরূপ ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়, যথা: - "প্রমাণং দ্বিবিধং প্রত্যক্ষং লৈঙ্গিকঞ্চেতি যদ্বিভক্তং তত্র লৈঙ্গিকমিদানীং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে – অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্ ।। ৯/২/১।।" – শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার,* নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৪৮৫।

সাধারণতঃ বৈশেষিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দেননি।[৩] শব্দ বা বাক্য শ্রবণ জন্য বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান যে প্রমাও হতে পারে এই বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই। কিন্তু ন্যায়মতে শাব্দ বুদ্ধি একটি স্বতন্ত্র প্রমা। অপরপক্ষে, বৈশেষিক মতে শাব্দ বুদ্ধি অনুমিতিরূপ প্রমার অন্তর্ভুক্ত, তদতিরিক্ত প্রমা নয়।[৪] ফলস্বরূপ শব্দকে তাঁরা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করেননি, তাকে অনুমানের অন্তর্গতরূপে স্বীকার করেছেন।[৫] এখানেই উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ।

সাধারণতঃ বর্ণ, পদ, বাক্য সকলেই শব্দ পদবাচ্য। কিন্তু যখন ভারতীয় দর্শনে শব্দ প্রমাণের কথা বলা হয় তখন বাক্য বিশেষকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কারণ বিশিষ্ট অর্থের অবধারণ যার থেকে হয় না তা "শব্দ প্রমাণ" রূপে পরিগণিত হয় না। ন্যায়মতে বিশেষ প্রকার বাক্য থেকে বিশিষ্ট অর্থের প্রমাত্মক বোধ উৎপন্ন হয়। সেই কারণে ঐ

---

[৩] যদিও নব্যবৈশেষিক ব্যোমশিবাচার্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী; তিনি তাঁর ব্যোমবতী গ্রন্থে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেছেন। কোনও কোনও বৈশেষিক দার্শনিক এমনকি কণাদ স্বয়ং শব্দ প্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দিতে চাননি –এই পক্ষ সন্দিগ্ধ বলে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মনে করেন।

- কবিরাজ, গোপীনাথ, ১৯৮২, দ্য হিস্টোরি অফ বিবলিওগ্রাফি অফ ন্যায় বৈশেষিক লিটরেচার, বারণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, পৃষ্ঠা: ২২।

[৪] মিশ্র, শ্যামাপদ, ২০০৯, "শাব্দবোধের প্রমান্তরত্বসিদ্ধি" ইন *ধর্মনীতি ও শ্রুতি*, ইন্দ্রাণী সান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা (সম্পাদিত), কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ১২৭।

[৫] উক্তযুক্ত্যা প্রমাণমপি শব্দমনুমানেঽন্তর্ভাবয়ন্ বৈশেষিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। – রুচিদত্তমিশ্র, ১৯৯১, *শব্দচিন্তামণি প্রকাশ, অন দ্য শব্দখণ্ড অফ তত্ত্বচিন্তামণি*, বাই গঙ্গেশ উপাধ্যায়, সুখরঞ্জন সাহা অ্যান্ড পি. কে. মুখোপাধ্যায় (এডিটেড), ক্যালকাটা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবোরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ২।

বিশেষ প্রকার বাক্যকেই শব্দ প্রমাণ বলা হয়।[৬] এই শব্দ – লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ। বাক্য থেকে বাক্যার্থবোধ অর্থাৎ পদার্থসংসর্গবোধ বা, শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। সেই বাক্যার্থবোধ যে প্রমাত্মক হতে পারে – এই কথা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত। শব্দকে প্রমাণরূপে অস্বীকার করা বেদ প্রামাণ্যবাদী বৈশেষিকের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কি তাঁরা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন কিন্তু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন? এই পক্ষও সম্ভব নয়। কারণ লৌকিক বাক্যকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করলে দৈনন্দিন ব্যবহার অসম্ভব। সেই কারণে শাব্দবোধের প্রমাত্ব তথা প্রামাণ্য ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত। কিন্তু ন্যায় দর্শনে শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে স্বীকৃত হলেও বৈশেষিক দর্শনে তা নয়।

প্রমাণ হতে গেলে তাকে প্রমার জনক হতে হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রমাণ হতে গেলে তাকে স্বতন্ত্র প্রমার জনক হতে হয়। শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে গণ্য করা যায় যদি তা প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন শাব্দবোধের জনক হয়। বৈশেষিক মতে শব্দ অনুমিতি অতিরিক্ত শাব্দবোধের জনক নয়।[৭] কারণ শব্দ যে প্রক্রিয়াতে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করে তা

---

[৬] "বাক্যাভাব প্রাপ্তস্য সার্থকস্যাববোধতঃ।

সমপদ্যতে শাব্দবোধো ন তন্মাত্রস্য বোধতঃ।।১২।।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, শব্দশক্তি প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, , মধুসুদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ১৪১।

[৭] "প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকব্যাখ্যানেন শাব্দং ব্যাখ্যাতমিতি। যদ্বৈ প্রত্যক্ষেণোপলভতে লিঙ্গাঞ্চানুমিনোতি পরানেতদ্বোধয়িতুং ভূতদয়য়া শব্দং প্রযুঞ্জেম। শব্দাঞ্চ যোঽর্থঃ প্রতীয়তে সোঽয়ং প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামবগতইতি শব্দান্ প্রতীয়মানোঽর্থে প্রত্যক্ষমনুমানং বা প্রমাণং ন শব্দঃ।" – চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ১৮৮৭, *কণাদমহর্ষি-প্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্যসমেতম্,* কলিকাতা: সেরপুরনিবাসী শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা: ২৮০।

অনুমান প্রক্রিয়ার থেকে অভিন্ন। অনুমান যে প্রক্রিয়াতে উৎপন্ন হয় শব্দও সেই প্রক্রিয়াতেই বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করায়, উৎপন্ন প্রমাটি অনুমিতি স্বরূপ।[৮] অনুমিতি ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনে স্বীকৃত প্রমা। সেই কারণে শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে অনুমিতি রূপে গণ্য করলে লাঘব পক্ষ অবলম্বিত হয়; তাকে অতিরিক্ত প্রমা রূপে স্বীকার করলে বরঞ্চ লাঘব পক্ষ ব্যাহত হয়।[৯] শব্দ জন্য উৎপন্ন যে জ্ঞান তা অনুমিতি স্বরূপ হওয়ায়, তাতে অনুমিতিত্বই স্বীকার্য এবং এই অনুমিতিত্ব ঐ জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর উৎপন্ন অনুব্যবসায়ে উক্ত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যরূপে ভাসমান হয়। তাই উক্ত জ্ঞানের বিশিষ্টতা সূচনা করে। বৈশেষিক মতে শব্দ জন্য উৎপন্ন জ্ঞান অতিরিক্ত শাব্দবোধ স্বরূপ না হওয়ায় শাব্দত্বকে জাতি বলে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র শব্দ হেতু উৎপন্ন হয় বলেই যদি তাকে অতিরিক্ত শাব্দবোধ বলে স্বীকার করতে হয় তবে জ্ঞানের অপরাপর অন্য প্রকারভেদও স্বীকার করতে হয়। যেমন আকার, ইঙ্গিত থেকেও তো জ্ঞান জন্মায়, তাদেরও কি আমরা স্বতন্ত্র বোধ বলে স্বীকার করি? তা যখন করি না, তখন শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার্য নয়। সুতরাং শাব্দবোধ স্বতন্ত্র প্রমা

---

[৮] "শব্দাদিনামনুমানেহন্তর্ভাবোহনুমানাব্যতিরেকিত্বম্, সমানবিধিত্বাৎ সমানপ্রবৃত্তিপ্রকারত্বাৎ।" – শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদাচার্যকৃত প্রশস্তপাদভাষ্যম্ [পদার্থধর্মসংগ্রহ] ন্যায়কন্দলী টীকাসহিত*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫১২।

[৯] "অথ পদার্থস্মরণানন্তরং তেষাং মিথ সংসর্গাবগাহি যদৃ জ্ঞানং জায়তে, তদিদং কিমনুমিতিবিলক্ষণম্ উত তদ্রূপমেবেতি বিবাদঃ। তত্রাতিরিক্তকল্পনে মানাভাবাদনুমিতিরিত্যেবব্রূমঃ।" – উত্তমূর শ্রীবীররাঘবাচার্য্য, ১৯৫৮, *কণাদমুনিপ্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ শ্রীবীররাঘবাচার্য্যবিরচিত রসায়ন টীকাসহ*, ম্যাড্রাস: শ্রীবৎস প্রেস, পৃষ্ঠা: ২৮০।

নয়, তাই শব্দ প্রমাণও স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।[১০] কিন্তু বাক্যার্থবোধ যে অনুমিতিই এই বিষয়টির নিশ্চায়ক কে? বৈশেষিক মতে শব্দ শ্রবণ হেতুক উৎপন্ন জ্ঞানের অনন্তর "অহং অনুমিনোমি" – এই আকারের অনুব্যবসায়ই তার নির্ধারক। অপরপক্ষে, নৈয়ায়িক মতে বাক্যার্থবোধ যে অতিরিক্ত শাব্দবোধই এই বিষয়ে প্রমাণ উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তির অনন্তর "অহং শাব্দয়ামি" – এই আকারের অনুব্যবসায়। এই আকারের অনুব্যবসায়ে বাক্য শ্রবণ জন্য উৎপন্ন জ্ঞানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে শাব্দত্ব প্রতিপন্ন হয়, যা অপরাপর জ্ঞান থেকে উক্ত জ্ঞানের বিশিষ্টতার সূচনা করে। কিন্তু অনুব্যবসায়কে যদি জ্ঞান স্বরূপের নির্ধারক বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে বাক্যার্থবোধকে বৈশেষিকমত অনুসরণপূর্বক অনুমিতি এবং নৈয়ায়িক মতানুসারে শাব্দবোধ বলে স্বীকার করতে হয়। ন্যায়মত অনুসরণ করে বলা যায়, শাব্দত্ব ও অনুমিতিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ কারণ একটি জ্ঞান একই সময়ে শাব্দ ও অনুমিতি উভয়ই হতে পারে না। তাহলে জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারক হিসাবে উভয় দর্শনে স্বীকৃত অনুব্যবসায়ের ভূমিকা কতটুকু – এই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়।

বৈশেষিক সম্মত অনুমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত না হলে শব্দ শ্রবণ হেতু উৎপন্ন বাক্যার্থবোধ অনুমান প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন হয় – এই বৈশেষিক মতের সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। সেই কারণে বৈশেষিক স্বীকৃত অনুমানের স্বরূপ আলোচনা করা

---

[১০] "অবশ্যমীদৃশঃ পন্থাঃ শব্দপ্রমাণান্তরবাদিভিরপ্যন্যত্রানুসর্তব্যঃ। অন্যথা বাচিকব্যাপারাত্মনঃ শব্দস্যেব চেষ্টায়া অপি মানান্তরত্বাপত্তিঃ।" – উত্তমূর শ্রীবীররাঘবাচার্য্য, ১৯৫৮, *কণাদমুনিপ্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ শ্রীবীররাঘবাচার্য্যবিরচিত রসায়ন টীকাসহ*, ম্যাড্রাস: শ্রীবৎস প্রেস, পৃষ্ঠা: ২৮৬।

প্রয়োজন। অপরপক্ষে, নৈয়ায়িক কি হেতু বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করেন না তার সম্যক বোধের জন্য নৈয়ায়িক সম্মত অনুমানের স্বরূপ পর্যালোচনাও একান্ত প্রয়োজন। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত অনুমানের স্বরূপ পর্যালোচনা উভয় দর্শনের মধ্যে এই বিষয়ে মতসাম্য ও মতপার্থক্য – উভয়ের উপলব্ধির পক্ষেও সহায়ক হবে। আবার, নৈয়ায়িকগণ কেন বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত শাব্দবোধরূপেই স্বীকার করেন তা বোঝার জন্য নৈয়ায়িক সম্মত শাব্দবোধের স্বরূপও আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। শব্দ শ্রবণ জন্য বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় – এই কথা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত হলেও শব্দ শ্রবণপূর্বক এই বাক্যার্থবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়ার কতটুকু অংশ উভয়মত সম্মত, কোন্ অংশেই বা তাদের মধ্যে প্রভেদ তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শব্দ শ্রবণ হেতুক যে বাক্যার্থবোধ জন্মে তার স্বরূপ উভয় দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্বীকৃত হওয়ায় এইকথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাদের মধ্যে বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের ভূমিকা অংশেও মতপার্থক্য আছে। নৈয়ায়িকসম্মত শাব্দবোধের স্বরূপ আলোচনা, বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের কীরূপ ভূমিকা নৈয়ায়িক স্বীকার করেন তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। শাব্দবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়া অনুমান উৎপত্তির প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র অথবা নয় তাও এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হবে। অনুমিতির কারণ, করণ যে শাব্দবোধের কারণ ও করণ থেকে ভিন্ন অথবা ভিন্ন নয় তাও প্রতিপন্ন হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে 'বাক্যার্থবোধ অনুমিতি' – একথা স্বীকার করলেও 'অনুমিতি মাত্রেই বাক্যরূপ শব্দ শ্রবণহেতু উৎপন্ন হয়' – এই কথা কি বৈশেষিকগণ স্বীকার

করেন? অবশ্যই নয়। কারণ স্বার্থানুমান স্থলের উল্লেখ করা যায় যা বৈশেষিক সম্মত এবং যার উৎপত্তিতে শব্দের কোনও ভূমিকাই নেই। আবার একথাও সত্য যে পরার্থানুমানও বৈশেষিক সম্মত। এইরূপ অনুমান প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব সমুদয় থেকে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ এই প্রকার অনুমানের উৎপত্তিতে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব সমুদয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রশ্ন থেকে যায়, বাক্যার্থের জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক – এই পক্ষ স্বীকারের জন্যই কি বৈশেষিকগণ পরার্থানুমিতিকে স্বীকার করেন?

অপরপক্ষে, নৈয়ায়িক কিন্তু বাক্যার্থেবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করেন না, সেই বাক্যার্থেবোধ লৌকিক বা বৈদিক বাক্য যার থেকেই উৎপন্ন হোক না কেন। এই বিষয়ে নৈয়ায়িক প্রদত্ত ব্যাখ্যা কিন্তু উভয় প্রকার বাক্য স্থলেই সাধারণ। অথচ, নৈয়ায়িকও তো পরার্থানুমিতি তথা ন্যায়সাধ্য অনুমানরূপ পরার্থানুমান স্বীকার করেছেন। নৈয়ায়িক সম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপও স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার দাবী রাখে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা উভয় দর্শনের মধ্যে পরার্থানুমানের স্বরূপ বিষয়ে মতসাম্য কতটুকু, আর কতটুকুই বা তাদের মধ্যে ভিন্নতা তা উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হবে। বৈশেষিক সম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপ আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারবো যে বাক্যার্থবোধকে অনুমিতি বলে স্বীকার করেন বলেই কি তারা পরার্থানুমানের অস্তিত্ব স্বীকার করছেন না বাক্যার্থবোধরূপ অনুমিতি এবং পরার্থানুমিতির মধ্যে স্বরূপগত প্রভেদ বর্তমান। একথা সত্য যে শুধুমাত্র পরার্থানুমানের স্বরূপ আলোচনাই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করবে না। আমাদের

বৈশেষিকসম্মত পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক অনুমানের স্বরূপ বিশ্লেষণও করা প্রয়োজন। কারণ বৈশেষিকগণ বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের কীরূপ ভূমিকা স্বীকার করেছেন তা বুঝতে গেলে তাদের স্বীকৃত পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক অনুমানের স্বরূপ আলোচনা করতে হবে। উভয়ের গ্রহণযোগ্যতাও বিচার করে দেখতে হবে। তবে এটুকু বোধগম্য হয় যে, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয়েই বাক্য প্রয়োগ থেকে বাক্যার্থবোধের উৎপত্তি স্বীকার করলেও বাক্যার্থবোধে শব্দের ভূমিকা অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বীকার করে থাকেন।

সামান্যতঃ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতি স্বীকার পক্ষে কি কি অসুবিধা আছে তা আলোচনাপূর্বক বৈশেষিক পক্ষ থেকে তার কোনও সমাধান প্রদান করা সম্ভব কি না তা আলোচনা করে দেখতে হবে। তবে বিরোধী পক্ষদ্বয়ের কোনও একটি পক্ষের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেও অপরপক্ষের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। উক্ত পক্ষ প্রতিষ্ঠার্থে সাধক যুক্তির পর্যালোচনাও সমভাবে প্রয়োজন। বাক্যার্থবোধ অনুমিতি স্বরূপ – এই পক্ষের বিরুদ্ধে সমালোচনাই অতিরিক্ত শাব্দবোধ স্বীকারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাক্যার্থবোধের শাব্দত্ব প্রতিষ্ঠা স্বতন্ত্র যুক্তির অপেক্ষা করে।

বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক উভয়েই বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে নিজমত সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। উপরন্তু উভয়পক্ষই বিরোধী পক্ষ খণ্ডন করেছেন। এ সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেই উভয় মতের বলাবল বিচার করতে হবে। সমস্ত

বিষয়টির পর্যালোচনা আমাদের যে যে গুরুত্বপূর্ণ দিকের নির্দেশ করে তাদের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে এই রচনাটি পরিসমাপ্ত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুমানের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মত

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বৈশেষিক সম্মত অনুমানের স্বরূপ আলোচনাপূর্বক অনুমিতির উৎপত্তি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করবো। এই আলোচনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে বৈশেষিক মতানুসারে বাক্যার্থবোধও কী অনুরূপ প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন হওয়ার জন্য তাঁরা বাক্যার্থবোধকে অনুমিত্যাত্মক বলে স্বীকার করেছেন? বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে বাক্যরূপ শব্দের ভূমিকাই বা তাঁদের মতে কি তা উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে।

(ক)

বৈশেষিক সম্মত অনুমান প্রমাণের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অনুমানের লক্ষণ পর্যালোচনা করা আবশ্যক। মহর্ষি কণাদ তাঁর 'বৈশেষিকসূত্র'-গ্রন্থে যোগি-প্রত্যক্ষের পরে অনুমানের আলোচনা করতে গিয়ে নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ সূত্রে বলেছেন — '*অস্যেদং কার্যং কারণং সম্বন্ধি একার্থসমবায়ি বিরোধি চেতি লৈঙ্গিকম্*'।[১] অর্থাৎ, কার্য, কারণ, সম্বন্ধি, একার্থসমবায়ি বা বিরোধী কোন হেতুর (লিঙ্গের) উপর ভিত্তি করে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে লৈঙ্গিক বা অনুমান বলে। এখানে 'অনুমান' শব্দটির দ্বারা অনুমান

---

[১] চন্দ্রানন্দ, ১৯৬১, *বৈশেষিকসূত্রবৃত্তি*, মুনি শ্রী জম্বুবিজয়জী (সম্পাদিত), বরদা: ওরিয়েন্টাল ইন্স্টিটুট বরদা, পৃষ্ঠা: ৬৯।

প্রমাণজন্য জ্ঞান তথা অনুমিতিকে বোঝানো হয়েছে, অনুমিতির করণকে নয়। তবে অনুমান প্রমাণজন্য উৎপন্ন অনুমিতিও ক্ষেত্র বিশেষে অনুমান প্রমাণরূপে গণ্য হতে পরে। সেক্ষেত্রে হানাদি বুদ্ধি হলো – গ্রাহ্যত্বাদি অনুমিতির অনুকূল প্রত্যক্ষ্যাত্মক পরামর্শ।[২] বৃত্তিকার চন্দ্রানন্দ আরো সুস্পষ্টভবে অনুমানের লক্ষণটি ব্যক্ত করতে গিয়ে

[২] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন জলের সাথে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ জন্মানোর পরক্ষণে যে প্রত্যক্ষ জন্মায়, ঐ প্রত্যক্ষের পরে আমরা যদি সেই সেই জলের উপাদান বা, গ্রহণ করি তাহলে তৎপূর্বে "এই জল গ্রাহ্য" – এইরূপ জ্ঞান আমাদের জন্মায় এই কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু কোন্ প্রমাণের দ্বারা আমাদের সেই জ্ঞান জন্মায় তা বুঝতে হবে। জল যখন ভাবী পদার্থ তখন তৎপূর্বে সেই গ্রহণযোগ্যতার লৌকিক প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অতএব অনুমান প্রমাণ দ্বারাই ঐ জ্ঞান জন্মায়, এটিই বুঝতে হবে। পূর্বে যে জলের গ্রহণপূর্বক আমরা উপকার লাভ করেছি, তাদৃশ জলমাত্রই গ্রাহ্য – এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য সংস্কারবশতঃ সেই ব্যাপ্তির স্মরণ হওয়ায় তার ফলে পরে এই জল তজ্জাতীয় অর্থাৎ গ্রাহ্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট তাদৃশ জলত্ব এই জলে আছে – এইরূপ অপর একটি প্রত্যক্ষ যে জন্মায় এটি স্বীকার করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উক্ত স্থলে গ্রাহ্যত্বের অনুমাপক "লিঙ্গপরামর্শ" নামক অনুমান প্রমাণ। তাদৃশ জলত্বই সেই অনুমানের লিঙ্গ বা হেতু। উক্ত "এই জল তজ্জাতীয়" রূপ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাই হল উক্ত স্থলে উপাদান বুদ্ধি। অনুরূপভাবে কোন জলে পূর্ব পরিত্যক্ত জলের সাদৃশ্য দর্শন করার পর পূর্ববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদি জন্য "এই জল তজ্জাতীয়" – এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মায় তা উক্ত স্থলে হান বুদ্ধি। এইরূপ হান বুদ্ধির দ্বারা সেই জলে হেয়ত্বের অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জলকে পরিত্যাগ করি। একইভাবে কোন জলে পূর্বে উপেক্ষিত জলের সাদৃশ্য দর্শন করলে পূর্ববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদি জন্য "এই জল তজ্জাতীয়" – এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জন্মায় তা হলো উপেক্ষা বুদ্ধি। তার দ্বারা সেই জলে উপেক্ষত্বের অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা তা উপেক্ষা করি।

পূর্বোক্ত প্রকার হান, উপাদান ও উপেক্ষা বুদ্ধি প্রত্যক্ষ স্থলে প্রত্যক্ষ রূপ প্রমিতি। সুতরাং তার করণ যে পূর্বোৎপন্ন নির্বিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, তা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তার ফল হল উক্ত রূপ হানাদি বুদ্ধি। তবে ঐ হানাদি বুদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমিতি হলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হতে পারে না কেননা, তার ফল যথাক্রমে হেয়ত্ব, গ্রাহ্যত্ব এবং উপেক্ষ্যত্বের অনুমিতি। যার ফল অনুমিতি তা অনুমান প্রমাণই হবে। কিন্তু উক্ত 'হানাদি বুদ্ধি' লিঙ্গ পরামর্শরূপ অনুমান প্রমাণ হলেও তা যখন প্রত্যক্ষ প্রমিতি, তখন তার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলতে হবে। তাই ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি বাৎস্যায়ন ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও হানাদি বুদ্ধি ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাচীন বৈশেষিক আচার্য প্রশস্তপাদের রচনাতেও প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় "অথবা" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা অনুরূপ কথাই ধ্বনীত হতে দেখা যায়। – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১ *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ৯১ – ৯২।

বলেছেন — '*লিঙ্গদর্শনাত্ সঞ্জায়মানো লৈঙ্গিকম্*'।[৩] অর্থাৎ, লিঙ্গদর্শন থেকে যা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয় তাকে লৈঙ্গিক বা অনুমান বলে। এখানে বলা আবশ্যক 'লিঙ্গদর্শন' শব্দের দ্বারা লিঙ্গের কেবল প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানকে বোঝায় এমন নয়, লিঙ্গের যে কোন প্রকার জ্ঞানকে বোঝায়। অর্থাৎ, 'দর্শন' শব্দের দ্বারা কেবল প্রত্যক্ষকে বোঝায় না, অনুভবকে বোঝায়। যদিও বৃত্তিকার, বা পদার্থধর্মসংগ্রহকার কণ্ঠতঃ এরূপ অর্থ করেননি। তবে ন্যায়কন্দলীকার পদার্থধর্মসংগ্রহকারের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে 'দর্শন' শব্দের অর্থ অনুভব করেছেন।

বৈশেষিকসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের অষ্টমসূত্রে বলা হয়েছে যে, ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব তথা ব্যাপ্তিজ্ঞানবান ব্যক্তির যদি অন্যত্র ব্যাপ্যের বা অন্যতম সম্বন্ধির অসন্দিগ্ধ বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির 'শেষ' অর্থাৎ অপর সম্বন্ধির বা ব্যাপক পদার্থ বিষয়ে যে পশ্চাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেটিই অনুমান। এই অনুমান জ্ঞানটি ব্যাপ্য তথা লিঙ্গদর্শনজন্য উৎপন্ন হওয়ায় একে লৈঙ্গিকও বলা হয়। প্রশ্ন হতে পারে, 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ কী? এর উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, 'লিঙ্গ্যতে গম্যতে অনেন অর্থঃ ইতি লিঙ্গম্'। লিঙ্গ্যতে মানে গম্যতে, অর্থাৎ জানিয়ে দেয় বা, জ্ঞাত হয়। এর দ্বারা অর্থটি জ্ঞাত হয় অর্থাৎ যার দ্বারা অর্থটি জানা যায় তাকে বলে লিঙ্গ। "লিঙ্গ" শব্দের আরেকভাবেও ব্যুৎপত্তি করা হয়, যথা: 'লীনম্ অর্থং গময়তি'। লীন অর্থাৎ পরোক্ষ অর্থটিকে যে জানিয়ে দেয় তাকে বলে লিঙ্গ। ধোঁয়া অপ্রত্যক্ষ আগুনকে

[৩] চন্দ্রানন্দ, ১৯৬১, *বৈশেষিকসূত্রবৃত্তি*, মুনি শ্রী জম্বুবিজয়জী (সম্পাদিত), বরদা: ওরিয়েন্টাল ইন্স্টিটুট বরদা, পৃষ্ঠা: ৬৯।

জানিয়ে দেয় বলে ধোঁয়াকে লিঙ্গ বলা হয়। লিঙ্গ শব্দের প্রতিশব্দ হলো গমক বা নিশ্চায়ক বা অনুমাপক।

প্রশস্তপাদভাষ্যে অনুমিতির লক্ষণ প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – "লিঙ্গদর্শনাত্ সঞ্জায়মানং লৈঙ্গিকম্।" অর্থাৎ, লিঙ্গ দর্শন থেকে সম্যগ্‌ভাবে যা উৎপন্ন হয় তাকে লৈঙ্গিক বা অনুমিতি বলে।[৪] উক্ত অনুমিতির করণ হল অনুমান। অনুমিতির উক্ত লক্ষণটি অনুধাবন করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে লিঙ্গ কাকে বলে? 'লিঙ্গদর্শন' বলতে কি বোঝায়? এবং 'লিঙ্গদর্শন থেকে সম্যগ্‌ভাবে যা উৎপন্ন হয়' বলতেই বা কী বোঝানো হয়েছে? লিঙ্গ বলতে বৈশেষিকগণ এমন একটি পদার্থকে বুঝিয়েছেন যার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে। তাঁদের মতে লিঙ্গ হল সেই পদার্থ যেটি অনুমেয়ে বা পক্ষে থাকে। সাধ্যের নিশ্চিত অধিকরণ বা সপক্ষে থাকে। সাধ্যের অভাব যেখানে নিশ্চিত সেই বিপক্ষে যার অভাব থাকে।[৫] অর্থাৎ, লিঙ্গের পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব এবং বিপক্ষাবৃত্তিত্বরূপ তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু পক্ষ, সপক্ষ এবং বিপক্ষের স্বরূপ না জানলে লিঙ্গের পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব এবং বিপক্ষাবৃত্তিত্বের স্বরূপ বোঝা সম্ভব নয়। অতএব পক্ষ, সপক্ষ এবং বিপক্ষ বলতে কি বোঝায় সেটা মোটামুটিভাবে জানা থাকলেও তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

---

[৪] প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, পদার্থধর্মসংগ্রহ, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৪৭৬।

[৫] "লিঙ্গং পুনঃ –

যদনুমেয়েন সম্বন্ধং প্রসিদ্ধং চ তদ্বিতে।

তদভাবে চ নাস্ত্যেব তল্লিঙ্গমনুমাপকম্।"

প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, পদার্থধর্মসংগ্রহ, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৪৭৮।

অনুমানস্থলে লিঙ্গের দ্বারা আমরা যেটিকে সিদ্ধ করতে চাই তাকে সাধ্য বলে। অন্য ভাষায়, অনুমিতির বিধেয়কে সাধ্য বলে। যেমন, ধূমের দ্বারা আমরা যখন বহ্নির অনুমান করি তখন বহ্নি হল সাধ্য। তবে অনুমানস্থলে কেবল সাধ্যের অনুমান আমরা করি না সাধ্যটিকে কোন একটি আশ্রয়ে আশ্রিতরূপে অনুমান করে থাকি। অর্থাৎ সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর অনুমান করে থাকি। যেমন, বহ্নি অনুমান কালে আমরা কেবল বহ্নির অনুমান করি না, বহ্নিটিকে কোন একটি আশ্রয়ে আশ্রিতরূপে অনুমান করে থাকি। যেমন, ধূম হেতুর দ্বারা আমরা পর্বতে বহ্নির অনুমান করে থাকি। হেতুর দ্বারা যে আশ্রয়ে আমরা বহ্নির অনুমান করি সেটিকে পক্ষ বলে। আলোচ্য স্থলে ধূম হেতুর দ্বারা আমরা যেহেতু পর্বতে বহ্নির অনুমান করি তাই পর্বত হল পক্ষ। হেতু হচ্ছে তাই যার ভিত্তিতে সাধ্যের অনুমান করি।[৬] যদিও আমরা হেতুর ভিত্তিতে সাধ্যের অনুমান করি এইরূপ বলে থাকি, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমরা হেতুর জ্ঞানের ভিত্তিতে সাধ্যের অনুমান করি। হেতুজ্ঞানকে অনুমান প্রমাণ বললে হেতুতেও কিন্তু অনুমান শব্দের প্রয়োগ হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে হেতুর জ্ঞান বলতে বৈশেষিক মতানুসারে হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান এবং হেতুর সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান উভয়কেই বোঝানো হয়ে থাকে। হেতুর সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান আবার হেতুর সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব জ্ঞানের উপরে নির্ভরশীল। সাধ্যের নিশ্চিত অধিকরণকে সপক্ষ বলে।

[৬] সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার, ২০০৭, *আচার্য ধর্মকীর্তি বিরচিত ন্যায়বিন্দু (আচার্য ধর্মোত্তরের ন্যায়বিন্দুটীকা সহ)*, কলকাতা: সদেশ, পৃষ্ঠা: ১৫৪ – ১৫৫।

যেমন, মহানসাদিতে বহ্নির অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়ায় মহানাসাদিকে সপক্ষ বলে। অপরদিকে যেখানে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় আছে সেটিকে বিপক্ষ বলে। যেমন, জলহ্রদাদিতে বহ্নির অভাব নিশ্চিত বলে জলহ্রদাদিকে বিপক্ষ বলা হয়। অতএব পর্বতে বহ্নির অনুমানের ক্ষেত্রে ধূমকে লিঙ্গরূপে গ্রহণ করতে হলে আমাদের দেখতে হবে ধূমটি পক্ষ অর্থাৎ পর্বতে বিদ্যমান কিনা। যদি ধূমটি পর্বতে না থাকে তাহলে ধূমকে লিঙ্গরূপে গ্রহণ করা যাবে না। ধূমরূপ লিঙ্গটি পর্বতে বা পক্ষে থাকলেই হবে না, লিঙ্গকে সপক্ষ মহানসাদিতেও থাকতে হবে এবং বিপক্ষ জলহ্রদাদিতে লিঙ্গের অভাব থাকতে হবে। সপক্ষে বর্তমান ও বিপক্ষে অবর্তমান হেতু সাধ্যের সঙ্গে ব্যাপ্তিসম্বন্ধযুক্ত।

প্রশ্ন হতে পারে লিঙ্গটির পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষাসত্ত্বরূপ ধর্ম থাকলেই কি সাধ্যের সাধক হতে পারে? উত্তরে বৈশেষিকগণ বলেন লিঙ্গের পক্ষসত্ত্বাদি বৈশিষ্ট্যগুলি স্বরূপতঃ থাকলেই হবে না, সেগুলির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ আমরা যদি জানি যে লিঙ্গের উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আছে তাহলেই আমরা উক্ত লিঙ্গের দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অনুমান করতে পারি, অন্যথায় নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, লিঙ্গের পক্ষসত্ত্বাদির জ্ঞান অনুমানের ক্ষেত্রে আবশ্যক কেন? পক্ষসত্ত্বরূপ বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান না থাকলে অর্থাৎ পক্ষে অভিমত হেতুর উপস্থিতির জ্ঞান না থাকলে সেই পক্ষে উক্ত হেতু কীরূপে সাধ্যের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করতে পারবে? ধূম নিজেই যদি পক্ষে অস্তিত্বশীল না হয় তবে তা পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না। পর্বতে ধূমের অস্তিত্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করতে গেলে ধূমকে পর্বতবৃত্তি রূপে জানতে হবে।

অপরদিকে সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্বরূপ বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানের ফলে লিঙ্গ ও সাধ্যের মধ্যে অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হয়ে থাকে। অর্থাৎ, উক্ত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হলে আমরা জানতে পারি লিঙ্গ সাধ্যের ব্যাপ্য এবং সাধ্যটি লিঙ্গের ব্যাপক। ব্যাপকে থাকে ব্যাপকতা ধর্ম। কোন একটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবচ্ছেদে ব্যাপক হতে পারে। যেমন, বহ্নি দ্রব্যত্ব ধর্ম বিশিষ্টরূপে যেমন হেতুর ব্যাপক হতে পারে অনুরূপভাবে বহ্নিত্ব ধর্মবিশিষ্টরূপেও হেতুর ব্যাপক হতে পারে। কিন্তু আলোচ্য স্থলে আমরা বহ্নিকে দ্রব্যত্ব ধর্ম বিশিষ্টরূপে নয়, বহ্নিত্ব ধর্মবিশিষ্টরূপে অনুমান করে থাকি। তাই বহ্নিত্ব হল ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম। ব্যাপ্য ধূম তার ব্যাপক বহ্নিরূপ সাধ্যের সঙ্গে ব্যাপ্তিসম্বন্ধযুক্তরূপে জ্ঞাত হয়ে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম বিশিষ্ট বহ্নির অনুমিতি উৎপন্ন করে। যা অনুমিতির হেতুরূপে কাজ করে তা কেবলমাত্র পক্ষবৃত্তিরূপেই পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে না অথবা, তার পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান মাত্র পক্ষে সাধ্যের অনুমানকে সম্ভব করে না। হেতু সাধ্য ধর্মের সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত রূপে জ্ঞাত হয়ে তা সাধ্যানুমান জন্মায়। ব্যাপ্য হেতু ব্যাপক সাধ্যের ব্যাপক রূপে অনুমান জন্মায়। কিন্তু বহ্নিত্ব ধর্ম পুরস্কারে বহ্নির জ্ঞান হওয়া বহ্নি বিষয়ক নির্দিষ্ট কর্ম উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বহ্নিত্ব ধর্ম বিশিষ্ট বহ্নির জ্ঞান সামান্য জ্ঞান। এইরূপ সামান্য জ্ঞান কর্মের প্রবর্তক হতে পারে না। কেবলমাত্র বিশেষ জ্ঞান যেমন – আলোচ্য স্থলে পর্বত বৃত্তি বহ্নির জ্ঞান বহ্নির আহরণাদি কর্মে প্রবৃত্ত করতে পারে। লিঙ্গ ও সাধ্যের মধ্যে এই ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান পক্ষে লিঙ্গ দর্শনজন্য পক্ষে সাধ্যের অনুমানে সহায়ক

হয়।[৭] সুতরাং, বৈশেষিকগণ লিঙ্গ বলতে পক্ষসত্ত্বাদি তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট লিঙ্গকে বুঝিয়েছেন। এই সমস্ত ধর্মযুক্ত লিঙ্গের জ্ঞানের ভিত্তিতে লিঙ্গীর জ্ঞান হচ্ছে অনুমান। অনুমিতি বোঝাতেও অনুমান শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করবো 'লিঙ্গদর্শন' বলতে বৈশেষিকগণ কি বোঝাতে চেয়েছেন। "দর্শন" শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষকে বোঝানো হয়। প্রশ্ন হবে, 'লিঙ্গদর্শন' বলতে কি বৈশেষিকগণ লিঙ্গের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানকে বোঝাতে চেয়েছেন? এর উত্তরে বলা যায় 'লিঙ্গদর্শন' বলতে বৈশেষিকগণ লিঙ্গের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানমাত্রকে বোঝাতে পারেন না। কারণ, বৈশেষিকগণ পরার্থানুমান স্বীকার করেন।[৮] স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে পক্ষে লিঙ্গের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সম্ভব হলেও পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানকর্তা সাক্ষাৎভাবে পক্ষে লিঙ্গকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানকর্তা বক্তার প্রযুক্ত বাক্য শ্রবণপূর্বক উক্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম বিশিষ্ট লিঙ্গের জ্ঞান লাভ করেন।[৯] এই কারণে বৈশেষিকগণ 'লিঙ্গদর্শন' শব্দের অন্তর্গত 'দর্শন' শব্দের দ্বারা উপলব্ধিকে বুঝিয়েছেন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে নয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে বোঝালে উক্ত লক্ষণের

---

৭ "যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরগ্ন্যভাবে ধূমো ন ভবতীতি। এবং প্রসিদ্ধসময়স্য প্রসিদ্ধাবিনাভাবস্য পুরুষস্যাসন্দিগ্ধধূমদর্শনাদ্ ধূম এবায়ম্, ন বাষ্পাদিকমিতি জ্ঞানাত্ সাহচর্যানুস্মরণাদ্ যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিত্যেবমনুস্মরণাত্, তদনন্তরমগ্ন্যনুমানং ভবতি।" – শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৪৯১।

৮ "পঞ্চাজবয়বেন বাক্যেন স্বনিশ্চিতার্থপ্রতিপাদনং পরার্থানুমানম্।" – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, পদার্থধর্মসংগ্রহ, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৫৮।

৯ "লিঙ্গদর্শনাত্ সঞ্জায়মানং লৈঙ্গিকম্।" – শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, ন্যায়কন্দলী, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৪৭৬।

বিরুদ্ধে অব্যাপ্তি দোষের আপত্তি উঠবে কেননা, “লিঙ্গদর্শনাত্ সঞ্জায়মানং লৈঙ্গিকম্” – এই বাক্যে প্রযুক্ত ‘দর্শন’ শব্দের অর্থ কেবল চক্ষু হতে উৎপন্ন জ্ঞানমাত্রই নয়, বরং সকল জ্ঞান বা, উপলব্ধিই তার (দ্বারা বোধ্যব্য) অর্থ হতে পারে; যেহেতু অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হেতু হতেও অনুমান (অনুমিতানুমান) হয়ে থাকে।[১০]

‘লিঙ্গদর্শন থেকে সম্যগ্ভাবে যেটি উৎপন্ন হয়’ বলতে লিঙ্গদর্শন থেকে সম্যগ্ভাবে উৎপন্ন যেকোন কিছুকে বোঝানো হয়নি। কারণ, লিঙ্গের উপলব্ধি থেকে অজ্ঞানাত্মক সংস্কারাদি পদার্থও উৎপন্ন হয়ে থাকে। লিঙ্গদর্শন থেকে সম্যগ্ভাবে উৎপন্ন যেকোন কিছুকে অনুমিতি বললে সংস্কারকেও অনুমিতি বলতে হয়। কিন্তু, সংস্কারকে অনুমিতি বলা যায় না। এই কারণে বৈশেষিকগণ বলেছেন বুদ্ধি প্রকরণে অনুমানের আলোচনায় ‘লিঙ্গদর্শন থেকে সম্যগ্ভাবে যেটি উৎপন্ন হয়’ বলতে বুদ্ধি বিশেষের উৎপত্তিকে গ্রহণ করতে হবে, বুদ্ধি বিশেষ ভিন্ন অন্য কিছুকে নয়। অতএব, বৈশেষিকমতে লিঙ্গের উপলব্ধি থেকে সম্যগ্ভাবে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেটিই অনুমিতি।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে বৈশেষিকমতে পক্ষে সাধ্যের অবিনাভাব সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গের উপস্থিতির জ্ঞান থেকে পক্ষে সাধ্যের উপস্থিতির জ্ঞানকে অনুমিতি বলে। উক্ত অনুমিতির করণ অনুমান প্রমাণ। পূর্বেই আমরা

---

[১০] “দর্শনশব্দ উপলব্ধিবচনো ন চাক্ষুষপ্রতীতিবচনঃ, অনুমিতানুমানস্যাপি সম্ভবাত্। লিঙ্গদর্শনাল্লিঙ্গবিষয়ঃ সংস্কারো ন জায়তে; কিন্তস্য ন পরিগ্রহঃ, বুদ্ধ্যধিকারেণ বিশেষিতত্বাৎ।” – শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, ন্যায়কন্দলী, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৪৭৬।

প্রশস্তপাদভাষ্যের উল্লেখ করেছি যেখানে বলা হচ্ছে যে অনুমান যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানের উপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয় শব্দের ক্ষেত্রেও তেমনি। শব্দ জন্য উৎপন্ন জ্ঞান হলো অনুমিতি। বৈশেষিক সম্মত অনুমানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত না হলে এই বক্তব্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পক্ষধর্মতাজ্ঞান হলো হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান। ব্যাপ্তিজ্ঞান বলতেও আমরা হেতুর সাধ্যের সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞানকে বুঝিয়ে থাকি। সুতরাং অনুমিতিকে আমরা এক অর্থে হেতুর জ্ঞান জন্য উৎপন্ন জ্ঞান বলতে পারি।

প্রশ্ন হল – বৈশেষিকগণ যখন বলেন শব্দ বা বাক্য শ্রবণ পূর্বক যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় তা অনুমিত্যাত্মক, তখন সেই বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে প্রযুক্ত শব্দের ভূমিকা কী? বৈশেষিকমতে অনুমিতির উৎপত্তিতে হেতুর যে ভূমিকা শাব্দবোধ বা, বাক্যার্থবোধ উৎপত্তিতে শব্দের ভূমিকাও অনুরূপ।[১১] বস্তুতঃ এই যুক্তির ভিত্তিতে বৈশেষিক দর্শনে বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আবার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াতেই হেতু জ্ঞান সাধ্যানুমিতি জন্মায় – এই কথা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেই প্রতিপন্ন হয়। অনুরূপ প্রক্রিয়াতেই শব্দ হেতুক বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হওয়াতে তার অনুমিতিত্ব হয় বলে বৈশেষিকগণ দাবী করেন। অনুমানস্থলে হেতুটি যে রূপে ও যে প্রক্রিয়ায়, সাধ্যের অনুমিতি উৎপত্তিতে সাহায্য করে শব্দও অনুরূপভাবে বাক্যার্থবোধ

---

[১১] "শব্দোঽনুমানং ব্যাপ্তিবলেনার্থপ্রতিপাদকত্বাদ্ ধূমবৎ। সমানবিধিত্বমেব দর্শয়তি – যথেতি।..." – শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদাচার্যকৃত প্রশস্তপাদভাষ্যম্ [পদার্থধর্মসংগ্রহ] ন্যায়কন্দলী টীকাসহিত*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫১২।

উৎপত্তিতে সাহায্য করে কি না – এই বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের বৈশেষিকসম্মত পদপক্ষক অনুমান ও পদার্থপক্ষক অনুমানের স্বরূপ আলোচনা করতে হবে। আমরা প্রসঙ্গক্রমে সেই আলোচনায় প্রবেশ করবো। অনুমানস্থলে হেতুর যেরূপ ভূমিকা বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দেরও অনুরূপ ভূমিকা – বৈশেষিকগণের এই অভিমত উপলব্ধি করতে হলে বৈশেষিকগণ সম্মত পদপক্ষক অনুমান ও পদার্থপক্ষক অনুমানের আলোচনা করতে হবে। আমরা জানি যে, এই অনুমানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বীকৃত হয়েছে।[১২] সেই আলোচনা আমরা পরবর্তী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে করবো। বাক্যার্থ জ্ঞানটি যে অনুমিত্যাত্মক তা কীরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব? বৈশেষিক মতে তা অনুব্যবসায় দ্বারা নিরূপণ করা সম্ভব। কারণ বাক্যার্থবোধের অনন্তর "অহং অনুমিনোমি" – এই আকারের অনুব্যবসায়ই বাক্যার্থবোধ যে অনুমিতি স্বরূপ তা জানায়। তার পূর্বে বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত পরার্থানুমানের স্বরূপ পর্যালোচনাপূর্বক উভয় দর্শনে স্বীকৃত পরার্থানুমানের কোন্ অংশে সাদৃশ্য, কোন্ অংশে বৈসাদৃশ্য তা অনুধাবনের চেষ্টা করবো। বৈশেষিক সম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপ বিশ্লেষণ না করলে উত্থাপিত প্রশ্ন যে

[১২] প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক প্রশস্তপাদাচার্য বা শ্রীধরাচার্য বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলেও যে অনুমানের দ্বারা তা সিদ্ধ করা যায় সেই অনুমানের আকারটি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেননি। তবে তাঁদের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে উক্ত অনুমান পদপক্ষক এবং পদার্থপক্ষক ভেদে দুই প্রকার হতে পারে। পরবর্তীকালের বৈশেষিক আচার্যগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রদর্শন করতে অনুমানের ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রদর্শন করেছেন। এই অনুমানদ্বয়ের পূর্ণ আকারটি সর্বপ্রথম উদয়নাচার্য তাঁর '*ন্যায়কুসুমাঞ্জলী* নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করেন। যেহেতু প্রশস্তপাদাচার্য বা ন্যায়কন্দলীকার কেউই উক্ত অনুমানের পূর্ণ আকারটি প্রদান করেননি তাই উদয়নাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত অনুমানের স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করবো যে, বৈশেষিকগণ কীভাবে শাব্দবোধকে অনুমিতির অন্তর্ভুক্ত করেন। এক্ষেত্রে উদয়নাচার্য প্রদত্ত অনুমান গ্রহণের কারণ হল তিনি যেমন ন্যায় সম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্যরূপে স্বীকৃত তেমনি প্রাচীন বৈশেষিক আচার্যরূপেও সমানভাবে সমাদৃত।

বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করার দরুনই বৈশেষিকগণ পরার্থানুমিতি তথা পরার্থানুমানকে স্বীকার করেছেন কি না এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

(খ)

বর্তমানে আমরা প্রশস্তপাদাচার্য এবং কন্দলীকারকে অনুসরণ করে বৈশেষিকসম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপ আলোচনা করবো।

প্রথমেই আমরা আচার্য প্রশস্তপাদকে অনুসরণপূর্বক পরার্থানুমান বিষয়ে তাঁর অভিমত পর্যালোচনা করবো। অতঃপর প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর আচার্য শ্রীধরভট্ট কর্তৃক বিরচিত ন্যায়কন্দলী টীকা অনুসারে পরার্থানুমানের স্বরূপ আলোচনা করবো।

আচার্য প্রশস্তপাদ তাঁর পদার্থধর্মসংগ্রহ নামক গ্রন্থে পরার্থানুমান বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ‘পঞ্চাবয়বেন বাক্যেন স্বনিশ্চিতার্থপ্রতিপাদনং পরার্থানুমানম্’।[১৩] অর্থাৎ পঞ্চাবয়ব বাক্যের দ্বারা নিজের নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত অর্থের প্রতিপাদন অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বোঝানোকে পরার্থানুমান বলে। যেমন, পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চয় আছে যে ব্যক্তির সেই ব্যক্তি যদি পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমবত্বাৎ, যো যো ধূমবান্ সো সো অগ্নিমান্ যথা মহানসম্, বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্ পর্বতঃ, তস্মাৎ পর্বতো বহ্নিমান্ ইতি – এইরূপ বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে পর্বতে বহ্নির অস্তিত্বকে

[১৩] প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৫৮।

বোঝাতে চান বা প্রতিপাদন করতে চান তাহলে উক্ত প্রতিপাদন অর্থাৎ, বাক্যের দ্বারা বোঝানোকে পরার্থানুমান বলে।

প্রশ্ন হল, 'স্বনিশ্চিতার্থ' বলতে কি বোঝায়? এর উত্তরে ন্যায়কন্দলীকার বলেছেন 'স্বয়ং সাধ্যানন্তরীয়কত্বেন নিশ্চতোঽর্থঃ স্বনিশ্চিতার্থ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সাধ্যের ব্যাপ্তি বা অবিনাভাববিশিষ্ট হেতু হল স্বনিশ্চিতার্থ।[১৪] আবার কেউ কেউ মনে করেন সাধ্যই 'স্বনিশ্চিতার্থ'-এর অর্থ। পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট ন্যায়বাক্য সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সাধ্যের জ্ঞাপক হয়ে থাকে অর্থাৎ হেতুর যে বৈশিষ্ট্য বা রূপগুলি থাকলে হেতু সাধ্য সিদ্ধিতে সক্ষম সেই বৈশিষ্ট্য বিশিষ্টরূপে বোঝাতে সক্ষম হয় বলে পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট ন্যায়বাক্যকে পরার্থানুমান বলে।[১৫] এক্ষেত্রে 'বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন' বলতে বোঝায় পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব অনুমানের প্রতি কারণ যে লিঙ্গের জ্ঞান সেই জ্ঞান উৎপত্তির প্রযোজক যে বাক্যার্থ, সেই বাক্যার্থের উৎপত্তি (বা, প্রতিপাদন) যার দ্বারা হয় তাকে অর্থাৎ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট ন্যায়বাক্যকে। এই কারণেই এই পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট ন্যায়বাক্যকে পরার্থানুমান বলে। অর্থাৎ যেরূপ লিঙ্গের জ্ঞান এবং লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বক্তা পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ করেছেন সেইরূপ জ্ঞানের প্রতিপাদনকে পরার্থানুমান বলে। প্রশস্তপাদাচার্যের মতে এইরূপ

[১৪] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৫৮।

[১৫] "তস্য লিঙ্গপ্রতিপাদনমেবাবান্তরব্যাপারীকৃত্য পঞ্চাবয়বেন বাক্যেন প্রতিপাদনং তৎপ্রতিপাদকবাক্যপ্রয়োগঃ পরার্থানুমানমিতি। .... তস্মাদবিনাভূতলিঙ্গাভিধায়কবাক্যপ্রয়োগ এব পরার্থানুমানমুচ্যতে।" - শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৫৯।

প্রতিপাদন হয়ে থাকে পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায় রূপ বাক্যের প্রয়োগ দ্বারা। এই পঞ্চাবয়ব বাক্য আবার প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব বাক্যের সমুদয়। সুতরাং, পঞ্চাবয়ব বাক্য লিঙ্গজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানের উৎপাদক বা জনক হয়ে থাকে, যে জ্ঞান সাধ্যের অনুমিতির উৎপত্তির সহায়ক; তাই উক্ত পঞ্চ অবয়ববিশিষ্ট ন্যায়বাক্যকে পরার্থানুমান বলে। ন্যায়কন্দলীকার এই অভিমত সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গ (হেতু) হল স্বনিশ্চিতার্থ। একেই তিনি সাধ্যের সঙ্গে অবিনাভাব সম্বন্ধবিশিষ্ট লিঙ্গ বলেছেন। এই সাধ্যাবিনাভূত লিঙ্গই প্রতিপাদিত হয়ে থাকে পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায় রূপ মহাবাক্যের দ্বারা। এই বাক্য শ্রোতাতে উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তিপূর্বক তার সাধ্যানুমানের উৎপাদক হয় অর্থাৎ শ্রোতার মধ্যে অনুমিতির উৎপত্তির অনুকূল হেতুর জ্ঞান উৎপাদন করে। এই কারণে উক্ত পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায়বাক্যকে পরার্থানুমান বলে।[১৬]

প্রশস্তপাদাচার্য সম্মত পঞ্চাবয়বাত্মক মহাবাক্যের অবয়বগুলি হল – প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান এবং প্রত্যাম্নায়।[১৭] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বৈশেষিক সূত্রে এই বাক্যগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রশ্ন হল – প্রশস্তপাদাচার্য নিজেই পঞ্চাবয়ব বাক্যের নামোল্লেখ করেছেন; সুতরাং, নামগুলির উল্লেখের দ্বারাই সিদ্ধ হয় পাঁচ প্রকার

---

[১৬] '....... পঞ্চাবয়বেন বাক্যেন প্রতিপাদনং তৎপ্রতিপত্তিজননসমর্থপঞ্চাবয়ববাক্যপ্রয়োগঃ পরার্থানুমানম্।........ তস্মাদবিনাভূতলিঙ্গাভিধায়কবাক্যপ্রয়োগ এব পরার্থানুমানমুচ্যতে।' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৫৮ – ৫৫৯।

[১৭] 'অবয়বাঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাপদেশনিদর্শনানুসন্ধানপ্রত্যাম্নায়াঃ।' – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৫।

অবয়ব-ই তাঁর সম্মত। অতএব পরার্থানুমানের আলোচনার সূচনাতে 'পঞ্চ' – এই শব্দ প্রয়োগ ব্যর্থ বলতে হয়। এর উত্তরে বলা যায় নাম উল্লেখের দ্বারা উল্লিখিত অবয়বের কম সংখ্যক অবয়ব যে স্বীকৃত নয় তা সূচিত হলেও বেশির সম্ভাবনা নিরাকৃত হয় না। এই কারণেই পরার্থানুমানের আলোচনার সূচনাতে 'পঞ্চ' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা তিনি পাঁচের অধিক সংখ্যক অবয়বের সম্ভাবনা খণ্ডন করেছেন। অর্থাৎ পরার্থানুমান প্রসঙ্গে যাঁরা পাঁচের অধিক বা, ন্যূন অবয়ব স্বীকার করেন তাঁদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রশস্তপাদ সহমত পোষণ করেন না। তাঁর মতে, পঞ্চাবয়বের ন্যূন সংখ্যক অবয়বের দ্বারা যেমন স্বনিশ্চিতার্থ প্রতিপাদন সম্ভব নয়, তেমনি স্বনিশ্চিতার্থ প্রতিপাদনের নিমিত্ত পঞ্চাবয়বের অধিক অবয়ব প্রয়োগও নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন হল, পঞ্চের ন্যূন বা অধিক অবয়ব প্রসিদ্ধ হলেই তার অস্বীকারের অবকাশ আছে। অন্যথায় ন্যূনাধিক অবয়বের সংখ্যা বারণের নিমিত্ত পৃথক 'পঞ্চ' শব্দ প্রয়োগ ব্যর্থ বলতে হবে। এর উত্তরে বলা যায়, পঞ্চ অবয়বের ন্যূন বা অধিক অবয়ব অপ্রসিদ্ধ নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন জৈন এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মনে করেন পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ অনাবশ্যক।[১৮] অপরদিকে কোন কোন সম্প্রদায় পঞ্চের অধিক অবয়ব স্বীকার করতেন। ন্যায়সূত্রভাষ্য এবং যুক্তিদীপিকাতেও এই মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি বাৎস্যায়ন কোনো এক নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কেই

---

[১৮] "ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাসংজ্ঞকং দ্ব্যবয়বমেব সাধনবাক্যং সৌগতানাম্ । অন্যে তু প্রতিজ্ঞাহেতুর্দৃষ্টান্ত উপনয়ো নিগমনং চেতি পঞ্চাবয়বং সাধনবাক্যমাহুঃ ।" – মোক্ষাকরগুপ্ত, ১৯৪২, *তর্কভাষা,* এম্বার কৃষ্ণমাচারীয়া (সম্পাদিত), বরোদা: ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট।

দশাবয়ববাদী বলেছেন। যদিও দশাবয়ববাদী সেই বৃদ্ধ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের কোনো স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁরা যে মহর্ষি গৌতম মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সম্প্রদায় নন, সম্ভবতঃ সেটি ব্যক্ত করার অভিপ্রায়েই ন্যায়সূত্রভাষ্যকার বাৎস্যায়ন 'একে নৈয়ায়িকাঃ' অর্থাৎ অন্য এক নৈয়ায়িকগণ দশাবয়ববাদী – এইরূপ সন্দর্ভের অবতারণা করেছেন।[১৯] তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজও বলেছেন জরন্নৈয়ায়িকগণ পূর্বোক্ত পঞ্চাবয়বের অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন এবং সংশয়ব্যুদাসরূপ পাঁচটি অবয়ব স্বীকার করেন।[২০] যদিও তার্কিকরক্ষাকার উক্ত জরন্নৈয়ায়িক বা বৃদ্ধ নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কোন পরিচয় প্রদান করেননি। বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত *'যুক্তিদীপিকা'*তে দশাবয়ববাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে *'যুক্তিদীপিকা'*তে দশাবয়বের উল্লেখ থাকলেও বাচস্পতি মিশ্র স্পষ্টতঃ বলেছেন জিজ্ঞাসাদি পঞ্চ অবয়ব ব্যাখ্যাঙ্গ।[২১] তাই দশাবয়ববাদ যে তাঁর সম্মত নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে মনু তাঁর '*স্মৃতিশাস্ত্রে*' এবং কৌটিল্য তাঁর '*অর্থশাস্ত্রে*' সাংখ্যশাস্ত্রকেও '*আন্বীক্ষিকী*' বা ন্যায়বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করায় কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন কোন সাংখ্য সম্প্রদায় দশাবয়ববাদের সমর্থক ছিলেন। তবে তাঁদের

---

[১৯] 'দশাবয়বানেক নৈয়ায়িকা বাক্যে সঞ্চক্ষতে। জিজ্ঞাসা সংশয়ঃ শক্যপ্রাপ্তিঃ প্রয়োজনং সংশয়ব্যুদাস ইতি ।' ন্যায়সূত্রভাষ্য ১/১/৩২ -- ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১ *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৯।

[২০] 'কেচন জরন্নৈয়ায়িকাস্তু জিজ্ঞাসাসংশয়শক্যপ্রাপ্তিপ্রয়োজনসংশয়ব্যুদাসৈঃ সহ দশাবয়বা ইত্যাচক্ষতে।' – বরদরাজ, ১৯০৩, *তার্কিকরক্ষা,* মল্লিনাথ সূরি (সম্পাদিত), বারানসী: মেদিকলহাল নামক যন্ত্রালয়, পৃষ্ঠা: ১৮৩ – ১৮৪।

[২১] 'তস্য পুনরবয়বাঃ – জিজ্ঞাসা – সংশয় – প্রয়োজন – শক্যপ্রাপ্তি – সংশয়ব্যুদাসলক্ষণশ্চ ব্যাখ্যাঙ্গম্ প্রতিজ্ঞা – হেতু – দৃষ্টান্তোপসংহার – নিগমনানি পরপ্রতিপাদনাঙ্গমিতি।' – বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৩৮, *যুক্তিদীপিকা,* পুলিনবিহারী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা – ২৩, কলিকাতা: মেট্রোপলিটন্ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস্, পৃ: ৪৭ - ৫১।

সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।[২২] সুতরাং, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাদি পঞ্চবাক্য যাতে অবয়বরূপে গৃহীত না হয় এবং পঞ্চের ন্যূন অবয়বের দ্বারাও যে পরার্থানুমান সম্ভব নয় – এটি বোঝানোর জন্যই প্রশস্তপাদাচার্য 'পঞ্চ' – এই শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, বক্তা স্বনিশ্চিতার্থ প্রতিপাদনের নিমিত্ত পরার্থানুমান প্রয়োগ করেন কেন? এর উত্তর দিতে গিয়ে প্রশস্তপাদ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি বক্তার স্বনিশ্চিতার্থ বিষয়ে সন্দিগ্ধ, বিপর্যস্ত অথবা অব্যুৎপন্ন (অজ্ঞাত) হন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাতে বক্তার স্বনিশ্চিতার্থ বিষয়ে নিশ্চয় লাভ করতে পারেন, সেই নিমিত্তই বক্তা পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ করে থাকেন। অর্থাৎ স্বনিশ্চিতার্থ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই কেবল পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ হয় এমন নয়। বক্তার স্বনিশ্চিতার্থ বিষয়ে সন্দিগ্ধ বা বিপর্যস্ত পুরুষের প্রতিও পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রযুক্ত হয়ে থাকে, যাতে তাঁরা বক্তার স্বনিশ্চিতার্থ বিষয়ে নিশ্চয় লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে প্রশস্তপাদ অব্যুৎপন্ন, সন্দিগ্ধ, বিপর্যস্ত –এই তিন প্রকার পুরুষের প্রতি পরার্থানুমান অর্থাৎ পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগের কথা কেন বলেছেন? এর উত্তরে বলা যায়, কোন একটি বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির চার প্রকার জ্ঞানীয় অবস্থা হতে

---

[২২] ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে প্রাচীন এই সাংখ্যসম্প্রদায়ের অভিমত খণ্ডনের জন্যই ভাষ্যকার 'একে নৈয়ায়িকাঃ' অর্থাৎ অন্য নৈয়ায়িকগণ দশাবয়ববাদী এইরূপ উল্লেখপূর্বক তাঁদের অভিমত খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন যে, উক্ত জিজ্ঞাসা ও সংশয় প্রভৃতি বাক্য না হওয়ায় ন্যায়বাক্যের অবয়ব হতে পারে না। তবে তা ন্যায়প্রবৃত্তির অঙ্গরূপে উপযোগী হয় বস্তুতঃপক্ষে ন্যায়প্রয়োগ স্থলে প্রথমে উক্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতির বোধক বাক্য প্রয়োগ অনাবশ্যক।

পারে। ব্যক্তির কোনো একটি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে নিশ্চয় থাকতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে সংশয়ও থাকতে পারে। প্রশস্তপাদাচার্য "বিমর্শঃ" কে সংশয়ে লক্ষণ বলেছেন। 'বিমর্শ' শব্দের অর্থ হল – কোন একটি ধর্মীতে বিরুদ্ধার্থ প্রকারক জ্ঞান। অর্থাৎ কোন একটি ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ প্রকারক জ্ঞানকে সংশয় বলে। এই সংশয়ের কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – কোন বস্তুর অসাধারণ ধর্মের পূর্বজ্ঞান, ও সাধারণ ধর্মের দর্শন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দর্শন শব্দের দ্বারা কেবল প্রত্যক্ষকে বোঝায় না, উপলব্ধিকে বোঝায়।[২৩] অসাধারণ ধর্মগুলির স্মরণ, অসাধারণ ধর্মের অনিশ্চয় এবং অধর্ম জন্য সংশয় হয়ে থাকে।[২৪] যেমন, স্থানু ও পুরুষের অসাধারণ ধর্ম হল – বক্র কোটরাদি এবং মস্তক হস্তাদি। এই অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান যদি কোন পুরুষের থাকে এবং পরবর্তীকালে ঐ ব্যক্তির যদি স্থানু বা পুরুষের সাধারণ ধর্মের উপলব্ধি হয় এবং তাঁর যদি স্থানু ও পুরুষের অসাধারণ ধর্মের স্মরণ হয় কিন্তু অসাধারণ ধর্মের অনিশ্চয় থাকে এবং অধর্ম জন্য ঐ ব্যক্তির একই ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ, বক্র কোটরাদি এবং মস্তক হস্তাদি প্রকারক সংশয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে একটি বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হতে পারে, বস্তুটি ভিন্নরূপে জ্ঞাত হতে পারে, অর্থাৎ বস্তুটি যেমন নয় সেইরূপে জ্ঞাত হতে পারে। অথবা বস্তুটি অজ্ঞাত হতে

---

[২৩] "দর্শনশব্দ উপলব্ধিবচনো ন প্রত্যক্ষপ্রতীতিবচনোঽমনুমেয়স্যাপি .....।" – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৪১৯।

[২৪] "সংশয়স্তাবত্ প্রসিদ্ধানেকবিশেষয়োঃ সাদৃশ্যমাত্রদর্শনাদুভয়বিশেষানুস্মরণাদধর্মাচ্চ।" - প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৪১১।

পারে। বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত হলে ঐ বিষয় সম্পর্কে নিশ্চয়ের নিমিত্ত পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ নিষ্ফল। অতএব বিষয় সম্পর্কে সন্দিগ্ধ, বিপর্যস্ত ও অজ্ঞ ব্যক্তির যথাক্রমে সংশয়, বিপর্যয় বা অজ্ঞতা থাকাকালেই ঐ বিষয়ে নিশ্চয় উৎপাদনের নিমিত্ত পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগের সার্থকতা। এই কারণেই প্রশস্তপাদ পূর্বোক্ত তিনটি স্থলে পরার্থানুমান প্রয়োগের কথা বলেছেন।

প্রশস্তপাদাচার্য প্রতিজ্ঞাবাক্যের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "অনুমেয়োদ্দেশোঽবিরোধী প্রতিজ্ঞা।"[২৫] অর্থাৎ, অনুমেয় বা যে ধর্ম সিদ্ধ করার জন্য পরার্থানুমান প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই ধর্ম বিশিষ্ট যে ধর্মী, যার সঙ্গে হেতুর সম্বন্ধ প্রদর্শন করা হবে, সেই ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর অবিরোধী যে বাক্য, সেই বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলে।[২৬] অর্থাৎ অনুমিতির অভিপ্রেত সাধ্যরূপ বিষয়ের প্রতিপাদক বাক্যকে বলে প্রতিজ্ঞা। যে সাধ্যের বিরোধী কোনো প্রমাণ থাকে না ঐরূপ সাধ্যের প্রতিপাদক বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বলা হয়ে থাকে। এই কথা বলার অভিপ্রায় হলো এই, যে সাধ্যটি (ধর্মটি) প্রতিপাদ্য পক্ষে অভিপ্রেত হয়ে থাকে ঐ ধর্মের দ্বারা যুক্ত ধর্মী বা, পক্ষ অনুমেয় হয়ে থাকে। সাধ্যের দ্বারা বিশিষ্ট পক্ষরূপ ধর্মীতে হেতুর সম্বন্ধকে দেখানোর জন্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের বোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞা বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এই বক্তব্য

---

[২৫] প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৬।

[২৬] 'অনুমেয়োদ্দেশোঽবিরোধী প্রতিজ্ঞা। প্রতিপিপাদয়িষিতধর্মবিশিষ্টস্য ধর্মিণোঽপদেশবিষয়মাপাদয়িতুমুদ্দেশমাত্রং. প্রতিজ্ঞা।' – প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৬।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগের অনন্তর হেতু উপস্থাপনার অবকাশ আছে – এই কথা ব্যক্ত করে। যেমন, 'দ্রব্যং বায়ুঃ' অর্থাৎ বায়ু হল দ্রব্য পদার্থ এইরূপ বাক্য। যে ব্যাক্তির বায়ুর জ্ঞান থাকলেও বায়ুর প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ বায়ু যে দ্রব্য পদার্থ এই জ্ঞান নেই, সেই ব্যক্তি যাতে বায়ুকে দ্রব্যত্ব বিশিষ্ট দ্রব্যরূপে জানতে পারেন এই উদ্দেশ্যে 'দ্রব্যং বায়ুঃ' এই প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করা হয়।[২৭] ন্যায়কন্দলীকারের মতে এই প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতার পক্ষের জ্ঞান হয়ে থাকে। তবে এখানে বলা আবশ্যক যে ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য পক্ষ বলতে যে ধর্মীতে সাধ্য সিদ্ধি করা হবে সেই ধর্মী মাত্রকে বোঝাননি। তাঁর মতে যে ধর্মীতে যে জিজ্ঞাসিত ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য পরার্থানুমান প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই জিজ্ঞাসিত ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীকেই পক্ষরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। হেতুর উল্লেখ না করে কেবলমাত্র উক্ত ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর বা পক্ষের উদ্দেশকেই প্রতিজ্ঞা বলে।[২৮] যেমন, বায়ুতে দ্রব্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যখন পরার্থানুমান প্রয়োগ করা হয় তখন দ্রব্যত্ব রূপ জিজ্ঞাসিত ধর্ম বিশিষ্ট বায়ু হল পক্ষ। ফলে হেতু বাক্য প্রয়োগের পূর্বে 'দ্রব্যং বায়ুঃ' এই প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতার দ্রব্যত্ব রূপ জিজ্ঞাসিত ধর্ম বিশিষ্ট বায়ুর (তথা পক্ষের) জ্ঞান হয়ে থাকে।

---

[২৭] 'যো বায়ুং প্রতিপাদ্যমানোঽপি তস্য দ্রব্যত্বং ন প্রতিপদ্যতে, তং প্রতি সাধয়িতুমিষ্টেন দ্রব্যত্বেন বিশিষ্টস্য বায়োরভিধানং প্রতিজ্ঞা......।' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৯।

[২৮] "প্রতিপাদয়িতুমিষ্টো যো ধর্মস্তেন বিশিষ্টো ধর্মী অনুমেয়ঃ পক্ষ ইতি কথ্যতে। তস্য যদুদ্দেশমাত্রং সঙ্কীর্তনমাত্রং সাধনরহিতং সা প্রতিজ্ঞেতি।" – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৫

প্রতিজ্ঞা বাক্যে "সাধ্যের অবিরোধী" এই পদ থাকায় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা, নিজের স্বীকৃত শাস্ত্র ও নিজের বাক্যের বিরোধী বাক্যের প্রতিজ্ঞার লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ বাক্য (যেমন: অগ্নি অনুষ্ণ), অনুমানের বিরুদ্ধ বাক্য (যেমন: আকাশ ঘন), বেদের বিরুদ্ধ বাক্য (যেমন: ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে), নিজের অভিপ্রেত শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বাক্য (যেমন: কার্যং সৎ), নিজের বাক্যের বিরোধী বাক্য (যেমন: শব্দ অর্থের প্রত্যায়ক হয় না।) ইত্যাদি কখনও প্রতিজ্ঞারূপে বিবেচিত হতে পারে না। এইজন্য ঐরূপ বাক্যসমূহে অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে।

এর বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন, পক্ষের এইরূপ লক্ষণ সঙ্গত নয়। কারণ, যে সাধ্যধর্ম সিদ্ধি করতে চাওয়া হচ্ছে সেই সাধ্যধর্ম বিশিষ্টরূপে ধর্মীকে পক্ষরূপে গ্রহণ করে সেই পক্ষের প্রতিপাদক বাক্যকে প্রতিজ্ঞারূপে স্বীকার করা যায় না। যেহেতু যে ধর্ম এখনো সিদ্ধই হয়নি সেই ধর্ম বিশিষ্টরূপে পক্ষ স্বীকার করা যায় না। উক্ত ধর্মের অস্তিত্ব সিদ্ধির পরেই কেবল আমরা উক্ত ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মী স্বীকার করতে পারি। সুতরাং, প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম বিশিষ্ট ধর্মী তথা পক্ষের জ্ঞান হয় এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।[২৯]

এর উত্তরে ন্যায়কন্দলীকার বলেন পক্ষে সাধ্যটি সিদ্ধ না হলেও সপক্ষাদিতে সাধ্য সিদ্ধ হওয়ায় উক্ত সিদ্ধ সাধ্যকে বিশেষণ করে পক্ষের জ্ঞান হতে পারে। সেক্ষেত্রে

[২৯] 'প্রতিপিপাদয়িষিতেন ধর্মেণ বিশিষ্টো ধর্মীতি বিপ্রতিসিদ্ধমিদম্, অপ্রতীতস্যাবিশেষকত্বাদিতি চেত্?' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৮।

অভিপ্রায় এই যে অন্যত্র সিদ্ধ ধর্ম বিশিষ্টরূপে পক্ষের জ্ঞান লাভ করাই হল আমাদের উদ্দেশ্য। তাই উক্ত ধর্ম বিশিষ্টরূপে ধর্মী তথা পক্ষের প্রদর্শনও সঙ্গত। তাঁর মতে পক্ষের দুই প্রকার স্বরূপ বিদ্যমান। একটি সাধ্য ধর্ম বিশিষ্টরূপে এবং অপরটি স্বস্বরূপ বিশিষ্টরূপে। যেমন, আলোচ্য দৃষ্টান্তে বায়ুরূপ পক্ষের প্রথম প্রকার স্বরূপটি হল – দ্রব্যত্ব বিশিষ্টরূপে এবং দ্বিতীয় প্রকারটি হল – বায়ুত্ব বিশিষ্টরূপে। এখন যে ব্যক্তির বায়ুর জ্ঞান থাকলেও অর্থাৎ বায়ুত্ব বিশিষ্ট বায়ুর জ্ঞান থাকলেও বায়ু যে দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্যত্ব বিশিষ্টরূপে বায়ুকে জানে না সেই ব্যক্তি যাতে দ্রব্যত্ব বিশিষ্টরূপে বায়ুকে জানতে পারেন সেই উদ্দেশ্য দ্রব্যত্ব বিশিষ্টরূপে বায়ুর তথা পক্ষের প্রতিপাদনের জন্য 'দ্রব্যং বায়ুঃ' এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্যের উল্লেখ করা হয়।[৩০]

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, পরার্থানুমানের প্রয়োগকর্তা কি যে কোনো বিষয় সাধ্যরূপে গ্রহণ করে উক্ত সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর উল্লেখরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করতে পারেন? না কি বিশেষ বিষয়কেই সাধ্যরূপে গ্রহণ করে প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করেন? কারণ, অনেক সময় পরার্থানুমানের প্রয়োগকর্তা ভ্রান্তি বশতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বাধিত পদার্থ সাধনের নিমিত্ত বাক্য প্রয়োগ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে উক্ত বাক্যকেও কি প্রতিজ্ঞারূপে গ্রহণ করতে হবে? এই সমস্যার সমাধানকল্পে প্রশস্তপাদ প্রতিজ্ঞার লক্ষণে 'অবিরোধী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যক্ষাদির দ্বারা বাধিত কোন পদার্থ

[৩০] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৮ – ৫৬৯।

সাধনের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করলে সেটি পরার্থানুমানের প্রয়োগকর্তা যে সাধ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করছেন সেই উদ্দেশ্যের অবিরোধী হবে না, বরঞ্চ বিরোধিই হবে। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি বহ্নিকে অনুষ্ণরূপে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য 'অনুষ্ণো বহ্নিঃ' এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করেন তাহলে, যে সাধ্য সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করেছেন সেটি প্রত্যক্ষ বিরোধী হওয়ায় ব্যর্থরূপে প্রতিপন্ন হবে। পরবর্তীতে তিনি নিজেই লক্ষণোক্ত 'অবিরোধী' শব্দের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'অবিরোধিগ্রহণাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যুপগতস্বশাস্ত্রস্ববচনবিরোধিনো নিরস্তা ভবন্তি।'[৩১] অর্থাৎ যে কোনো বিষয়কে সাধ্যরূপে গ্রহণ করে ঐ সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর প্রতিপাদন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করা যায় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ বা বেদ, স্বশাস্ত্র এবং স্ববচন অবিরোধী বিষয়ই কেবলমাত্র অনুমেয় হতে পারে। তাই, যে সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মী অনুমেয় সেটি স্বসম্প্রদায় সম্মত প্রমাণ, স্বশাস্ত্র এবং স্ববচন অবিরোধী হতে হবে অন্যথায় শ্রোতা অনুমানে সমর্থ হবেন না। যেমন, যদি কেউ 'অনুষ্ণো অগ্নি' অর্থাৎ অগ্নি উষ্ণ নয় – এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করেন তাহলে সেটি প্রত্যক্ষের বিরোধী প্রতিজ্ঞা বাক্যরূপে গণ্য হবে কারণ, প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা জানি যে বহ্নি উষ্ণ। যদি কেউ বলেন, 'ঘনমম্বরম্' অর্থাৎ আকাশ নিবিড় সংযোগ বিশিষ্ট অবয়বের দ্বারা গঠিত এইরূপ

[৩১] প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৬ – ৫৭০।

প্রতিজ্ঞা বাক্য আকাশের অস্তিত্বের সাধক অনুমানের বিরোধী। কারণ, যে পরিশেষ অনুমানের দ্বারা শব্দের আশ্রয়রূপে আকাশ সিদ্ধ হয় সেই অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে আকাশ নিত্য, স্পর্শরহিত এবং নিরবয়বী দ্রব্য।[৩২] সুতরাং, 'ঘনমম্বরম্' এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য অনুমান বিরোধী প্রতিজ্ঞা বাক্য। 'ব্রাহ্মণেন সুরা পেয়া' এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য আগম বা বেদ বিরোধী প্রতিজ্ঞা বাক্য। অসৎকার্যবাদী বৈশেষিকগণ যদি 'সৎকার্যম্' এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করেন তাহলে সেটি স্বশাস্ত্র বিরোধী হবে। অপরদিকে, যদি কেউ এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করেন যে 'ন শব্দোঽর্থপ্রত্যায়ক' অর্থাৎ শব্দ অর্থের বোধক নয় তাহলে সেটি স্ববচন বিরোধী হবে।[৩৩]

প্রতিজ্ঞাবাক্যের স্বরূপ আলোচনার পর প্রশস্তপাদ দ্বিতীয় অবয়ব অপদেশ-এর আলোচনা করেছেন। 'অপদিশ্যতে অনেন' এইরূপ করণবাচ্যে অপ + দিশ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় যুক্ত করে এখানে অপদেশ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ হল বক্তা অপর

---

[৩২] (ক) প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ১৪৪ – ১৪৫।

(খ) শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ১৪৪ – ১৫১, ৫৭২।

[৩৩] "প্রত্যক্ষানুমানাভ্যুপগতস্বশাস্ত্রস্ববচনবিরোধিনো নিরস্তা ভবন্তি। যথাঽনুষ্ণোঽগ্নিরিতি প্রত্যক্ষবিরোধী, ঘনম্বরমিত্যনুমানবিরোধী, ব্রাহ্মণেন সুরা পেয়েত্যাগমবিরোধী, বৈশেষিকস্য সৎকার্যমিতি ব্রুবতঃ স্বশাস্ত্রবিরোধী, শব্দোঽর্থপ্রত্যায়ক ইতি স্ববচনবিরোধী"। – প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭০ – ৫৭৩।

সন্দিগ্ধ ব্যক্তির নিকট নিজের সুনিশ্চিত অনুমেয়ের প্রতিপাদন যে বাক্যের দ্বারা করে থাকেন, সেই বাক্যকে অপদেশ বা হেতু বলা হয়।

প্রশস্তপাদের মতে, "লিঙ্গবচনম্ অপদেশ"। লিঙ্গের বচনকে অর্থাৎ হেতুর বোধক বাক্যকে অপদেশ বলে। যেমন, 'দ্রব্যং বায়ুঃ' এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগের পশ্চাৎ ক্রিয়াবত্ত্ব এবং গুণবত্ত্বরূপ লিঙ্গের বোধক 'ক্রিয়াবত্ত্বাদ্ গুণবত্ত্বাচ্চ' এইরূপ বাক্যকে অপদেশ বাক্য বলে। ন্যায়কন্দলীকারের মতে প্রশস্তপাদাচার্য অপদেশ বাক্যের দৃষ্টান্তরূপে গুণবত্ত্বরূপ লিঙ্গের উপস্থাপক গুণবত্ত্বাৎরূপ বাক্য প্রয়োগের দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, সকল সপক্ষবৃত্তি পদার্থ লিঙ্গ হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা জানি বৈশেষিক মতে গুণের সমবায়ী কারণ দ্রব্য হওয়ার জন্য দ্রব্যগত গুণের উৎপত্তির একক্ষণ পূর্বে হলেও দ্রব্যকে উৎপন্ন হতে হবে। তা না হলে দ্রব্য এবং গুণের মধ্যে কার্য-কারণভাব ব্যাখ্যা করা যাবে না। সুতরাং দ্রব্য উৎপত্তির আদ্যক্ষণে গুণহীন অবস্থাতেও থাকে তাই গুণবত্ত্ব দ্রব্যের লক্ষণ হতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে সেতুটীকাকার গুণবত্ত্বের অর্থ করেছেন, 'গুণাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বম্'।[৩৪] অর্থাৎ গুণের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব হল গুণবত্ত্ব। উৎপত্তিকালে দ্রব্যে গুণের অভাব থাকলেও তা অত্যন্তাভাব নয়, প্রাগভাব। পরবর্তী কালে দ্রব্যে গুণ উৎপন্ন হলে উক্ত প্রাগভাব বিনষ্ট হয়। অতএব গুণবত্ত্বের অর্থ গুণের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব করলে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে গুণের

---

[৩৪] পদ্মনাভ মিশ্র, ১৯২৫, *সেতু,* প্রশস্তপাদভাষ্য-এর উপর রচিত টীকা, গোপীনাথ কবিরাজ এবং ভুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ১৪৮।

প্রাগভাব থাকলেও অত্যন্তাভাব না থাকায় তাতে উক্ত অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্বই থাকে। ফলে গুণবত্ত্বের উক্ত প্রকার অর্থ করলে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যেও গুণবত্ত্বরূপ ধর্মের অব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং, গুণবত্ত্বরূপ লিঙ্গকে সকল সপক্ষবৃত্তিরূপে (দ্রব্যবৃত্তিরূপে) গ্রহণ করা যায়। অপরদিকে, ক্রিয়াবত্ত্বরূপ লিঙ্গের প্রতিপাদক অপদেশ বাক্যরূপে ক্রিয়াবত্ত্বাৎ এই বাক্য প্রয়োগের দ্বারা আচার্য বুঝিয়েছেন যে লিঙ্গকে সকল বা যাবৎ সপক্ষবৃত্তি হতেই হবে এমন নয়। কোনো কোনো সপক্ষে বিদ্যমান লিঙ্গও সাধ্যের সাধক হতে পারে। কারণ আমরা জানি যে সকল দ্রব্য ক্রিয়াবৎ নয়। যেমন, দিক, কাল ইত্যাদি দ্রব্য হলেও ক্রিয়াবৎ নয়। সুতরাং, আচার্য শ্রীধরভট্টের মতে যাবৎ সপক্ষবৃত্তি পদার্থ যেমন লিঙ্গ হতে পারে তেমনি কোনো কোনো সপক্ষে বৃত্তিমান পদার্থও লিঙ্গরূপে বিবেচিত হতে পারে।[৩৫]

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন প্রশস্তপাদাচার্য অপদেশ বাক্যের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে সৎ হেতু বা যথার্থ লিঙ্গের স্বরূপও ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব এবং বিপক্ষে অবৃত্তিত্ব এই তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য থাকলে তবেই তাকে প্রকৃত লিঙ্গরূপে গণ্য করা যাবে। লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন যে, লিঙ্গটিকে অনুমেয় বা পক্ষে বিদ্যমান থাকতে হবে। সপক্ষে অর্থাৎ লিঙ্গের দ্বারা যে সাধ্য সিদ্ধ করতে চাইছি সেই সাধ্যের সকল অধিকরণে অর্থাৎ সমানজাতীয়

[৩৫] 'তয়োরুপন্যাসঃ সপক্ষৈকদেশবৃত্তেঃ সপক্ষব্যাপকস্য হেতুত্বপ্রদর্শনার্থঃ।' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭৫।

সকল দৃষ্টান্তে তার অস্তিত্ব থাকতে হবে। অপরদিকে, সাধ্যের অভাবের সকল অধিকরণ অর্থাৎ সমস্ত বিপক্ষে লিঙ্গের অভাব থাকতে হবে।[৩৬] যদি লিঙ্গরূপে গৃহীত পদার্থে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে যথার্থ লিঙ্গরূপে গণ্য করা হবে। যেমন, 'বায়ুঃ দ্রব্যঃ' – এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্যের অনন্তর 'ক্রিয়াবত্ত্বাৎ গুণবত্ত্বাৎ চ' – এইরূপ যে লিঙ্গের উপস্থাপক অপদেশ বাক্য প্রযুক্ত হয়ে থাকে সেই অপদেশ বাক্যের দ্বারা 'ক্রিয়াবত্ত্ব' এবং 'গুণবত্ত্ব'কে দ্রব্যত্বের সাধক লিঙ্গরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'ক্রিয়াবত্ত্ব'রূপ লিঙ্গ বায়ুরূপ পক্ষে থাকে, ক্ষিত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য অর্থাৎ সপক্ষে থাকে এবং দ্রব্যভিন্ন অন্য পদার্থে অর্থাৎ বিপক্ষে থাকে না। যেমন, 'ক্রিয়াবত্ত্ব'টি গুণাদি কোন বিপক্ষেই থাকে না। অপরদিকে 'গুণবত্ত্ব'রূপ লিঙ্গটিও বায়ুরূপ পক্ষে থাকে, ক্ষিত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য অর্থাৎ সপক্ষে থাকে এবং দ্রব্যভিন্ন অন্য পদার্থে অর্থাৎ বিপক্ষে থাকে না। সুতরাং, 'ক্রিয়াবত্ত্ব' এবং 'গুণবত্ত্ব'কে বায়ুরূপ পক্ষে দ্রব্যত্বের সাধক প্রকৃত লিঙ্গরূপে স্বীকার করা যায়। আর এই প্রকৃত লিঙ্গের প্রতিপাদক বাক্যকে অপদেশ বাক্য বলে।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে প্রকৃত লিঙ্গের যে বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ, সন্দিগ্ধ এবং অনধ্যবসিত – এই চার প্রকার দোষযুক্ত হেতুর উপস্থাপক বাক্যকে আর অপদেশ রূপে গণ্য করা যাবে না; তা

[৩৬] 'যদনুমেয়েন সহচরিতং তৎসমানজাতীয়ে সর্বত্র সামান্যেন প্রসিদ্ধং তদ্বিপরীতে চ সর্বস্মিন্নসদেব তল্লিঙ্গমুক্তম্,.........।'। – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭৫ – ৫৭৬।

অনপদেশই।[৩৭] যেমন, অনুমেয়ে অর্থাৎ পক্ষে লিঙ্গটি বিদ্যমান থাকবে – এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অসিদ্ধরূপ অনপদেশ বা হেত্বাভাস বারিত হয়েছে। অর্থাৎ, হেতুরূপে গৃহীত পদার্থে যদি উক্ত বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা যায় তাহলে গৃহীত হেতুটিকে আর সৎ হেতুরূপে গ্রহণ করা যাবে না, সেটি অসিদ্ধ হেত্বাভাস হবে। যেমন, যদি কোন অনুমানে সাধ্যসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হেতুটি পক্ষে সিদ্ধ না হয় তাহলে প্রযুক্ত হেতুটিকে সৎ হেতু বলা যায় না; সেটি অসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে বিবেচিত হয়। যেমন, শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যদি চাক্ষুষত্বরূপ হেতু প্রয়োগ করা হয় তাহলে অসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। কারণ, চাক্ষুষত্বরূপ হেতুটি শব্দরূপে পক্ষে থাকে না। প্রশস্তপাদাচার্য উভয়াসিদ্ধ, অন্যতরাসিদ্ধ ও তদ্ভাবাসিদ্ধ, অনুমেয়াসিদ্ধ ভেদে চার প্রকার অসিদ্ধ হেত্বাভাসের কথা বলেছেন।[৩৮] কোন একটি পক্ষে কোন বিশেষ সাধ্য সিদ্ধির জন্য যদি এমন একটি হেতু প্রয়োগ করা হয় যেটির পক্ষবৃত্তিত্ব বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ই অস্বীকার করেন অর্থাৎ উভয়ের কাছে অসিদ্ধ হয় তাহলে তাকে উভয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। যেমন, “অনিত্যঃ শব্দ সাবয়বত্বাৎ” অর্থাৎ শব্দ অনিত্য কারণ শব্দের অবয়ব আছে।[৩৯] এই অনুমানে শব্দে অনিত্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে হেতুটি প্রযুক্ত হয়েছে সেই হেতুটির পক্ষবৃত্তিত্ব বাদী এবং

---

৩৭ ‘এতেনাসিদ্ধবিরুদ্ধসন্দিগ্ধানধ্যবসিতবচনানামনপদেশত্বমুক্তং।’ । – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭৬।

৩৮ “তত্রাসিদ্ধশ্চতুরর্বিধঃ – উভয়াসিদ্ধঃ, অন্যতরাসিদ্ধঃ, তদ্ভাবাসিদ্ধঃ, অনুমেয়াসিদ্ধশ্চেতি।” প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭৭।

৩৯ “তত্রোভায়াসিদ্ধ উভয়োর্বাদিপ্রতিবাদিনোরসিদ্ধঃ, যথাঽনিত্যঃ শব্দঃ, সাবয়বত্বাদিতি।” প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭৭।

প্রতিবাদী উভয়ই অস্বীকার করেন তাই এটিকে সৎ হেতুরূপে স্বীকার করা যায় না। এটি উভয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস। কোন একটি পক্ষে কোন বিশেষ সাধ্য সিদ্ধির জন্য যদি এমন একটি হেতু প্রয়োগ করা হয় যেটির পক্ষবৃত্তিত্ব বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে কোন একটি পক্ষ অস্বীকার করেন তাহলে তাকে অন্যতরাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। যেমন, "অনিত্যঃ শব্দ কার্যত্বাৎ" অর্থাৎ শব্দ অনিত্য কারণ শব্দ কার্য।[৪০] এই অনুমানে শব্দে অনিত্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে হেতুটি প্রযুক্ত হয়েছে সেই হেতুটির পক্ষবৃত্তিত্ব বাদী বৈশেষিক কর্তৃক স্বীকৃত হলেও প্রতিবাদী মীমাংসক কর্তৃক স্বীকৃত নয় অর্থাৎ উভয় বাদী কর্তৃক স্বীকৃত নয়, তাই এটিকে সৎ হেতুরূপে স্বীকার করা যায় না। এটি অন্যতরাসিদ্ধ হেত্বাভাস। যদি কোন অনুমানে সাধ্য সিদ্ধির জন্য প্রকৃত হেতু ভিন্ন হেতুকে প্রকৃত হেতুরূপে গ্রহণ করে প্রয়োগ করা হয় তাহলে উক্ত স্থলে তদ্ভাবাসিদ্ধ হেত্বাভাস হেয়ে থাকে। যেমন, বাষ্পকে ধূমরূপে গ্রহণ করে যদি বহ্নির অনুমাপক হেতুরূপে প্রয়োগ করা হয় তাহলে উক্ত হেতুতে প্রকৃত হেতুর ধর্ম ধূমত্ব না থাকায় তদ্ভাবাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়ে থাকে।[৪১] যদি কোন অনুমানে সাধ্যটি যে পক্ষে সিদ্ধ করার জন্য হেতু প্রয়োগ করা হয় সেই পক্ষটি অসিদ্ধ হয় তাহলে অনুমেয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। যেমন, মীমাংসকগণের মতে, "পার্থিবং দ্রব্যং তমঃ, কৃষ্ণরূপত্বাৎ।" অর্থাৎ, তমো বা

[৪০] "অন্যতরাসিদ্ধো যথা - অনিত্যঃ শব্দঃ কার্যত্বাদিতি।" প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারণাসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭৭ – ৫৭৮।

[৪১] "তদ্ভাবাসিদ্ধো যথা – ধূমাভাবেনাগ্ন্যধিগতৌ কর্তব্যয়ামুপন্যস্যমানে বাষ্পো ধূমভাবেনাসিদ্ধ ইতি।" প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারণাসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭৮।

অন্ধকার পার্থিব দ্রব্য কারণ সেটি কৃষ্ণরূপ বিশিষ্ট। এই অনুমানের অনুমেয় অর্থাৎ পক্ষ অন্ধকার অভাব পদার্থ দ্রব্য পদার্থ নয়। তাই এক্ষেত্রে অনুমেয়াসিদ্ধ বা আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়ে থাকে।[৪২]

সপক্ষে লিঙ্গটি বিদ্যমান থাকবে অর্থাৎ, সপক্ষসত্ত্ব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বারিত হয়েছে। অর্থাৎ, হেতুরূপে অভিমত পদার্থে যদি এই বৈশিষ্ট্যটি না থাকে তাহলে হেতুটিকে আর সৎ হেতু বলা যাবে না সেটিকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলতে হবে। যেমন, কোন অনুমানে সাধ্য সিদ্ধির জন্য যে হেতু প্রয়োগ করা হয়েছে সেই হেতুটি যদি সাধ্যের নিশ্চিত অধিকরণে না থেকে সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকে তাহলে সেই হেতুটিকে সৎ হেতু বলা যাবে না, সেটি বিরুদ্ধ হেত্বাভাস। যেমন, বৃক্ষরাজির আড়ালে অবস্থিত গো-এর বিষাণ দেখে যদি কোন ব্যক্তি অনুমান করেন বৃক্ষরাজির আড়ালের পিণ্ডটি অশ্ব কারণ তার বিষাণ আছে তাহলে উক্ত বিষাণত্বরূপ হেতুটি বিরুদ্ধ হেত্বাভাসরূপে গণ্য হবে। কারণ, উক্ত হেতুটি অশ্বের অধিকরণে না থেকে অশ্বত্বের অভাবের অধিকরণে থাকে। অর্থাৎ হেতুটিতে সপক্ষসত্ত্বরূপ বৈশিষ্ট্যের

[৪২] "অনুমেয়াসিদ্ধো যথা – পার্থিবং দ্রব্যং তমঃ, কৃষ্ণরূপবত্ত্বাদিতি।" প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারণাসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭৮।

অভাব বিদ্যমান।[৪৩] তবে এখানে বলা আবশ্যক যে বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের ক্ষেত্রে হেতুতে কেবলমাত্র সপক্ষসত্ত্বের অভাব থাকছে এমন নয়, বিপক্ষাসত্ত্ব ধর্মেরও অভাব থাকছে।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে কেবলমাত্র সপক্ষসত্ত্বের অভাবে অনধ্যবসিত হেত্বাভাসও হয়ে থাকে। অর্থাৎ, কোন অনুমানে সাধ্য সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হেতুটি যদি কেবলমাত্র পক্ষবৃত্তি হয় তাহলে সেই হেতুকে সৎ হেতু বলা যায় না। সেটিকে অনধ্যবসিত হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন, সৎকার্যবাদী সাংখ্যগণ স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমান প্রয়োগ করেন যে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে সৎ কারণ তা নির্দিষ্ট উপাদান কারণ থেকে অভিব্যক্ত বা প্রকটিত হয়। এই অনুমানের পক্ষ কার্য, সাধ্য সত্তা এবং হেতু উৎপন্ন হওয়া। উক্ত অনুমানের হেতুটি সাধ্যের নিশ্চিত অধিকরণ, অর্থাৎ কার্য ভিন্ন সৎ বস্তু যেমন, আকাশ-এ থাকে না। আবার সাধ্যের অভাবের অধিকরণ যেমন, আকাশকুসুমেও থাকে না। কেবলমাত্র পক্ষে থাকে। তাই উক্ত হেতুটিকে সৎ হেতু বলা যায় না। এছাড়াও এক্ষেত্রে আরও একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়, যথা: 'শব্দ অনিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ' –এটিও অনধ্যবসিত হেত্বাভাস।[৪৪]

---

[৪৩] "যোহ্যনুমেয়েঽবিদ্যমানোঽপি তৎসমানজাতীয়ে সর্বস্মিন্নাস্তি, তদ্বিপরীতে চাস্তি, স বিপরীতসাধনাদ্ বিরুদ্ধঃ, যথা যস্মাদ্ বিষাণ তস্মাদশ্ব ইতি।" - প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারণাসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৭৮ – ৫৮০।

[৪৪] "যশ্চানুমেয়ে বিদ্যমানস্তৎসমানাসমানজাতীয়য়োরসন্নেব সোঽন্যতরাসিদ্ধোঽনধ্যবসায়হেতুত্বাদনধ্যবসিতঃ, যথা সৎকার্যমুৎপত্তেরিতি।" – প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারণাসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৯৩।

বিপক্ষে লিঙ্গটির অভাব থাকবে – এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সন্দিগ্ধরূপ অনপদেশ বারিত হয়েছে। অর্থাৎ, বিপক্ষাসত্ত্ব ধর্মের অভাব থাকলে উপস্থাপিত হেতুটি সৎ হেতুরূপে গণ্য হবে না, সেটি সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসরূপে বিবেচিত হবে। যেমন, যদি কোন অনুমানে পক্ষে সাধ্য সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হেতুটি পক্ষে, সপক্ষে, এবং বিপক্ষে বিদ্যমান থাকে তাহলে উক্ত হেতুটিকে সৎ হেতুরূপে গণ্য করা যাবে না, সেটি সন্দিগ্ধ হেত্বাভাস হবে। কারণ, হেতুটি যেহেতু পক্ষে, সপক্ষে এবং বিপক্ষে বিদ্যমান থাকে তাই উক্ত হেতুর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি না যে, হেতুটি যে পক্ষে বিদ্যমান সেই পক্ষে সাধ্য বিদ্যমান নাকি সাধ্যের অভাব বিদ্যমান। অর্থাৎ পক্ষে সাধ্য এবং সাধ্যাভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাই হেতুরূপে গৃহীত পদার্থটিকে সৎ হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না, সেটি সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত হয়। যেমন, কোন ঝোপের আড়ালে অবস্থিত পশুর বিষাণ দেখে যদি কেউ অনুমান করেন ‘ঐ পিণ্ডটি গো কারণ পশুটির বিষাণ আছে’ তাহলে বিষাণরূপ হেতুটি সৎ হেতুরূপে গণ্য করা যাবে না। কারণ, বিষাণত্বরূপ হেতুটি গোরূপ সপক্ষে এবং মহিষরূপ বিপক্ষেও বিদ্যমান। ফলে বিষাণত্বরূপ হেতুটি সন্দেহের উদ্রেক করে যে বিষাণত্ব বিশিষ্ট উক্ত পিণ্ড গো না মহিষ। অতএব, বিষাণত্বকে সৎ হেতুরূপে গ্রহণ না করে সন্দিগ্ধ হেত্বাভাস বলতে হবে।[৪৫]

[৪৫] “যস্তু সন্ননুমেয়ে তৎসমানাসমানজাতীয়য়োঃ সাধারণঃ সন্নেব স সন্দেহজনকত্বাত্ সন্দিগ্ধঃ, যথা – যস্মাদ্ বিষাণী তস্মাদ্ গৌরিতি।” প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারণাসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৮১।

প্রশস্তপাদাচার্য সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে আর এক প্রকার সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসের কথা বলেছেন। তাঁর মতে কোন কোন সম্প্রদায় মনে করেন, যেখানে একটি বিশেষ পক্ষে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ সাধ্যের সাধক তুল্য বলশালী হেতু বিদ্যমান। যেমন, মনরূপ পক্ষে মূর্তত্ব সাধক হেতুরূপে যদি ক্রিয়াবত্ত্বকে গ্রহণ করা হয় অপরদিকে যদি কেউ উক্ত পক্ষে অমূর্তত্বের সাধক হেতুরূপে অস্পর্শবত্ত্বের উল্লেখ করেন তাহলে মধ্যস্থের এইরূপ সংশয় উৎপন্ন হয় যে, মন মূর্ত না অমূর্ত। কারণ, মনরূপ পক্ষে ক্রিয়াবত্ত্ব এবং অস্পর্শবত্ত্ব উভয়ই সমানরূপে বিদ্যমান থাকায় উক্ত হেতু দুটি তুল্য বলশালী। উক্ত হেতু দুটি তুল্য বলশালী হওয়ায় এবং কোন একটির পক্ষে অনুকূল তর্ক না থাকায় হেতু দুটির কোন একটি সাধ্য সাধনে সমর্থ হতে পারে না। ফলে মধ্যস্থ মনরূপ পক্ষে কোন একটি নির্দিষ্ট সাধ্যের অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হতে পারে না। তাঁর মধ্যে মনরূপ পক্ষে মূর্তত্ব এবং অমূর্তত্বের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয়ের উদ্রেক করে। এই সংশয়ের কারণ মনরূপ পক্ষে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের সাধক তুল্য বলশালী হেতুদ্বয়। তাই উক্ত হেতুদ্বয়ে সৎ হেতুরূপে গণ্য না করে সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসরূপে গণ্য করতে হবে।[৪৬]

[৪৬] "একস্মিংশ্চ দ্বয়োর্হেত্বোর্যথোক্তলক্ষণয়োর্বিরুদ্ধয়োঃ সন্নিপাতে সতি সংশয়দর্শনাদয়মন্য সন্দিগ্ধ ইতি কেচিত্। যথা – মুর্ত্তত্বামর্ত্তত্বং প্রতি মনসঃ ক্রিয়াবত্ত্বাস্পর্শবত্ত্বয়োরিতি।" প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারণাসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৮১ – ৫৮৪।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে প্রকরণসম হেত্বাভাসটি অনধ্যবসিত হেত্বাভাসের অন্তর্গত, স্বতন্ত্র হেত্বাভাস নয়।[৪৭] তাঁর উক্ত অভিমতের সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে কন্দলীকার বলেছেন, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী প্রযুক্ত হেতুদ্বয় পৃথক পৃথক ভাবে পক্ষে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ক সংশয়ের জনক হতে পারে না। কারণ, পৃথক পৃথক ভাবে হেতুদ্বয় নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের সাধকই হয়ে থাকে। বাদী যখন শব্দরূপ পক্ষে অনিত্যত্বরূপ সাধ্য সাধনের জন্য নিত্যধর্মের অনুপলব্ধিরূপ হেতু প্রয়োগ করেন তখন উক্ত হেতুটি পৃথকভাবে সাধ্য সাধনে সক্ষম, যতক্ষণ না প্রতিবাদী তুল্যবলশালী অনিত্য ধর্মের অনুপলব্ধি রূপ হেতু প্রয়োগ করেন। অপরদিকে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়প্রযুক্ত হেতুদ্বয় একত্রেও সংশয়ের জনক হতে পারে না। কারণ, উক্ত হেতুদ্বয়ের সম্মিলিতরূপটি কেবলমাত্র পক্ষেই বিদ্যমান, সপক্ষে ও বিপক্ষে অবিদ্যমান। কন্দলীকারের মতে হেতুরূপে যেটি প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি যদি কেবল পক্ষবৃত্তি হয় তাহলে সেটিকে সৎ হেতুরূপে গণ্য করা যায় না, সেটি অনধ্যবসিত হেত্বাভাস। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে নৈয়ায়িক স্বীকৃত প্রকরণসম হেত্বাভাসটি স্বতন্ত্র কোনও হেত্বাভাস নয়।

প্রশস্তপাদাচার্য নিদর্শনরূপ অবয়বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমেই নিদর্শনকে সাধর্ম্য নিদর্শন ও বৈধর্ম্য নিদর্শন ভেদে দুই প্রকারে বিভক্তরূপে উল্লেখ

[৪৭] "নন্বয়মসাধারণ এবাচাক্ষুষত্বপ্রত্যক্ষত্ববত্ সংহতয়োরন্যতরপক্ষাসম্ভবাত্। ততশ্চানধ্যবসিত ইতি বক্ষামঃ।" – প্রশস্তপাদাচার্য, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারণাসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৮৬ – ৫৮৭।

করেছেন।[৪৮] এদের মধ্যে সাধ্যসামান্যের সাথে হেতুসামান্যের অনুগম বা, আনুগত্য বা, অন্বয় দেখানো হয় যে বাক্যের দ্বারা সেই বাক্যকে সাধর্ম্য নিদর্শন বলা হয়। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, যে বাক্যের দ্বারা সাধ্যের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শনপূর্বক হেতুর ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করা হয়, তা হল সাধর্ম্য নিদর্শন। সাধর্ম্য নিদর্শনের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে প্রশস্তপাদ বলেছেন যে, যা যা ক্রিয়াবান্, তা তা হয় দ্রব্য যেমন – শর বা তীর।[৪৯] এখানে উক্ত বাক্যে সাধ্য সামান্য যে দ্রব্যত্ব তার সাথে ক্রিয়াবত্ত্বরূপ হেতু সামান্যের আনুগত্য বা, অন্বয় উক্ত বাক্যে দেখানো হয়েছে বলে উক্ত বাক্যটি হল সাধর্ম্য নিদর্শন নামক অবয়ব বাক্য। এখানে দ্রব্যত্বের ব্যাবৃত্তি দ্বারা ক্রিয়ার ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ যাতে দ্রব্যত্ব থাকে না, তাতে ক্রিয়া থাকে না যেমন – গুণ ইত্যাদি। আর সাধ্যের সাথে হেতুর অনুগম অর্থাৎ অন্বয় দৃষ্টান্ত বলতে গিয়ে শরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে কেননা, শর বা তীরের যেমন ক্রিয়া আছে, তেমনি তীরে দ্রব্যত্বও থাকে।

আর অনুমেয় অর্থাৎ সাধ্য – এর অভাবের সাথে লিঙ্গ সামান্যের অভাবের অনুগম যে বাক্যে দেখানো হয় সেই বাক্যকে বৈধর্ম্য নিদর্শন বলা হয়। অর্থাৎ অনুমেয় বিপর্যয়ে বা সাধ্যের অভাবে লিঙ্গ বা হেতুর অভাব প্রতিপাদিত হয় যে বাক্যের দ্বারা তা

---

[৪৮] 'দ্বিবিধং নিদর্শনং সাধর্ম্যেণ বৈধর্ম্যেণ চ।' – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৯৮।

[৪৯] 'তত্রানুমেয়সামান্যেন লিঙ্গসামান্যস্যানুবিধানদর্শনং সাধর্ম্যনিদর্শনম্। তদ্যথা যত্ ক্রিয়াবত্ তদ্ দ্রব্যং দৃষ্টং যথা শর ইতি।' – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৯৮ – ৫৯৯।

হল বৈধর্ম্য নিদর্শন। যেমন – যা যা দ্রব্য হয় না (বা, যা যা অদ্রব্য), তা তা ক্রিয়াবান্ হয় না (তা তা অক্রিয়াবান্), যথা – সত্তা নামক পরাজাতি।[৫০] এই বাক্যে দ্রব্যত্বাভাবরূপ সাধ্যের অভাবস্থলে ক্রিয়াবত্ত্বরূপ হেতুর অভাব প্রদর্শন করা হয়ে থাকে কেননা, সত্তাতে যেমন দ্রব্যত্বাভাব থাকে, তেমনি ক্রিয়ারও অভাব থাকে।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে নিদর্শনের এইরূপ স্বরূপ নিরূপণের দ্বারা লিঙ্গাসিদ্ধ, অনুমেয়াসিদ্ধ, উভয়াসিদ্ধ, আশ্রয়াসিদ্ধ, অননুগত এবং বিপরীতানুগতরূপ ছয় প্রকার সাধর্ম্য নিদর্শনাভাস এবং লিঙ্গাব্যবৃত্ত, অনুমেয়াব্যবৃত্ত, উভয়াব্যবৃত্ত, আশ্রয়াসিদ্ধ, অব্যবৃত্ত এবং বিপরীতব্যবৃত্তরূপ ছয় প্রকার বৈধর্ম্য নিদর্শনাভাস বারিত হয়।[৫১] এখানে সপক্ষসত্ত্বাভাস এবং বিপক্ষাসত্ত্বাভাস বারিত হয়েছে; সুতরাং বলা যায়, এই বাক্যের দ্বারা হেতুর সপক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষাসত্ত্ব – এই দুটি রূপের বোধ উৎপন্ন হয়েছে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, এই প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য নিদর্শনাভাসের স্বরূপ আলোচনা করলেও বর্তমানে আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকছি।

---

[৫০] 'অনুমেয়বিপর্যয়ে চ লিঙ্গস্যাভাবদর্শনং বৈধর্ম্যনিদর্শনম্, তদ্যথা যদদ্রব্যং তত্ ক্রিয়াবন্ন ভবতি যথা সত্তেতি।' – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৯৯।

[৫১] প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৯৯ – ৬০৫।

নিদর্শন নামক অবয়ব আলোচনার পর প্রশস্তপাদাচার্য অনুসন্ধান নামক অবয়বের কথা আলোচনা করেছেন। নিদর্শনে সাধ্যের সাথে ব্যাপ্তিযুক্তরূপে জ্ঞাত লিঙ্গসামান্যকে পক্ষবৃত্তিরূপে বোঝানোর জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা হয় তাকে অনুসন্ধান বলা হয়ে থাকে।[৫২] লিঙ্গসামান্য অনুমেয়ে আছে – এইভাবে কেবল পক্ষবৃত্তিত্বরূপে কথিত হলে হেতুসামান্যে সাধ্যসামান্যের সাধন বা উপপাদন করার সামর্থ্য উপলব্ধি করা যায় না। সেহেতু নিদর্শনে সাধ্যসামান্যের সাথে বৃত্তিত্বরূপে জ্ঞাত লিঙ্গ সামান্যকে পক্ষে সত্ত্বার জ্ঞাপন যে বাক্যের দ্বারা করা হয় তাকেই সাধর্ম্য অনুসন্ধান বলা হয়। যেমন – বায়ুতে ক্রিয়বত্ত্ব হেতুর দ্বারা দ্রব্যত্বের অনুমান করা হলে শর বা তীরকে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করা যায়। তারপর তীররূপ দৃষ্টান্তে দ্রব্যত্বের সাথে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত অর্থাৎ দ্রব্যত্বের ব্যাপ্যরূপে জ্ঞাত ক্রিয়াবত্ত্বরূপ হেতুকে বায়ুরূপ পক্ষে জ্ঞাপন করাবার জন্য 'বায়ুতেও ক্রিয়া আছে' – এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করলে উক্ত অনুমানে ব্যবহৃত ঐ বাক্যকে সাধর্ম্য অনুসন্ধান বলা হয়।

ন্যায়কন্দলীতে কথিত বৈধর্ম্য নিদর্শনে অর্থাৎ বিপক্ষে অনুমেয়ের বা, সাধ্যের অভাবের সাথে জ্ঞাত হেতুর অভাবকে যে বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপন করা হয়, তাকে বৈধর্ম্য অনুসন্ধান বলা হয়। যেমন – কেউ যদি বায়ুতে ক্রিবাবত্ত্ব হেতুর দ্বারা দ্রব্যত্বের অনুমানের জন্য, 'যা যা দ্রব্য নয়, তা তা ক্রিয়াবান্ নয়, যথা – সত্তা' – এইরূপ বৈধর্ম্য

---

[৫২] 'নিদর্শনেঽনুমেয়সামান্যেন সহ দৃষ্টস্য লিঙ্গসামান্যমনুমেয়েঽন্বনয়নমনুসন্ধানম্।' – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬০৬।

নিদর্শন প্রয়োগ করে, যেহেতু সত্তাতে দ্রব্যত্বও নেই, আবার ক্রিয়াবত্ত্বও নেই, তাহলে উক্ত বাক্য থেকে সত্তাতে দ্রব্যত্বাভাবের সাথে জ্ঞাত ক্রিয়াবত্ত্বাভাবের অসত্তা বায়ুতে প্রতিপাদন করতে গিয়ে ‘সত্তার ন্যায় বায়ু ক্রিয়াশূণ্য নয়’ – এইরূপ যে বাক্য প্রয়োগ করা হয় তা বৈধর্ম্য অনুসন্ধান বলে কথিত হয়ে থাকে।

অনুসন্ধানের পর প্রশস্তপাদাচার্য প্রত্যাম্নায় নামক পঞ্চমতম অবয়বটির বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে আম্নায় কথাটির অর্থ হলো প্রতিজ্ঞা, আর প্রত্যাম্নায় হলো তাই, যা প্রতিজ্ঞার পুনর্বচন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিজ্ঞার পুনর্বচনকেই প্রত্যাম্নায় বলা হয়ে থাকে। প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা অনুমেয়ে অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যবত্ত্বরূপে সাধ্য কথিত হলেও উপযুক্ত সমর্থ হেতুর সম্বন্ধ প্রতিপাদন ব্যতীত অনিশ্চিত সাধ্যকে দ্বিতীয়বার অপরের নিকট নিশ্চিতভাবে বোঝানোর জন্য পুনরায় প্রযুক্ত উপযুক্ত হেতুর সাথে সম্বন্ধ যুক্ত সাধ্যের বোধক প্রতিজ্ঞা বাক্যকে প্রত্যাম্নায় বলা হয়।[৫৩] অভিপ্রায় হলো এই যে, কেবল প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা সাধ্য অনুমেয়রূপে কথিত হলেও বোদ্ধা পুরুষের কাছে তা অনিশ্চিত বা সন্দিগ্ধ থেকে যেতে পারে। যেহেতু পক্ষধর্মতা ও ব্যাপ্তির নিশ্চয় ব্যতীত বোদ্ধা পুরুষের কাছে পক্ষে সাধ্যবত্ত্বার নিশ্চয়ত্বের জ্ঞান হয় না। কিন্তু যখন বোধয়িতা পুরুষ অপদেশ প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ করে বোঝাতে থাকেন, তখন বোদ্ধা পুরুষের ঐ সকল বাক্য হতে নিজের বোঝার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। ঐ প্রকার বোদ্ধা পুরুষের সাধ্যের নিশ্চিতরূপে বোধক বাক্যকে প্রত্যাম্নায় বলা হয়। যেমন – ক্রিয়াবত্ত্ব হেতুর দ্বারা

---

[৫৩] প্রশস্তপাদা, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১১।

বায়ুতে দ্রব্যত্বের অনুমিতির জন্য প্রযুক্ত 'তস্মাৎ বায়ুঃ দ্রব্যম্' – এইরূপ ন্যায়বাক্য প্রত্যাম্নায় নামে কথিত হয়। এই প্রত্যাম্নায় বাক্য প্রযুক্ত না হলে অবশিষ্ট চারটি বাক্য পরস্পর মিলিত বা স্বতন্ত্র কোনোভাবেই প্রত্যাম্নায়ের দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থের প্রতিপাদন ঘটাতে সমর্থ হয় না। সেইজন্য অন্যান্য চারটি অবয়ব থাকলেও প্রত্যাম্নায় বাক্যের অসাধারণ প্রয়োজন আছে। তাই প্রত্যাম্নায় বাক্যের বৈয়র্থ্যের আশঙ্কা থাকতে পারে না।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে বৈশেষিক মতে ন্যায়-মহাবাক্যের অবয়ব প্রতিজ্ঞাদি ভেদে পাঁচ প্রকার। প্রশস্তপাদাচার্য 'পঞ্চ' পদের দ্বারা কণ্ঠতোই এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছেন। কিন্তু অবয়বগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রত্যাম্নায় বাক্যের পূর্বে অতএব চিহ্ন থাকলেও প্রতিজ্ঞা বাক্যের পূর্বে তা থাকে না; এটি ব্যতীত প্রতিজ্ঞা বাক্য এবং প্রত্যাম্নায় বাক্যের গঠনগত কোন প্রভেদ নেই। অপরদিকে, অপদেশ বাক্য এবং অনুসন্ধান বাক্যের মধ্যেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

ন্যায়সূত্রভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্যের চরম ফল প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই ন্যায়বাক্যে প্রমাণচতুষ্টয় মিলিত হয়ে সাধ্য পদার্থকে সিদ্ধ করে। অবয়বসমূহরূপ (প্রতিজ্ঞাদি) বাক্যে প্রমাণসমূহ (যথাক্রমে শব্দ, অনুমান, প্রত্যক্ষ ও উপমান প্রমাণ) মিলিত হয়ে পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ অর্থকে অর্থাৎ সাধ্য পদার্থকে সিদ্ধ করে। প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দবিষয় অর্থাৎ আগমরূপ শব্দপ্রমাণমূলক, হেতুবাক্য অনুমানপ্রমাণমূলক, তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্য প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক; এবং চতুর্থ অবয়ব উপনয় উপমান প্রমাণমূলক। পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের একার্থবোধে

সামর্থ্যপ্রদর্শক অর্থাৎ পরস্পর আকাঙ্ক্ষারূপ সামর্থ্যের বোধক বাক্যই হলো নিগমন। অর্থাৎ নিগমন বাক্যই পূর্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিপাদন করে, অন্য কোনো বাক্য তা করতে পারে না, সুতরাং সর্বশেষে নিগমন বাক্য অবশ্য বক্তব্য।

প্রশস্তপাদাচার্য প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োজন সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের প্রতিপাদক বাক্য প্রয়োগের পূর্বে হেতুর আশ্রয় অর্থাৎ পক্ষের প্রতিপাদন করা প্রয়োজন। পক্ষ প্রতিপাদনের জন্য পক্ষের প্রতিপাদক প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে।[৫৪] আচার্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে ন্যায়কন্দলীকার বলেন, যে কোন আশ্রয়ে সাধ্য সিদ্ধির জন্য হেতু প্রয়োগ হয় না। কারণ, সামান্যতো সাধ্য কোন একটি আশ্রয়ে সিদ্ধই আছে। অতএব কোন একটি বিশেষ স্থানে, যেখানে সাধ্যের অস্তিত্বের জ্ঞান পূর্ব হতে নেই এবং যেখানে সাধ্যের সিদ্ধি অভীষ্ট, সাধ্য সিদ্ধির জন্যই হেতুর প্রয়োগ হয়ে থাকে। এখন যদি উক্ত ধর্মীর প্রতিপাদনই না করা হয় তাহলে ঐ বিশেষ ধর্মীতে সাধ্য সিদ্ধির জন্য হেতু প্রয়োগের প্রবৃত্তি হতে পারে না। আর হেতু প্রয়োগের প্রবৃত্তি না হলে সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব নয়। সুতরাং, সাধ্য সিদ্ধি করতে হলে যে আশ্রয়ে সাধ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হেতু প্রযুক্ত হচ্ছে সেই আশ্রয়ের প্রতিপাদন অবশ্যই করতে হবে; এবং উক্ত আশ্রয় তথা পক্ষের প্রতিপাদক বাক্যরূপে প্রতিজ্ঞা বাক্যকে ন্যায়

[৫৪] 'অপদেশবিষয়মাপাদয়িতুমুদ্দেশমাত্রং প্রতিজ্ঞা।' – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৬।

মহাবাক্যের অবয়বরূপে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।[৫৫] এক্ষেত্রে শ্রীধরাচার্য ন্যায়সূত্রভাষ্যকার বাৎস্যায়নও যে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন তার উল্লেখ করেছেন। ন্যায়সূত্রভাষ্যকারের মতে সর্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা বাক্যের উল্লেখ না করলে হেতুবাক্য প্রভৃতি নিরাশ্রয় হয়ে যাবে ফলে হেতুবাক্যদি প্রয়োগের প্রবৃত্তি হবে না। হেতুবাক্য প্রয়োগের প্রবৃত্তি না হলে সাধ্যসিদ্ধিও সম্ভব হবে না। তাই ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে প্রতিজ্ঞা বাক্যকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।[৫৬]

কিন্তু, প্রশ্ন হল – অনুসন্ধান তথা উপনয় রূপ অবয়বের দ্বারাই তো পক্ষের জ্ঞান সম্ভব, তাহলে পক্ষের জ্ঞানের জন্য অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন কি? এর উত্তরে বলা যায়, পূর্বে প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ না করলে হেতু বাক্য প্রয়োগেরই প্রবৃত্তি হবে না। আর হেতু বাক্য প্রয়োগের প্রবৃত্তি না হলে নিদর্শন এবং অনুসন্ধান বাক্য প্রয়োগেরও প্রবৃত্তি হতে পারে না। কারণ, নিদর্শন বাক্যের উদ্দেশ্য হল পূর্বে প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যে যেটিকে সাধ্যধর্মরূপে এবং হেতু বাক্যের দ্বারা যেটিকে হেতুরূপে প্রতিপাদন করা হয়েছে সেই দুটির মধ্যে অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি প্রদর্শন। অপরদিকে, অনুসন্ধান বাক্যের উদ্দেশ্য হল পক্ষে যে হেতুটি বিদ্যমান সেটি যে উক্ত

---

[৫৫] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৬ – ৫৬৭।

[৫৬] 'অসত্যাং প্রতিজ্ঞায়ামনাশ্রয়া হেত্বাদয়ো ন প্রবর্ত্তেরন্। অসতি হেতৌ কস্য সাধনভাবং প্রদর্শ্যেত।' -- ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১ *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ৩২৫।

সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সেটি প্রদর্শন। এখন প্রতিজ্ঞা বাক্যের অভাবে যদি হেতু বাক্যেরই প্রবৃত্তি না হয় তাহলে হেতু পরবর্তী বাক্যগুলিরও প্রবৃত্তি হবে না। সুতরাং, প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োজন অস্বীকার করে অনুসন্ধানের দ্বারা পক্ষের জ্ঞান স্বীকার করা যায় না।[৫৭] ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে প্রতিজ্ঞা বাক্যকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

ন্যায়বাক্যের দ্বিতীয় অবয়ব হেতু বাক্যের প্রয়োজন ব্যক্ত করতে গিয়ে ন্যায়কন্দলীকার প্রথমে অনুসন্ধান বাক্য বা উপনয় বাক্যের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। উপনয় বাক্যের দ্বারা যেহেতু ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব প্রদর্শিত হয়ে থাকে তাই পূর্বপক্ষী মনে করতে পারেন উপনয় বাক্য যদি ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে আবশ্যিক হয় তাহলে উপনয় বাক্যের অতিরিক্ত হেতু বাক্যের প্রয়োগ নিষ্ফল বলতে হবে।[৫৮]

এর উত্তরে শ্রীধরাচার্য বলেন, হেতু বাক্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কারণ, হেতু বাক্যের দ্বারা হেতু প্রদর্শিত না হলে হেতুর কোন সামর্থ্য বশতঃ সাধ্য সাধনে সমর্থ হয় সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হবে না। আর উক্ত প্রকার জিজ্ঞাসার অভাবে উদাহরণাদি বাক্যের প্রবৃত্তিই হবে না। অর্থাৎ উপনয় বাক্য প্রয়োগের প্রবৃত্তি নির্ভর করে

---

[৫৭] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫৬৭ – ৫৬৮।

[৫৮] 'অস্তু তর্হ্যুপনয়ঃ, ব্যর্থং হেতুবচনম্।' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১০।

হেতু বাক্য প্রয়োগের উপর তাই উপনয় বাক্য স্বীকার করলে হেতু বাক্য ব্যর্থ এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।[৫৯]

ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে অনুসন্ধান বা উপনয় বাক্যের প্রয়োজন ব্যক্ত করতে গিয়ে শ্রীধরাচার্য প্রথমে পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ জ্ঞাত হয়েই হেতু বাক্য প্রযুক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ হেতু বাক্যে কোন পদার্থকে হেতুরূপে উপস্থাপনের মূলে যে জ্ঞান থাকা আবশ্যক সেটি হল – যে পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হয়েছে সেই পদার্থের সঙ্গে যে পদার্থকে সাধ্যরূপ গ্রহণ করা হয়েছে তারা সর্বদা একত্রে থাকে, এবং হেতুরূপে গৃহীত পদার্থটি সাধ্যের অভাবের অধিকরণ বা ব্যধিকরণে থাকে না। অতএব যখন হেতুবাক্যে কোন পদার্থকে হেতুরূপে উপস্থাপন করা হয় তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে হেতুটিতে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে। অর্থাৎ হেতু বাক্যের দ্বারাই ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান হয়ে যায়। তাই ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে হেতু বাক্যের অতিরিক্ত অনুসন্ধান বা উপনয় বাক্য প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নেই।[৬০]

পূর্বপক্ষিগণের এইরূপ অভিমতের বিরুদ্ধে শ্রীধরাচার্য বলেন ন্যায়বাক্যে প্রযুক্ত হেতু বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান সম্ভব হয় বলে যদি অনুসন্ধান

---

[৫৯] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫১০।

[৬০] 'হেতুত্বাভিধানসামর্থ্যাদেব পক্ষধর্মত্বং প্রতীয়তে, ব্যধিকরণস্যাসাধকত্বাদিতি চেত্?' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬০৬।

বাক্য অর্থাৎ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের বোধক বাক্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয় তাহলে নিদর্শন বাক্যের প্রয়োজন অস্বীকার করতে হবে। কারণ, নিদর্শন বাক্যের উদ্দেশ্যই হল হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধের ব্যাপ্তি প্রদর্শন। নিদর্শন বাক্য প্রয়োগের পূর্বে প্রযুক্ত হেতু বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান স্বীকার করলে ব্যাপ্তি বোধক নিদর্শন বাক্যকে ব্যর্থ বলতে হবে।[৬১]

এর উত্তরে পূর্বপক্ষিগণ বলতে পারেন হেতু বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ, সাধ্যের সঙ্গে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট নয় এমন বস্তুকেও হেতুরূপে গ্রহণ করে হেতু বাক্যের দ্বারা অভিধান করা যেতে পারে। যেমন, শব্দরূপ পক্ষে নিত্যত্ব স্থাপনের জন্য শ্রাবণত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করে হেতু বাক্যের প্রয়োগ হতে পারে। এক্ষেত্রে হেতুটির কেবলমাত্র পক্ষবৃত্তিত্ব আছে। হেতু বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান স্বীকার করলে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট শ্রাবণত্বের শব্দরূপ পক্ষবৃত্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। কিন্তু, আমরা জানি শ্রাবণত্বের সঙ্গে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নেই। অতএব আমাদের স্বীকার করতে হবে, কেবল হেতু বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান সম্ভব নয়। হেতু বাক্যের পরে প্রযুক্ত নিদর্শন বা উদাহরণ

[৬১] 'তদভিধানসামর্থ্যাদ্ ব্যাপ্তিরপি তু লক্ষ্যতে, অনন্বিতস্য হেতুত্বাভাবাদিত্যুদাহরণমপি ন বাচ্যম্।' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬০৮।

বাক্যের দ্বারা আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট। তাই ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে নিদর্শন বাক্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।[৬২]

এর উত্তরে ন্যায়কন্দলীকার বলেন, হেতু বাক্যের দ্বারা যেহেতু সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান হয় না তাই উদাহরণ বাক্যের দ্বারা উপস্থাপিত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুই যে পক্ষে আছে সেটি বোঝানোর জন্য উদাহরণ বাক্যের পরে অনুসন্ধান বা উপনয় বাক্য প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় বোঝা যাবে না যে, হেতু বাক্যে প্রযুক্ত হেতু এবং উদাহরণ বাক্যে উপস্থাপিত ব্যাপ্তির মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে।

এর বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষিগণ বলতে পারেন, উপনয় বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের নিশ্চয় অবশ্যই হবে এইরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। কারণ, ভ্রান্তি বশতঃ পক্ষে অবৃত্তি বস্তুকে গ্রহণ করেও উপনয় বাক্যের প্রয়োগ হতে পারে। ফলে, উপনয় বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান হবেই একথা বলা যায় না।[৬৩]

উত্তরে বলা যায়, অনুরূপ আপত্তি উদাহরণ বাক্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভ্রান্তি বশতঃ যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নেই সেই হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্যও

---

[৬২] 'অসাধারণস্যাপি ভ্রান্তা হেতুত্বাভিধানোপপত্তের্ন তস্মাদেকান্তেনান্বয়প্রতীতিরস্তীত্যুদাহরণেন ব্যাপ্তিরূপদর্শ্যত ইতি চেত্।' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬০৮।

[৬৩] 'অসিদ্ধস্য ভ্রমাদুপনয়োঽপি দৃশ্যতে কথং তস্মাদপি পক্ষধর্মতাসিদ্ধিরিতি চেত্?' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬০৮ – ৬০৯।

উদাহরণ বাক্যের প্রয়োগ হতে পারে। আর যদি বলা হয় যে উদাহরণ বাক্য কেবল বাক্য বলেই ব্যাপ্তির বোধক হয়ে থাকে এমন নয় বরং, উদাহরণ বাক্যে ব্যাপ্তির বোধক প্রমাণরূপ শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে বলেই উদাহরণ বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তির বোধ হয়ে থাকে। তাহলে বলা হবে যে, উপনয় বাক্যও কেবল বাক্য বলেই সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের বোধক নয় বরং, উপনয় বাক্যে সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের বোধক প্রমাণরূপ শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে বলেই উপনয় বাক্য সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের বোধক হয়ে থাকে।[৬৪]

এর বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষিগণ বলতে পারেন যে, হেতু বাক্যের উদ্দেশ্য হল – সাধ্যের সাধক হেতুর প্রদর্শন। কোন একটি বস্তুকে সাধ্যের সাধক তথা হেতুরূপে তখনই গ্রহণ করা যাবে যখন আমরা জানতে পারব যে হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট। সুতরাং, হেতু বাক্যের দ্বারা হেতুর জ্ঞান হয় এরূপ স্বীকার করলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, হেতু বাক্যের দ্বারা সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুরই জ্ঞান হয়।

এর উত্তরে ন্যায়কন্দলীকার বলেন, অনুরূপ অভিমত উদাহরণ বাক্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি হেতু বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর জ্ঞান হয়েই যায় তাহলে উদাহরণ বাক্যের কি প্রয়োজন? এর উত্তরে পূর্বপক্ষিগণ যদি বলেন হেতু বাক্যের দ্বারা হেতুর

[৬৪] 'অসিদ্ধাবিনাভাবস্যাপি ভ্রান্তা ব্যাপ্তিবচনং দৃশ্যতে কথং তস্মাদন্বয়সিদ্ধিঃ?' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬০৯।

জ্ঞান হলেও ব্যাপ্তির জ্ঞান সম্ভব নয় তাহলে বলতে হবে হেতু বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর জ্ঞানও সম্ভব নয়।[৬৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীধরাচার্যের মতে পূর্বপক্ষিগণ যে যুক্তিতে উপনয় বাক্যকে ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন সেই একই যুক্তিতে উদাহরণ বাক্যকেও অপ্রয়োজনীয় বলতে হবে। কিন্তু পূর্বপক্ষিগণ যেহেতু ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে উদাহরণ বাক্যকে আবশ্যিক বলে মনে করেন সেই একই যুক্তিতে উদাহরণ বাক্যে প্রদর্শিত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞাপকরূপে অনুসন্ধান বা উপনয় বাক্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, অনুসন্ধান বাক্যের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করতে গিয়ে ন্যায়কন্দলীকার পরোক্ষভাবে উদাহরণ বাক্যের প্রয়োজনও প্রদর্শন করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে পূর্বপক্ষী বা সিদ্ধান্তী উভয় সম্প্রদায় অনুমানের আবশ্যিক অঙ্গ ব্যাপ্তির প্রদর্শক বাক্যরূপে নিদর্শন বা, উদাহরণ বাক্যকে ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে অবশ্যিক বলে মনে করেন। সুতরাং নিদর্শনের অনন্তর অনুসন্ধান বাক্যকেও ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে স্বীকার করতে হবে।

বাক্যগুলি ও তাদের দ্বারা যে জ্ঞানগুলি উৎপন্ন হয় বলে স্বীকার করা হয়েছে তা অনুমিতির সহায়ক বা উৎপাদক এই কথা স্পষ্ট। সুতরাং ‘বাক্য জন্য অনুমিতির জনক

---

[৬৫] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬০৯।

জ্ঞান উৎপন্ন হয়' – এই অর্থে ঐ বাক্য সমুদয়েও অনুমান শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

ন্যায়বাক্যের সর্বশেষ অবয়ব প্রত্যাম্নায় বাক্যের প্রয়োজন ব্যক্ত করতে গিয়ে কন্দলীকার বলেছেন, পূর্বপক্ষী বলতে পারেন, হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারাই সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব তাই প্রত্যাম্নায়রূপ পৃথক অবয়ব স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।[৬৬] এর উত্তরে প্রশস্তপাদাচার্য বলেন প্রত্যাম্নায় বাক্যের অভাবে প্রতিজ্ঞাদি অপর অবয়বগুলি একত্রে অথবা পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যাম্নায় বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থের বোধক হতে পারে না। সুতরাং ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে প্রত্যাম্নায় বাক্যকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।[৬৭] কিন্তু প্রশ্ন হল প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব একত্রে বা পৃথক ভাবে প্রত্যাম্নায় বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ প্রতিপাদনে অসমর্থ কেন? এর উত্তরে কন্দলীকার বলেছেন প্রতিজ্ঞাদি চার প্রকার অবয়ব পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ অর্থেরই কেবল প্রতিপাদন করতে সমর্থ হয়। প্রত্যাম্নায় বাক্যই প্রতিজ্ঞাদি পৃথক পৃথক অবয়বকে পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হতে সাহায্য করে। ফলে পঞ্চ অবয়বের দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ হয়ে থাকে। প্রত্যাম্নায় বাক্যের অভাবে প্রতিজ্ঞাদি চারটি বাক্য পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হতে পারে না বলে একত্রে

[৬৬] 'হেত্বাদিভিরবয়বৈরেব সাধ্যং নিশ্চীয়তে কিং প্রত্যাম্নায়েন?' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১২ – ৬১৩।

[৬৭] 'ন হ্যেতস্মিন্নসতি পরেষামবয়বানাং সমস্তানাং ব্যস্তানাং চ তদর্থবাচকত্বমস্তি, গম্যমানার্থত্বাদিতি চেত্, ...।' – প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, পদার্থধর্মসংগ্রহ, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১২ – ৬১৩।

কোন বিশিষ্ট অর্থের বোধক হতে পারেনা। সুতরাং, ন্যায়বাক্যের দ্বারা কোন বিশিষ্ট অর্থের বোধ হতে হলে প্রত্যাম্নায় বাক্যের প্রয়োগ আবশ্যই করতে হবে।[৬৮]

কিন্তু, আপত্তি হল স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে যে কারণ সমূহের সমাবেশ ঘটলে অনুমানকর্তা সাধ্যানুমানে সমর্থ হয় সেই কারণ সমূহের সমাবেশ ঘটলে পরার্থানুমান স্থলেও অনুমানকর্তা সাধ্যানুমানে সমর্থ হবে। অর্থাৎ স্বার্থানুমান স্থলে অনুমানকর্তা স্বয়ং যে কারণ সমূহের জ্ঞানের দ্বারা সাধ্যানুমানে সমর্থ হন পরার্থানুমানে ন্যায়বাক্য প্রয়োগের দ্বারা অনুমানকর্তাকে যদি সেই কারণ সমূহের জ্ঞান লাভে সমর্থ করা হয় তাহলে তিনিও সাধ্যানুমানে সমর্থ হবেন। পূর্বপক্ষিগণের অভিপ্রায় এই যে হেতুর পক্ষসত্ত্বাদি যে সামর্থ্যজন্য অনুমানকর্তা সাধ্য সাধনে সমর্থ হন সেই পক্ষসত্ত্বাদির জ্ঞান হেতু বাক্য, উদাহরণ বাক্য এবং উপনয় বাক্যের দ্বারাই সম্ভব। উদাহরণ বাক্যের দ্বারা আমরা জানতে পারি হেতুটি সপক্ষে বিদ্যমান এবং অসপক্ষে বা বিপক্ষে হেতুর অভাব বিদ্যমান। অর্থাৎ, হেতুর সপক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষাসত্ত্বের জ্ঞান উদাহরণ বাক্যের দ্বারাই হয়ে যায়। অপরদিকে হেতু বাক্য এবং উপনয় বাক্যের দ্বারা হেতুর পক্ষসত্ত্বের জ্ঞান হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, হেতু বাক্যে হেতুর যে জ্ঞান হয় তা শুধুমাত্র হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান, আর উপনয় বাক্যে সাধ্যের সঙ্গে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতু, সেই হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান হয়; তাই হেতু বাক্য ও উপনয় বাক্য উভয় বাক্য

---

[৬৮] 'প্রতিজ্ঞাদয়োঽবয়বাঃ প্রত্যেকং স্বার্থমাত্রেণ পর্যবসায়িনোঽসতি প্রত্যাম্নায়ে নৈকমর্থং প্রত্যায়য়িতুমীশতে, স্বতন্ত্রত্বাত্। সতি ত্বেতস্মিন্নাকাঙ্ক্ষোপগৃহীতা অঙ্গাঙ্গিভাবমুপগচ্ছন্তঃ শক্নুবন্তীতি যুক্তঃ প্রত্যাম্নায়ঃ।' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১২ – ৬১৩।

প্রয়োগের আবশ্যকতা অস্বীকার করা চলে না। অর্থাৎ, প্রত্যাম্নায় বাক্যের দ্বারা সাধ্য সিদ্ধির অনুকূল কোন কারণেরই জ্ঞান হয় না। তাই, হেতু বাক্যাদির অতিরিক্ত প্রত্যাম্নায় বাক্য বা নিগমন বাক্যকে ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।[৬৯]

এর উত্তরে বলা যায়, পক্ষসত্ত্ব বা, পক্ষধর্মতা, এবং ব্যাপ্তি অর্থাৎ সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্বই কেবল হেতুর সামর্থ্য নয়। কারণ, এই সামর্থ্যগুলি বিদ্যমান থাকলেও সৎপ্রতিপক্ষ এবং বাধিত হেতুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব হয় না। তাই হেতুকে সাধ্যের সাধক হতে হলে হেতুটিকে যেমন পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষসত্ত্বরূপ ধর্ম বিশিষ্ট হতে হবে তেমনি, হেতুটিকে অবাধিতবিষয়ত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্বরূপ ধর্ম বিশিষ্টও হতে হবে। অর্থাৎ, বৈশেষিক মতে সৎ হেতুর ধর্ম হলো পাঁচটি; যথা: পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষসত্ত্ব, অবাধিতবিষয়ত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব।[৭০] প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্যন্ত বাক্যের দ্বারা হেতুর পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, এবং বিপক্ষাসত্ত্বের জ্ঞান হলেও অবাধিতবিষয়ত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষত্ব জ্ঞান হয় না। অবাধিতবিষয়ত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষত্বের জ্ঞানের জন্য প্রত্যাম্নায়রূপ অবয়ব বাক্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যার দ্বারা শ্রোতার জ্ঞান হবে যে পক্ষে সাধ্যের অভাবের সাধক কোন হেতু নেই, এবং সাধ্যটি বাধিত নয়।[৭১]

---

[৬৯] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১৩ – ৬১৪।

[৭০] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১৪।

[৭১] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১৪ – ৬১৫।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে কেউ যদি অবাধিতবিষয়ত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষত্বকে হেতুর বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করতে অসম্মত হন; অর্থাৎ তাঁরা যদি হেতুর পক্ষসত্ত্বাদি তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যই স্বীকার করেন তাহলে প্রতিজ্ঞা বাক্য এবং হেতু বাক্যের দ্বারা উক্ত প্রয়োজন নির্বাহ সম্ভব হয়ে যায় বলে নিদর্শন বাক্য এবং অনুসন্ধান বাক্যের প্রয়োগও ব্যর্থ বলতে হবে। কারণ, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান যে ব্যক্তির আছে তিনি প্রতিজ্ঞা বাক্যের পরে হেতু বাক্য শ্রবণ করলে ব্যাপ্তির কারণ অন্বয় এবং ব্যতিরেক সহচারের স্মরণ হয়ে যাবে। ফলে হেতুর পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষাসত্ত্বের জ্ঞান হয়ে যাবে। অতএব, নিদর্শন এবং অনুসন্ধান বাক্যকে অনাবশ্যক বলতে হবে।[৭২]

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে প্রশস্তপাদাচার্য এবং শ্রীধরাচার্যের মতে যে বৈশিষ্ট্য বা সামর্থ্যজন্য হেতু সাধ্যের সাধক হয়ে থাকে সেগুলি হল – পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব এবং অবাধিতত্ব। শ্রোতার এই পাঁচ প্রকার বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়বের প্রয়োগ আবশ্যিক। এই অবয়বগুলির কোন একটির অভাব বিশিষ্ট ন্যায়বাক্যের দ্বারা হেতুর উক্ত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান সম্ভব নয় বলে পঞ্চাবয়ব বিশিষ্ট ন্যায়ই স্বীকার করতে হবে।

---

[৭২] 'গম্যমানার্থত্বাদিতি চেত্, ন, অতিপ্রসঙ্গাত্, তথা হি প্রতিজ্ঞানন্তরং হেতুমাত্রাভিধানং কর্ত্তব্যম্, বিদুষামন্বয়ব্যতিরেকস্মরণাত্ তদর্থাবগতির্ভবিষ্যতীতি, ...।' – শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *নায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১৩ – ৬১৪।

প্রশস্তপাদাচার্য এই সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন – ‘অনিত্যঃ শব্দঃ’ এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা শ্রোতার নিশ্চিতরূপে এই বোধ হয় না যে শব্দ অনিত্যত্বরূপ ধর্ম বিশিষ্ট। অর্থাৎ নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্বরূপ ধর্ম দ্বয়ের মধ্যে শব্দ কোন ধর্ম বিশিষ্ট এইরূপ প্রশ্নের সমাধানকল্পে যখন বলা হয় ‘শব্দ অনিত্য’ তখন শ্রোতার কেবলমাত্র এই বোধ হয় যে শব্দ অনিত্যত্ব ধর্ম বিশিষ্ট। তবে তিনি তখনও নিশ্চিত হতে পারেন না যে শব্দ অনিত্যত্ব ধর্ম বিশিষ্ট। তাই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে শব্দ অনিত্য কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ‘প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব’রূপ হেতুর প্রয়োগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রযত্নজন্যই অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই হেতু বাক্য থেকে শ্রোতার কেবলমাত্র এই বোধ হয়ে যে শব্দ প্রযত্নজন্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু, প্রশ্ন হল – শব্দ অনিত্য হওয়ার সঙ্গে সেটির প্রযত্নজন্যত্বের সম্বন্ধের কি? অর্থাৎ প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব হেতুটি কোন সামর্থ্যের ভিত্তিতে শব্দেকে অনিত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়? শ্রোতার এইরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য ‘যৎ প্রযত্নানন্তরীয়কং তদনিত্যং দৃষ্টম্, যথা ঘটঃ’ এই আকারের সাধর্ম্য নিদর্শন অথবা ‘নিত্যমপ্রযত্নানন্তরীয়কং দৃষ্টম্, যথাকাশমিতি’ এই আকারের বৈধর্ম্য নিদর্শন বাক্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই বাক্য থেকে শ্রোতার এই বোধ হয় যে জগতের যে সমস্ত বস্তু প্রযত্নজন্য উৎপন্ন হতে দেখা যায় তাদের অনিত্যও হতে দেখা যায়; যেমন – ঘট। অথবা, জগতের যে সকল বস্তু নিত্য তাদের প্রযত্নজন্য উৎপন্ন হতে দেখা যায় না; যেমন – আকাশ। এই বাক্য থেকে শ্রোতা বুঝতে পারে যে প্রযত্নজন্য সকল বস্তুর সঙ্গে অনিত্য বস্তুর ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রযত্নজন্যত্বটি সর্বদাই

অনিত্যত্বের আশ্রয়ে থাকে (সপক্ষসত্ত্ব) এবং অনিত্যত্বের অভাবের অধিকরণে থাকে না (বিপক্ষাসত্ত্ব)। কিন্তু, প্রশ্ন হল শব্দে যে প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব বিদ্যমান সেটিও কী অনিত্যত্বের সঙ্গে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট? শ্রোতার এইরূপ জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্য 'তথা চ প্রযত্নানন্তরীয়কঃ শব্দঃ' – এই আকারের অন্বয় অনুসন্ধান অথবা 'ন চ তথাকাশবদপ্রযত্নানন্তরীকঃ শব্দ' এই আকারের ব্যতিরেক অনুসন্ধান বাক্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতার এইরূপ জ্ঞান হয়ে থাকে যে ঘটে যেমন প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব বিদ্যমান শব্দেও অনুরূপ প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব বিদ্যমান। অথবা, আকাশে যেমন প্রযত্নানন্তরীয়কত্বের অভাব বিদ্যমান শব্দে অনুরূপ অভাব বিদ্যমান নেই। কিন্তু এর পরেও শ্রোতার মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হতে পারে যে প্রযত্নজন্যত্বের সঙ্গে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি প্রসিদ্ধ হলেও, এবং শব্দে প্রযত্নজন্যত্ব থাকলেও শব্দ অনিত্য নাও হতে পারে। অর্থাৎ, শব্দে অনিত্যত্বের অভাবের সাধক কোন হেতু থাকতে পারে অথবা শব্দে অনিত্যত্বটি বাধিত হতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনা নিরসনের জন্য 'তস্মাদনিত্যঃ শব্দঃ' এই আকারের প্রত্যাম্নায় বাক্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্বের অভাব তথা নিত্যত্বের সাধক কোন প্রমাণ নেই। অতএব শ্রোতা বুঝতে পারেন যে শব্দে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যটি বাধিত নয় এবং শব্দে অনিত্যত্বের অভাবের সাধক কোন হেতুও নেই।[৭৩]

[৭৩] প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, পদার্থধর্মসংগ্রহ, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬১৭ – ৬১৯।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, ন্যায়বাক্যের প্রত্যেকটি অবয়ব একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কোন একটির অভাবে ন্যায়বাক্যটি শ্রোতার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির মাধ্যমে প্রকৃত অর্থ উপস্থাপনে অসমর্থ হবে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, প্রশস্তপাদাচার্যের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে ন্যায়বাক্যের অবয়বরূপে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যই কেবল স্বীকার করতে হবে এমন নয়। যে ক্রমে অবয়ব বাক্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রোতার প্রতিজ্ঞাদি বাক্য শ্রবণজন্য যে যে ক্রমে যে যে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয় সেই সেই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য যে যে অবয়ব যে যে ক্রমে উল্লেখের প্রয়োজন সেই সেই ক্রমে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং, অবয়বগুলির উল্লেখ ক্রমেরও তাৎপর্য বিদ্যমান, ভিন্ন ক্রমে অবয়বগুলির উল্লেখ করলে শ্রোতার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হবে না। ফলে ন্যায়বাক্যটি প্রকৃত অর্থ উপস্থাপন করতে পারবে না।[৭৪] বাক্য প্রয়োগ জন্য প্রকৃত হেতুর ধর্মগুলির জ্ঞান হচ্ছে (অর্থাৎ হেতুটি বিভিন্ন দোষ হতে মুক্ত) – এই বিষয়টি স্পষ্ট; কিন্তু হেতুর জ্ঞানের ভিত্তিতে কিভাবে অনুমিতি উৎপন্ন হচ্ছে সেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্য সমুদয় শ্রবণ জন্য অনুমিতির উৎপাদক জ্ঞান মূলে শ্রোতার যে অনুমিতি তা সাধারণ অনুমিতি থেকে ভিন্ন। শ্রোতার সেই অনুমিতিই পরার্থানুমিতি নামে পরিচিত।

[৭৪] শ্রীধরাচার্য, ১৯৯৭, *ন্যায়কন্দলী*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৬০৭ – ৬০৮।

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায়মতে অনুমান

(ক)

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বৈশেষিকগণ শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার না করে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে, সমানতন্ত্র নৈয়ায়িক সম্প্রদায় শব্দকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত না করে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। সমানতন্ত্র বৈশেষিক সম্প্রদায় শব্দকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করলেও নৈয়ায়িকগণ কেন শব্দকে অনুমানরূপে স্বীকার করেন না সেটি উপলব্ধি করতে হলে নৈয়ায়িক সম্মত অনুমান ও শব্দ প্রমাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণ এবং উক্ত প্রমাণের ফল অনুমিতি ও শাব্দবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। বর্তমান এবং পরবর্তী অধ্যায়ে যথাক্রমে নৈয়ায়িক সম্মত অনুমান ও শব্দ প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা করা হবে।

নৈয়ায়িকগণ 'তৎপূর্বক' জ্ঞানকে অনুমান বলেছেন। কিন্তু, তৎপূর্বকত্বকে অনুমানের লক্ষণ ধর্ম বললে অনুমানের স্বরূপ বিষয়ে কিছুই বোঝা যাবে না যতক্ষণ না 'তৎ' শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝা যাবে। কারণ, 'তৎ' শব্দটি একটি অধ্রুবক শব্দ। তাই, 'তৎ' শব্দের দ্বারা যে কোন বিষয়কেই বোঝানো যেতে পারে। সাধারণতঃ 'তৎ' শব্দের দ্বারা অব্যবহিত পূর্ববর্তী আলোচিত বিষয়কেই গ্রহণ করা হয়। আমরা জানি অনুমানের লক্ষণ আলোচনার অব্যবহিত পূর্বে প্রত্যক্ষ আলোচিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাহলে,

“তৎ” শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষকে বোঝানো হয়েছে। প্রত্যক্ষ যেহেতু অনুমানের কারণ তাই অনুমানকে আমরা প্রত্যক্ষপূর্বক বলতেই পারি। সেক্ষেত্রে অনুমানের লক্ষণটি হবে প্রত্যক্ষপূর্বক যা, তাই অনুমান। কিন্তু, প্রত্যক্ষপূর্বকত্বকে অনুমানের লক্ষণ বললে অপর একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটে। প্রত্যক্ষজন্য যে সংস্কার উৎপন্ন হয় সেটিও প্রত্যক্ষপূর্বক হওয়ায় সংস্কারকেও অনুমান বলতে হবে। কিন্তু, প্রত্যক্ষজন্য উৎপন্ন সংস্কারকে নৈয়ায়িকগণ অনুমানরূপে স্বীকার করেন না। অর্থাৎ তাঁদের মতে প্রত্যক্ষপূর্বক যাবৎ পদার্থ অনুমান নয়। প্রত্যক্ষপূর্বক বিশেষ জ্ঞানকেই তাঁরা অনুমান বলেন। কিন্তু ‘প্রত্যক্ষপূর্বক যা, তাই অনুমান’ – এই লক্ষণ বিশ্লেষণ করলে যা কিছু প্রত্যক্ষপূর্বক তাকেই অনুমান বলতে হবে প্রত্যক্ষপূর্বক বিশেষ কিছুকে নয়। কারণ, “প্রত্যক্ষপূর্বক” শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষপূর্বক বিশেষ পদার্থ গ্রহণের অনুকূল কোন যুক্তি নেই। এই কারণে নৈয়ায়িকগণ তৎপূর্বকত্ব বা প্রত্যক্ষপূর্বকত্বকে অনুমানের লক্ষণ না বলে তৎপূর্বক জ্ঞানকে অনুমান বলেন। অর্থাৎ, নৈয়ায়িকগণের মতে প্রত্যক্ষপূর্বক যাবৎ পদার্থ অনুমান নয়। প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞান অনুমান। কিন্তু, মহর্ষি গৌতম পঞ্চম সূত্রে “জ্ঞান” শব্দের উল্লেখ করেননি তাহলে তৎপূর্বকত্ব বা প্রত্যক্ষপূর্বকত্বকে অনুমানের লক্ষণ না বলে তৎপূর্বক জ্ঞানকে অনুমানের লক্ষণ বলা হচ্ছে কেন? এই সমস্যার সমাধনে বলা হয় মহর্ষি পূর্ব সূত্রে “জ্ঞান” শব্দের প্রয়োগ করেছেন সেই “জ্ঞান” শব্দের অনুবৃত্তিই এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত। অর্থাৎ, “তৎপূর্বকং অনুমানং” বলতে “তৎপূর্বকং জ্ঞানমনুমানং” বুঝতে হবে।

"তৎপূর্বকং জ্ঞানমনুমানং" অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ পূর্বক জ্ঞান অনুমান – অনুমানের এই লক্ষণটিও সঙ্গত কিনা সেটি বিচার করা আবশ্যক। আমরা জানি নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের জ্ঞান অর্থাৎ অনুব্যবসায় স্বীকার করেন। অনুব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ব্যবসায়টি বিষয় হয়ে থাকে। যেমন, "অয়ম্ ঘটঃ" – এইরূপ ঘটের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের পর "ঘটমহং জানামি" এইরূপ অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই অনুব্যবসায়ের প্রতি পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ ব্যবসায়টি কারণ। অর্থাৎ, অনুব্যবসায়টিও প্রত্যক্ষ পূর্বক জ্ঞান। তাছাড়া, শাব্দবোধের ক্ষেত্রে শব্দের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। অতএব, শাব্দবোধকেও প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞান বলতে হবে। এমনকি উপমিতিও প্রত্যক্ষভিত্তিক জ্ঞান হওয়ায় সেটিও তৎপূর্বক জ্ঞান। ফলতঃ সেটিকেও অনুমানের লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে করতে হয়।[১] সুতরাং, অনুমানের লক্ষণটিকে দোষ মুক্ত বলা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে এইস্থলে প্রত্যক্ষ বলতে বিশেষ প্রত্যক্ষকেই বুঝতে হবে। আর সেই প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানকে অনুমান বলে।

কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ বিশেষ কি? এই বিশেষ প্রকার প্রত্যক্ষের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেছেন - কোন একটি অনুমান স্থলে অনুমানের যেটি প্রকৃত হেতু সেটিকে "লিঙ্গ" বলে। লিঙ্গটি যে পদার্থের লিঙ্গ বা অনুমাপক সেই অনুমেয়

[১] "'Tat' is a pronoun. It signifies percertion which follows from the context. The compound word 'tat pūrvakam' conveys that which owes its existence to perception. If the apparent meaning of the word is accepted, the definition of inference becomes too wide as it comprises 'comparison', 'the final ascertainment of a thesis' etc., within itself." – জয়ন্তভট্ট, ১৯৭৮, ন্যায়মঞ্জরী, জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক), ভল্যুম – I, দিল্লী: মোতিলাল বানারসিদাস, পৃষ্ঠা: ২৬১।

পদার্থকে "লিঙ্গী" বলে। যে সকল স্থানে লিঙ্গ পদার্থটি থাকে সেই সমস্ত স্থানেই লিঙ্গী পদার্থটি অবশ্যই থাকে। অর্থাৎ, লিঙ্গ পদার্থটিকে ব্যাপ্যরূপে এবং লিঙ্গী পদার্থটিকে ব্যাপকরূপে স্বীকার করতে হবে। লিঙ্গ পদার্থ ও লিঙ্গী পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে।[২] পূর্বে কোন স্থানে লিঙ্গ পদার্থ ও লিঙ্গী পদার্থের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষকে নৈয়ায়িকগণ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন বলেন। যেমন, পর্বতে বহ্নির অনুমানস্থলে ধূম হল প্রকৃত হেতু বা, লিঙ্গ। অর্থাৎ, পর্বতে বহ্নি অনুমানস্থলে ধূম লিঙ্গ ও বহ্নি লিঙ্গী। বহ্নিশূন্য স্থানে ধূম থাকে না। কিন্তু, যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানে বহ্নিও থাকে। তবে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য হওয়ায় তাতে ব্যাপ্যতা ধর্ম বর্তমান। কিন্তু ধূমনিষ্ঠ বহ্নির ব্যাপ্যতা কোন ধর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট? বহ্নি ধূমের ব্যাপক হওয়ায় বহ্নিতে ব্যাপকতা ধর্ম বর্তমান। এই ব্যাপ্যকতা যে ধর্ম দ্বারা নির্দিষ্ট তা হলো বহ্নিত্ব ধর্ম। যে ধর্ম দ্বারা ব্যাপকতা নির্দিষ্ট হয়, সেই ধর্ম বিশিষ্ট ব্যাপকেরই অনুমান হয়। ধূম ধূমত্ববিশিষ্ট রূপে বহ্নির ব্যাপ্য। সুতরাং, ধূমত্ববিশিষ্ট রূপে ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নিত্ববিশিষ্ট রূপে বহ্নি ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। এই ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বলা হয়। পূর্বে ধূম অর্থাৎ লিঙ্গ ও বহ্নি অর্থাৎ লিঙ্গীর মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকলে কোন স্থানে ধূম অর্থাৎ লিঙ্গ দেখে বহ্নি অর্থাৎ লিঙ্গির অনুমিতি সম্ভব নয়। তাই ভাষ্যকার প্রথমে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শনের কথা বলেছেন।

---

[২] "লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং ......।" – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১ *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ১৫২।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শনকেই কি মহর্ষি "তৎ" শব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন? না, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ পূর্বক জ্ঞানকে অনুমান বলা যায় না। কারণ, ধূমরূপ লিঙ্গ ও বহ্নিরূপ লিঙ্গীর মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হলেই বহ্নির অনুমিতি হয় না। পূর্বে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের পরে পর্বতাদি দেশে বহ্নির অনুমিতির জন্য পর্বতাদি দেশে ধূমরূপ লিঙ্গের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান আবশ্যক। তা না হলে পর্বতে বহ্নির অনুমান সম্ভব নয়। আলোচ্য স্থলে বহ্নিত্ব ধর্ম বিশিষ্ট বহ্নির অনুমান হয় একথা স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে 'পর্বত বহ্নিমান' – এই আকারের অনুমান হয়। পর্বতে হেতু বর্তমান না হলে তার ভিত্তিতে পর্বতে বহ্নির অনুমান সম্ভব নয়। তাই পর্বতে ধূমের বর্তমানতার বা উপস্থিতির জ্ঞান প্রয়োজন। এই জ্ঞানটি পক্ষধর্মতা জ্ঞান নামে পরিচিত। ভাষ্যকার "লিঙ্গদর্শনঞ্চ" এই বাক্যের দ্বারা পর্বতাদি দেশে ধূমের প্রত্যক্ষরূপ দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনকেই বুঝিয়েছেন।[৩] দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শন হলে পূর্বজ্ঞাত ব্যাপ্তি সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় ফলে লিঙ্গটি লিঙ্গীর ব্যাপ্য – এই আকারের স্মৃতি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, মহানসাদি স্থানে ধূমত্ববিশিষ্ট রূপে ধূম এবং বহ্নিত্ববিশিষ্ট রূপে বহ্নির ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হলে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এইরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়। পরে পর্বতাদি দেশে পূর্বদৃষ্ট ধূমের সদৃশ ধূম দর্শন করলে পূর্বোৎপন্ন ব্যাপ্তি সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে ধূম বহ্নি ব্যাপ্য এই আকারের স্মৃতি উৎপন্ন

[৩] – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১ *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ১৫২।

হয়।[৪] এই স্মৃতির অব্যবহিত পরে ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে ধূমের জ্ঞান উৎপন্ন হয়; এটিকেই নৈয়ায়িকগণ তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ বলে থাকেন। এই তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শের অব্যবহিত পরেই পর্বতে বহ্নির অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান জন্মায়।[৫]

প্রশ্ন হতে পারে, এই অনুমিতির করণ বা অনুমান প্রমাণ কোনটি? এবং সেটি প্রত্যক্ষপূর্বক কি না? ন্যায়মতে অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান না পরামর্শ সেই বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। প্রাচীনকালেও অনেকে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধস্মৃতিকে অর্থাৎ অনুমাপক হেতুপদার্থে অনুমেয় (সাধ্য) ধর্মের ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্মরণকে অনুমিতির করণ বলতেন।[৬] কিন্তু অনেকে আবার অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির করণ বলতেন।[৭] যাঁরা "ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণম্ করণম্" –এইরূপে করণের লক্ষণ স্বীকার করে থাকেন তাঁদের (বিশেষতঃ নব্য নৈয়ায়িকগণের) মতে অনুমিতির ব্যাপার হলো পরামর্শ এবং সেই ব্যাপারবিশিষ্ট কারণ তথা করণ হলো ব্যাপ্তিজ্ঞান। আবার যাঁরা

---

[৪] "লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধয়োর্দর্শনেন লিঙ্গস্মৃতিরভিসম্বধ্যতে।" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ১২।

[৫] "স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষোঽর্থোঽনুমীয়তে। – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ১২।

[৬] লিঙ্গলিঙ্গিসম্বন্ধস্মৃতির্লিঙ্গদর্শনং বেতি সন্দেহঃ। একে তাবদ্ বর্ণয়ন্তিলিঙ্গলিঙ্গিসম্বন্ধস্মৃতিরনুমানমিতরৈলিঙ্গলিঙ্গিসম্বন্ধদর্শনাদিভিরনুগৃহ্যমাণা। – ভরদ্বাজ উদ্দ্যোতকর, *ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক*, ১৯৯৭, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ৪২।

[৭] অপরে পুনর্মন্যন্তে – লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানমিতরৈরনুগৃহ্যমাণ ইতি। – ভরদ্বাজ উদ্দ্যোতকর, ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক, ১৯৯৭, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ৪২।

"ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণম্ করণম্" –এইরূপে করণের লক্ষণ স্বীকার করেছেন, তাঁরা (বিশেষতঃ প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ) লিঙ্গ–পরামর্শরূপ ব্যাপারকেই অনুমিতির করণ বলেছেন। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের উল্লেখপূর্বক স্বমত প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, লিঙ্গদর্শন থেকে লিঙ্গপরামর্শ পর্যন্ত সমস্তই অনুমিতির জনক বলে অনুমান প্রমাণ হলেও লিঙ্গপরামর্শকেই মুখ্যতঃ অনুমান প্রমাণ বলে স্বীকার করে নিতে হয় কেননা, লিঙ্গপরামর্শের অব্যবহিত পরেই অনুমিতি উৎপন্ন হয়ে থাকে।[৮] অনুমানের হেতুতে অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তি স্মরণের অব্যবহিত পরেই অনুমিতি জন্মায় না। কারণ, তা লিঙ্গপরামর্শকে অপেক্ষা করে। বরং লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ হওয়ায় প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মধ্যে চতুর্থতম অবয়ব উপনয় বাক্যও সার্থক হয়; যেহেতু উপনয় বাক্য দ্বারা উক্ত লিঙ্গপরামর্শ জন্মে থাকে।

বৈশেষিক সম্প্রদায়ে কিন্তু পরামর্শ স্বীকৃত হয়নি। এছাড়া ভাট্ট মীমাংসকগণ এবং বৈদান্তিকগণ অনুমিতির প্রতি পরামর্শাত্মক বিশিষ্ট–বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন না। মীমাংসকগণের মতে প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান হতে অনুমিতির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় বলে উক্ত দুটি জ্ঞানের অতিরিক্ত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানরূপ পরামর্শকে অনুমিতির আবশ্যিক কারণরূপে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাঁদের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞান – এই দুটি জ্ঞানকে সর্বত্র

---

৮ "বয়ন্তু পশ্যামঃ, সর্ব্বমনুমানম্, অনুমিতেস্তন্নান্তরীয়কত্বাৎ। প্রধানোপসর্জ্জনতাবিবক্ষায়াং লিঙ্গপরামর্শ ইতি ন্যায্যম্"। - ভরদ্বাজ উদ্দ্যোতকর, ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক, ১৯৯৭, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ৪২।

অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করলে লাঘব হয়। তাছাড়া নৈয়ায়িকগণও তো অনুমিতির উৎপত্তির প্রতি এই দুই প্রকার জ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেছেন; যেহেতু ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপ পরামর্শের পূর্বে নৈয়ায়িককেও মীমাংসকসম্মত ব্যাপ্যতাবচ্ছেদককে প্রকার করে পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানকে পরামর্শের কারণরূপে স্বীকার করতে হয়েছে। 'পর্বতঃ ধূমবান্' – এইরূপ প্রত্যক্ষ এবং তা থেকে 'বহ্নিব্যাপ্যঃ ধূমঃ' – এইরূপ ব্যাপ্তি স্মরণ – এই জ্ঞানদ্বয় হতে অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ায় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধূমত্ব, সেই ধূমত্বপ্রকারক 'পর্বতঃ ধূমবান্' – এইরূপ যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান, তা অনুমিতির প্রতি সর্বসম্মত কারণ হওয়ায় গৌরবহেতু পরামর্শের অনুমিতিকারণতা স্বীকারের প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া ব্যাপ্তিবিশিষ্ট–বৈশিষ্ট্যাবগাহী–নিশ্চয়রূপ পরামর্শকে অনুমিতির কারণ বললে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট–বৈশিষ্ট্যাবগাহী–নিশ্চয়ত্বকে কারণতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকার করতে হয়। এইরূপ কারণতাবচ্ছেদক কল্পনা অপেক্ষা ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানত্ব লঘু ধর্ম হওয়ায় লঘুধর্ম পুরস্কারে কারণতা স্বীকার করা শ্রেয়। এই প্রসঙ্গে আরও আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, নৈয়ায়িকগণসম্মত পরামর্শের প্রত্যক্ষের পূর্বে পরামর্শের কারণরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞান –এই জ্ঞানদ্বয়ের প্রত্যক্ষ হওয়ায় 'প্রথমোপস্থিতিত্যাগে মানাভাবঃ' –এই ন্যায় অনুসারে প্রথমোপস্থিতত্ব ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানে থাকায় এই জ্ঞানদ্বয়কে কারণ বলে স্বীকার করে নেওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। যদি স্থলবিশেষে কোনো অনুমিতির প্রতি পরামর্শের পূর্ববৃত্তিত্ব স্বীকৃতও হয়,

তথাপি অনুমিতিত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি অর্থাৎ যাবৎ অনুমিতির প্রতি পরামর্শের পূর্ববৃত্তিত্ব না থাকায় অনুমিতির কারণরূপে পরামর্শের কল্পনায় গৌরব দোষ হয়। আমরা জানি এই গৌরবের জ্ঞান কার্য-কারণভাবের প্রতিবন্ধক, সুতরাং তা কখনোই স্বীকৃত হতে পারে না। এর উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণ যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা হল নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞানকে অর্থাৎ পরামর্শকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার না করে যদি ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞান রূপ পৃথক পৃথক কারণ বলা হয় তাহলে, একই অনুমিতির প্রতি পৃথক কারণদ্বয় স্বীকৃত হওয়ায় দুটি কার্যকারণভাব স্বীকার করতে হয় বলে গৌরব দোষ হয়, যা গ্রহণীয় নয়।

দ্বিতীয়তঃ পরামর্শ স্বীকারের পক্ষে অপর একটি যুক্তি হল এই যে, ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান অনুমিতির কারণ হলে কেবল 'ধূমবান্ পর্বতঃ' – এইরূপ পক্ষধর্মতা জ্ঞান হতে অনুমিতির আপত্তি হবে। কারণ উক্ত জ্ঞানে পর্বতে ধূম, ধূমে ধূমত্ব যেমন প্রকার হয়েছে, তেমনি ধূম বহ্নির ব্যাপ্য হওয়ায় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধূমত্ব, তাও প্রকার হয়েছে। ফলতঃ 'ধূমবান্ পর্বতঃ' – এই জ্ঞান ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তা হতে অনায়াসে অনুমিতি হয়ে থাকে। কিন্তু কেবল 'ধূমবান্ পর্বতঃ' – এইরূপ জ্ঞান হতে কেউই অনুমিতি স্বীকার করে না কেননা, উক্ত জ্ঞানে ধূমত্ব যে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক তা গৃহ্যমান হয়নি। তাছাড়া ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব ইত্যাদি ধর্মের জ্ঞান না থাকলেও কেবল 'বহ্নিব্যাপ্যবান্' –

এইরূপ জ্ঞান হতে অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ায় লাঘববশতঃ ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান অর্থাৎ পরামর্শকেই অনুমিতির কারণরূপে গ্রহণ করা উচিত।

তৃতীয়তঃ যদি কোনো ব্যক্তির 'ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্য' –এইরূপ ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান এবং 'আলোকবান্ পর্বতঃ' –এইরূপ পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয় তাহলে, ঐ জ্ঞানদ্বয় হতে ঐ ব্যক্তির অনুমিতির আপত্তি হবে, কেননা তার ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই জাতীয় দুটি জ্ঞান হতে কোনো ব্যক্তিরই অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। যে হেতুতে পক্ষধর্মতাজ্ঞান হয় সেই হেতুতে ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞানই অনুমিতির কারণ হওয়ায় উক্ত স্থলে আলোকরূপ হেতুতে পক্ষধর্মতাজ্ঞান হলেও ব্যাপ্তি প্রকাররূপে জ্ঞানের বিষয় না হওয়ায়, আবার ধূমে ব্যাপ্তি প্রকার হলেও তা পক্ষবৃত্তি – এই জ্ঞান না হওয়ায় উক্ত জ্ঞানদ্বয় হতে অনুমিতি হতেই পারে না। কিন্তু ব্যাপ্তিপ্রকারক–পক্ষধর্মতাজ্ঞানরূপ পরামর্শকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করলে উক্ত আপত্তি বারিত হবে। কেননা, ভিন্ন হেতুকে অবলম্বন করে ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান ও পক্ষধর্মতার জ্ঞান হলেও একটি হেতুকে অবলম্বনপূর্বক ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান ও পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয়নি। সুতরাং অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান ও পক্ষধর্মতার জ্ঞানকে পৃথক পৃথক কারণরূপে স্বীকার করা যায় না। একটি কার্যকারণভাবের দ্বারা কার্যের উৎপত্তি নির্বাহ হলে দুটি কার্যকারণভাবের কল্পনা গৌরবজনক। সুতরাং ব্যাপ্তিপ্রকারক–পক্ষধর্মতাজ্ঞানত্বরূপে ব্যাপ্তিপ্রকারক–পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শকে অনুমিতির হেতু বলাই সমীচীন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে অনেকেই পরামর্শের অনুমিতি কারণতা স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে পর্বতাদি পক্ষে ধূমরূপ হেতু দৃষ্ট হলে পূর্বানুভূত ধূমগত ব্যাপ্তির স্মরণ হয় এবং তার অব্যবহিত পরে 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' – এইরূপ অনুমিতি জন্মে থাকে। সুতরাং অনুমিতিস্থলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' – এইরূপ পরামর্শ জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যাপ্তিস্মরণ ও লিঙ্গদর্শনের দ্বারাই অনুমিতি উৎপন্ন হয়ে যায় বলে অনুমিতির কারণরূপে পরামর্শের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যে সাক্ষাৎভাবে (কণ্ঠতঃ) পরামর্শের উল্লেখ না করায় কতিপয় প্রাচীন নৈয়ায়িক পরামর্শকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করেননি।[৯] তাঁদের মতে, ব্যাপ্তিস্মৃতি ও অনুমিতির মধ্যবর্তী সময়ে পরামর্শের অনুভব হয় না। সাধ্য ও সাধ্যব্যাপ্য হেতুর সামানাধিকরণ্যজ্ঞান অর্থাৎ 'যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নিঃ' –এরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর পর্বতরূপ পক্ষে ধূমের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ হলে পূর্বানুভূত ব্যাপ্তির স্মরণ হয় এবং তার অব্যবহিত পরেই বহ্ন্যনুমিতি জন্মায়। এইভাবে কোনও কোনও প্রাচীন নৈয়ায়িক তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের বিরোধিতা করলেও পরামর্শবাদী নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, পরামর্শকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা, দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শন ব্যাপ্তিস্মৃতির জনক হয় বলে তা অনুমিতির প্রতি প্রমাণ হতে পারে না, যেহেতু স্মৃতির জনক কখনও প্রমাণ হয় না। আবার কেবলমাত্র ব্যাপ্তিস্মৃতিও

[৯] ব্যাপ্তিস্মৃতিসহায়াদ্ দ্বিতীয়লিঙ্গদর্শনাদেবানুমিতিসিদ্ধেরলং তৃতীয়লিঙ্গদর্শনকল্পয়েতি যথাশ্রুতভাষ্যানুসারিণঃ। - উদয়নাচার্য, ১৯৬৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ ন্যায়বার্ত্তিতাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), বৈশালী: প্রাকৃত জৈন ইন্সটিটিউট। পৃষ্ঠা: ৩৩২।

অনুমিতির প্রতি প্রমাণ হতে পারে না কেননা, এই ব্যাপ্তিস্মৃতি বা ব্যাপ্তিজ্ঞান হল সাধারণ হেতুতে সাধারণ সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান, বিশেষ পক্ষবৃত্তি হেতুতে বিশেষ পক্ষবৃত্তি সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান নয়। আবার পক্ষধর্মতাজ্ঞান পক্ষে কেবল হেতুর জ্ঞান জন্মালেও সাধ্যের ব্যাপ্যরূপে হেতুর জ্ঞান জন্মায় না। সুতরাং ব্যাপ্তিস্মৃতির পর অনুমিতির পূর্বে অনুমিতির করণরূপে যে অতিরিক্ত জ্ঞান তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে; আর তা হলো পরামর্শ।

ন্যায়প্রদীপকার এবং "*কারকচক্র*" – এর প্রণেতা নবদ্বীপের নব্য নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও উদ্দ্যোতকরের উক্ত অভিমতের সমর্থন করেছেন।[১০] এছাড়াও পরবর্তীকালের বহু নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরের এই অভিমত গ্রহণপূর্বক লিঙ্গ–পরামর্শকেই অনুমান প্রমাণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১১] আবার উদয়নাচার্য তাঁর *কিরণাবলী* গ্রন্থে লিঙ্গ–পরামর্শের বিষয় লিঙ্গকেই অনুমান প্রমাণ বলেছেন। সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে তিনি বৈশেষিকসূত্রকার কণাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। শঙ্করমিশ্রও তাঁর উপস্কার গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের অভিমতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু

---

[১০] ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়নভাষ্য) (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা: ২০১১, পৃষ্ঠা: ১৫৯।

[১১] (ক) "পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ"। – শ্রীমৎ অন্নং ভট্ট, *তর্কসংগ্রহ,* ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৩৬২।

(খ) "লিঙ্গপরামর্শেন চানুমীয়তেঽতো লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানম্"। – শ্রী কেশবমিশ্র, ২০০৮, *তর্কভাষা,* শ্রী গঙ্গাধরকর ন্যায়াচার্য (বঙ্গানুবাদক ও বিবৃতিকার), প্রথম খণ্ড, কলকাতা: সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা শহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃষ্ঠা: ১৪১।

বিশিষ্ট নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্ত মতের প্রতিবাদ করে তাঁর "পরামর্শ" নামক গ্রন্থের শেষে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমান প্রমাণ বলেছেন। আবার দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির মতে সর্বত্র অনুমিতিকর্তার মনই হলো অনুমান প্রমাণ। (রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়, অভিমত অনুমিতিকে মানস প্রত্যক্ষবিশেষ বলে স্বীকার করেছেন।) তথাপি অনুমিতি মানসপ্রত্যক্ষ হতে বিজাতীয় জ্ঞান যেহেতু তা ব্যাপ্তিজ্ঞান ও লিঙ্গপরামর্শরূপ বিশেষকারণজন্য জ্ঞান। তবে এইসকল বিভিন্ন মতের মধ্যে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতই অধিক সমাদৃত হতে দেখা যায়।

বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কোনও কোনও আচার্যও পরামর্শের অনুমিতিকারণতা স্বীকার করেননি। প্রশস্তপাদাচার্যের পদার্থধর্মসংগ্রহ নামক গ্রন্থে পরামর্শজ্ঞানের আলোচনা পাওয়া যায় না। ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরভট্ট অনুমিতির কারণরূপে পরামর্শকে অস্বীকার করেছেন। ন্যায়কন্দলীতে বলা হয়েছে, 'সাধ্যব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুমান্ পক্ষঃ' – এই আকারের পরামর্শ অনুমিতির কারণ হতে পারে না। ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতা জ্ঞান – এই জ্ঞানদ্বয় হতেই অনুমিতির উৎপত্তি হয়ে যায়। তবে প্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যোমবতী টীকায় ব্যোমশিবাচার্য অনুমিতির প্রতি পরামর্শ জ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালের নব্য বৈশেষিক শঙ্কর মিশ্রের উপস্কারটীকাতেও উক্ত মত সমর্থিত হতে দেখা যায়।

তবে সমস্ত অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষপূর্বক হয় এমন নয়। আমরা জানি নৈয়ায়িকগণ অনুমিতির কারণ লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ, পর্বতাদিতে লিঙ্গের প্রত্যক্ষ

জন্য উৎপন্ন ব্যাপ্তির স্মরণের পশ্চাত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের প্রত্যক্ষজন্য যেমন অনুমিতি স্বীকার করেন তেমনি ভিন্ন উপায়েও যদি পূর্বোক্ত জ্ঞানগুলি উৎপন্ন হয় তাহলেও অনুমিতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমন, পরার্থানুমানস্থলে বাক্য শ্রবণজন্য পূর্বোক্ত জ্ঞান জন্য অনুমিতির উৎপত্তি নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। সুতরাং, 'প্রত্যক্ষ পূর্বক জ্ঞান অনুমান' – এইরূপ লক্ষণ সঙ্গত হতে পারে না। তবে, "তৎপূর্বক" শব্দটিকে যদি 'তানি পূর্বানি যস্য' – এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে গ্রহণ করা হয় তাহলে নৈয়ায়িক স্বীকৃত চতুর্বিধ প্রামাণসমূহের[১২] মধ্যে যে কোন প্রমাণের দ্বারা অনুমিতির কারণ লিঙ্গাদি পদার্থের জ্ঞান হলেই অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গী পদার্থের অনুমিতি সম্ভব। ফলে পূর্বোক্ত আপত্তি নিরসন হয়।[১৩] সুতরাং, নৈয়ায়িকগণের মতে মহর্ষি স্বীকৃত প্রমাণসমূহের মধ্যে যে কোন প্রমাণের দ্বারা লিঙ্গাদির জ্ঞানজন্য উৎপন্ন লিঙ্গপরামর্শই তৎপূর্বক জ্ঞান তথা অনুমান প্রমাণ।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেলো যে, অনুমিতির করণ কোন্‌টি সেই বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। যাঁরা তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলে স্বীকার করেন, তাঁরা উক্ত অনুমিতির জন্যেই তাকে অনুমান বলে স্বীকার করেন; কেননা তার

[১২] "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।।১/১/৩।।" – মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ৮।

[১৩] "তানি তে তত্ পূর্বং যস্য তদিদং তৎপূর্বকম্। যদা তানীতি বিগ্রহঃ, তদা সমস্তপ্রমাণাভিসংবন্ধাত্ সর্বপ্রমাণপূর্বকত্বমনুমানস্য বর্ণিতং ভবতি।" – উদ্দ্যোতকর, ১৯৯৭, ন্যায়বার্তিক, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ভারতীয় দার্শনিক অনুসন্ধান পরিষৎ, পৃষ্ঠা: ৪১।

(অর্থাৎ তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শের) অব্যবহিত পরেই অনুমিতি উৎপন্ন হয়ে যায়। যেমন, পূর্বোক্ত উদাহরণ স্থলে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান অয়ং পর্বতঃ' এইরূপ লিঙ্গপরামর্শের অব্যবহিত পরে অনুমিতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। অনুমান প্রমাণের ফল তথা অনুমিতির স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও সাধারণত মনে করা হয় হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম বিশিষ্ট হেতুর দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বিশিষ্ট সাধ্যই অনুমিত হয়ে থাকে। যেমন, ধূমত্ববিশিষ্ট ধূমের দ্বারা বহ্নিত্ববিশিষ্ট বহ্নি অনুমেয়।[১৪] এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কেন বিশেষ স্থলে বহ্নির অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান স্বীকার করতে হবে? শুধু বহ্নিত্ব বিশিষ্ট বহ্নির অনুমিতি নয়? এর উত্তরে বলা যায় এর কারণটি হলো যেসকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বহ্নিত্ব বিশিষ্ট বহ্নির অনুমিতি স্বীকার করা হবে, সেই সকল ক্ষেত্রে সেই জ্ঞান জন্য কোনো প্রবৃত্তি উৎপন্ন হবে না। কাজেই বলা যায়, কোন আশ্রয় ব্যতিরেকে কেবল বহ্নির অনুমান হয় না। কোন না কোন স্থানেই (আশ্রয়েই) বহ্নির অনুমান হয়ে থাকে। যেমন, পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান কালে কেবল বহ্নির অনুমান হয় না। অর্থাৎ যে পর্বতে ধূম দৃষ্ট হয় সেই পর্বতেই বহ্নির অনুমান হয়ে থাকে। অতএব, বহ্নিবিশিষ্ট পর্বতই উক্ত অনুমানের সাধ্য, কেবল বহ্নি নয়। আচ্ছা, বহ্নিবিশিষ্ট পর্বতই যে উক্ত অনুমানের সাধ্য সে বিষয়ে কোন প্রমাণ আছে? আমরা জানি কোন জ্ঞানের আকার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে নৈয়ায়িকগণ অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন। কোন একটি জ্ঞানকে যে

[১৪] "....... ধূমেনাগ্নিরিতি।" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ১২।

জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় সেই জ্ঞানকে অনুব্যবসায় বলে। অনুব্যবসায়ে পূর্ববর্তী ব্যবসায় জ্ঞানের আকার ও স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যেমন, ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পর দ্রষ্টার মনের দ্বারা 'আমি ঘটকে প্রত্যক্ষ করলাম' এই আকারের অনুব্যবসায় হয়ে থাকে। এই অনুব্যাবসায়ে পূর্ববর্তী ব্যবসায়টি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সেটি যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি ব্যবসায়টি যে ঘট বিষয়ক সেটিও প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ ঐ জ্ঞানে যে ঘট বিশেষ্যরূপে এবং ঘটত্ব প্রকাররূপে গৃহীত হয়েছে তাও জানা যায়। অতএব, অনুমিতিকে অবলম্বন করে উৎপন্ন অনুব্যবসায়কে বিশ্লেষণ করলেই আমরা অনুমিতির বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারব।

(খ)

নৈয়ায়িকগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমানের বিভাগ করেছেন। যেমন, ব্যাপ্তি জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুমানকে অন্বয়ী, ব্যাতিরেকী, এবং অন্বয়-ব্যাতিরেকী এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। আবার, হেতু সাধ্যের কারণ, কার্য নাকি এগুলির কোনটিই নয়? এই প্রশ্নের ভিত্তিতে পূর্ববৎ, শেষবৎ, এবং সামান্যতোদৃষ্ট এইরূপেও অনুমানের বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। অনুমান কর্তার নিরিখেও অনুমানের বিভাগ করা হয়। অর্থাৎ অনুমানটি কার জন্য করা হচ্ছে সেই প্রশ্নেও অনুমানের বিভাগ হয়ে থাকে। অনুমানটি যদি অনুমান কর্তার নিজের সাধ্য সিদ্ধির জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেই অনুমানকে স্বার্থানুমান বলা হয়। অপরদিকে যদি অন্য ব্যাক্তির অনুমিতির জনক যে জ্ঞান সেই অনুমানকে পরার্থানুমান বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অনুমান স্থলে অনুমানকর্তা নিজের সাধ্য সিদ্ধির

জন্য অনুমান করে থাকেন। ফলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে অপরের প্রয়োজনের অর্থাৎ অন্য ব্যাক্তির সাধ্য সিদ্ধির জন্য অনুমান বলতে কী বোঝানো হয়েছে? পরার্থানুমান শব্দটি যে প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে তা হলো অপরের জন্য কেউ অনুমান করতে সমর্থ কী?

এর উত্তরে বলা যায়, অনুমিতির উৎপত্তির প্রক্রিয়ার আলোচনা থেকে এই কথা স্পষ্ট যে নৈয়ায়িকগণের মতে সেই ব্যক্তির অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না যার পক্ষধর্মতা জ্ঞান, ব্যাপ্তি জ্ঞান ও পরামর্শ উৎপন্ন হয়নি। অনুমিতির জনক এই জ্ঞানগুলি অনুমান কর্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ বলে অর্জন করতে পারেন অথবা নাও পারেন। অন্যের বাক্য শ্রবণের মাধ্যমেও অনুমাতার এই জ্ঞানগুলি উৎপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ, সাক্ষাৎভাবে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞান, পরবর্তীতে অন্য কোন স্থানে লিঙ্গের জ্ঞান এবং উক্ত জ্ঞানজন্য লিঙ্গ লিঙ্গীর ব্যাপ্য এইরূপে লিঙ্গ দর্শনজন্য ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর বোধ (লিঙ্গপরামর্শ) না হলেও অন্যের বাক্য শ্রবণজন্য তা সম্ভব। যদিও বাক্য শ্রবণ জন্য পরামর্শের উৎপত্তি সর্ববাদী সিদ্ধ নয়। বর্তমানে আমরা এই বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছি না।

প্রশ্ন থেকে যায়, যে কোন আকারের বাক্য শ্রবণজন্য কি অনুমিতির জনক জ্ঞানগুলির উৎপত্তি সম্ভব? নাকি বিশেষ প্রকারের বাক্য শ্রবণ প্রয়োজন? নৈয়ায়িকগণের মতে বিশেষ আকারে বাক্য শ্রবণজন্যই আমদের উক্ত বোধ সম্ভব। সেই বিশেষ আকারের বাক্যকে তাঁরা ন্যায়বাক্য বলেন। এই ন্যায়বাক্য যথাক্রমে প্রযুক্ত কয়েকটি

বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। যে বাক্য সমূহের দ্বারা ন্যায়বাক্যটি গঠিত হয় সেই বাক্যগুলিকে অবয়ব বলা হয়। নৈয়ায়িকগণের মতে ন্যায়বাক্য যে অবয়ব সমূহের দ্বারা গঠিত হয় সেই অবয়বগুলি হল – প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, এবং নিগমন। লিঙ্গ পরামর্শর ভিত্তিতেই শ্রোতার পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্বের জ্ঞান হয়ে থাকে। যেমন, কোন ব্যাক্তি নিজে পর্বতাদি পক্ষে ধূম দেখে অগ্নির অনুমান করার পর যে ব্যাক্তি পর্বতে ধূম দেখেননি তাঁকে যদি পর্বতে অগ্নির অস্তিত্ব স্বীকার করাতে চান তাহলে তিনি উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব বিশিষ্ট ন্যায়বাক্য প্রয়োগ করেন। উক্ত ন্যায়বাক্য শ্রবণজন্য শ্রোতার বোধ হয় পর্বতটি অগ্নিব্যাপ্য ধূমবান। এই জ্ঞানের দ্বারাই শ্রোতা পর্বতে অগ্নির অনুমান করে থাকে। শ্রোতার পর্বতে অগ্নির অস্তিত্ব বিষয়ক যে অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানের করণ হয় বলে ‘পক্ষ সাধ্যব্যাপ্যবান্’ এই আকারের লিঙ্গ পরামর্শকে পরার্থানুমান বলা হয়ে থাকে। পঞ্চাবয়ব বাক্যের দ্বারা উক্ত লিঙ্গ পরামর্শটি উৎপন্ন হয় বলে ঐ ন্যায়বাক্যকেও গৌণার্থে পরার্থানুমান বলা হয়। অর্থাৎ, পরার্থানুমান স্থলেও প্রকৃত পক্ষে লিঙ্গ পরামর্শই অনুমান হয়ে থাকে। তবে স্বার্থানুমানের সঙ্গে পরার্থানুমানের পার্থক্য হল – স্বার্থানুমান স্থলে অনুমান কর্তা নিজেই পর্বতাদি দেশে ধূম দেখে পর্বতে অগ্নির অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভ করে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যথাক্রমে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের সমষ্টিকে ন্যায় বলা হয়, এবং প্রতিজ্ঞাদি বাক্যকে পৃথক পৃথক ভাবে অবয়ব বলা হয়। প্রশ্ন হল – ন্যায়বাক্যের অবয়ব প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের স্বরূপ কীরূপ? প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব বাক্যের স্বরূপ

জ্ঞান ব্যতীত সম্পূর্ণ ন্যায়বাক্যের স্বরূপ জ্ঞান সম্ভব নয়। নৈয়ায়িকগণের মতে যে ধর্মটি সিদ্ধ করতে চাওয়া হচ্ছে সেটিকে সাধ্যধর্ম বলে। আর, সাধ্যধর্মটি যেখানে সিদ্ধ করতে চাওয়া হচ্ছে সেটিকে ধর্মী (পক্ষ) বলে। এখন সাধ্যধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীকে যে বাক্যের দ্বারা উল্লেখ করা হয় সেই বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলে। যেমন, পর্বতে ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান কালে বহ্নি হল সাধ্যধর্ম এবং পর্বত হল ধর্মী। যে বাক্যের দ্বারা এই সাধ্যধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর উল্লেখ হয় সেই বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলে। আলোচ্য স্থলে প্রতিজ্ঞা বাক্যের আকার হবে, 'পর্বতঃ বহ্নিমান্'। এই বাক্যের দ্বারা বক্তা শ্রোতার নিকট তাঁর উদ্দেশ্য অর্থাৎ তিনি যে পর্বতে বহ্নির সম্বন্ধ সিদ্ধ করতে চাইছেন সেটি উপস্থাপন করেন।[১৫]

কিন্তু, প্রশ্ন হল – বক্তা কিসের ভিত্তিতে পর্বতকে বহ্নি বিশিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন? অর্থাৎ, পর্বতকে বহ্নি বিশিষ্টরূপে গণ্য করার সপক্ষে বক্তার যুক্তি বা হেতু আছে কি? বক্তা যদি উপযুক্ত হেতু প্রদর্শন না করেন তাহলে শ্রোতা বক্তার প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করলেও পর্বতকে বহ্নি বিশিষ্টরূপে গণ্য করবেন না। অতএব বক্তাকে উপযুক্ত হেতু প্রদর্শন করতে হবে যাতে শ্রোতা বুঝতে পারেন যে বক্তার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি আছে। এই হেতু যে বাক্যের দ্বারা প্রদর্শিত হয় সেই বাক্যকে নৈয়ায়িকগণ হেতু বাক্য বলেন। আলোচ্য স্থলে এই হেতু বাক্যের আকার হল

---

[১৫] "প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেন ধর্ম্মীনো বিশিষ্টস্য পরিগ্রহবচনং প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দ্দেশঃ।" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ৩১।

'ধূমবত্ত্বাৎ' অথবা 'ধূমাৎ'। অর্থাৎ, পর্বতটি যেহেতু ধূম বিশিষ্ট তাই পর্বতটি বহ্নি বিশিষ্ট। হেতু বাক্যটি পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত পদঘটিত হয়ে থাকে।[১৬] প্রশ্ন হল, কোন কিছু ধূম বিশিষ্ট হলেই সেটি বহ্নি বিশিষ্ট হবে কেন? ধূম আর বহ্নির মধ্যে এমন কি সম্বন্ধ আছে যে কোন কিছু ধূম বিশিষ্ট হলেই সেটি বহ্নি বিশিষ্ট হবে? অর্থাৎ, কেবল ধূম বিশিষ্ট হলেই কোন কিছুকে বহ্নি বিশিষ্টরূপে গণ্য করা যায় না। যদি বক্তা এমন কোন কারণ প্রদর্শন করতে সক্ষম হন যার দ্বারা শ্রোতা উপলব্ধি করতে পারেন যে ধূম ও বহ্নির এমন একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান যে সম্বন্ধ থাকার জন্য কোন কিছু ধূম বিশিষ্ট হলে সেটি অবশ্যই বহ্নি বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ, কেবল ধূম বা শুদ্ধ ধূম বিশেষের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় যে কোন কিছু ধূম বিশিষ্ট হলে সেটি অবশ্যই বহ্নি বিশিষ্ট হবে। নৈয়ায়িকগণের মতে ধূম ও বহ্নির মধ্যে একটি বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান যে সম্বন্ধকে তাঁরা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বলে থাকেন। এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকার কারণেই কোন কিছু ধূম বিশিষ্ট হলে আমরা সেটিকে বহ্নি বিশিষ্টরূপে গণ্য করতে পারি। প্রতিজ্ঞা বাক্যের পরে প্রযুক্ত হেতু বাক্যের দ্বারা শুদ্ধ হেতুর বোধ হয়। হেতুটি যে সাধ্যের সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বিশিষ্ট সেই বোধ হয় না। যেমন, আলোচ্য স্থলে 'ধূমবত্ত্বাৎ' এই হেতু বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতার শুদ্ধ ধূমের জ্ঞান হলেও উক্ত ধূমের সঙ্গে বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। ফলে শ্রোতা উক্ত বাক্য শ্রবণ করে কোন কিছু ধূম বিশিষ্ট হলেই সেটি কেন বহ্নি বিশিষ্ট হবে তা উপলব্ধি করতে পারেন না। অতএব শ্রোতা যাতে ধূম ও বহ্নির মধ্যে অর্থাৎ

---

[১৬] – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১, *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ৩০৪।

হেতু ও সাধ্যের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করতে পারেন সেটি নিশ্চিত করা আবশ্যক। হেতু বাক্যের দ্বারা উক্ত জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় বক্তাকে অতিরিক্ত কোন বাক্য প্রয়োগ করতে হবে যার দ্বারা শ্রোতার ঐ জ্ঞান সম্ভব হয়। নৈয়ায়িকগণ উক্ত বাক্যকে উদাহরণ বাক্য বলেন। এই বাক্যের দ্বারা হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যাপ্তি যে দৃষ্টান্তে গৃহীত হয় সেই দৃষ্টান্তের উল্লেখও হয়ে থাকে। যেমন, 'পর্বতঃ বহ্নিমান্', 'ধূমাৎ' এই দুটি বাক্য প্রয়োগের পর 'যো যো ধূমবান সো সো বহ্নিমান্ যথা মহানস' – এই আকারের উদাহরণ বাক্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই বাক্যের দ্বারা বোঝানো হয় যে যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নিও থাকে যেমন, মহানস। অর্থাৎ, মহানসে যেমন ধূম থাকে এবং বহ্নিও থাকে তেমনি পর্বতে ধূম থাকায় বহ্নি অবশ্যই থাকবে।

কিন্তু অনুমানের সকল স্থলে তো এমন দৃষ্টান্ত সম্ভব নয় যেখানে হেতু বিদ্যমান সেখানে সাধ্যও বিদ্যমান। বিষয়টি একটু বিশদে ব্যক্ত করা যাক। ন্যায়মতে এমন অনেক অনুমান আছে যেখানে হেতুর আশ্রয়রূপে এমন কোন বস্তু নেই যেখানে সাধ্য বিদ্যমান। যেমন, আমরা যদি গন্ধবত্ত্ব হেতুর দ্বারা পৃথিবীতে ইতরভিন্নত্ব সিদ্ধ করতে চাই তাহলে আমরা এমন কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে পারবো না যেখানে গন্ধবত্ত্বও আছে আবার ইতরভিন্নত্বও আছে। কারণ, গন্ধবত্ত্ব কেবলমাত্র পৃথিবীরই ধর্ম, পৃথিবী ভিন্ন কোন পদার্থে গন্ধবত্ত্ব থাকে না। (অর্থাৎ এই অনুমানটির কোনো অন্বয় দৃষ্টান্ত বা সপক্ষ স্থল বিদ্যমান না থাকায় গন্ধবত্ত্ব হেতুটি পক্ষমাত্রবৃত্তি।) অপরদিকে উক্ত

অনুমানে যাবৎ পৃথিবী পক্ষের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দৃষ্টান্তরূপে কোন পৃথিবীকে গ্রহণ করা সম্ভব নয় যেখানে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রদর্শন সম্ভব। এই সমস্যার সমাধানে নৈয়ায়িকগণ বলেন হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন – 'যেখানে যেখানে হেতু, সেখানে সেখানে সাধ্য' – এই জ্ঞান জন্য সম্ভব হয় তেমনি 'সাধ্যের অভাব যেখানে থাকে, সেই স্থানে হেতু থাকে না' – এই জ্ঞান থেকেও সম্ভব। প্রথম প্রকার জ্ঞানকে 'অন্বয় ব্যাপ্তি' বলে। আর যে দৃষ্টান্তে এইরূপ অন্বয় ব্যাপ্তি গৃহীত হয় সেটিকে 'অন্বয় দৃষ্টান্ত' বলে। অপরদিকে, দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানকে 'ব্যাতিরেক ব্যাপ্তি' বলে। যে দৃষ্টান্তে এই ব্যাপ্তি গৃহীত হয় তাকে 'ব্যাতিরেকী দৃষ্টান্ত' বলে। যেমন, আলোচ্য স্থলে গন্ধবত্ত্ব হেতুর সঙ্গে ইতরভিন্নত্বের অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভব না হলেও ব্যাতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভব। সেক্ষেত্রে ব্যাপ্তির আকার হবে 'যদ্ ইতরেভ্যো ন ভিদ্যতে ন তদ্ গন্ধবৎ, যথা জলম্'। অর্থাৎ, ব্যাপ্তির স্বরূপভেদে উদাহরণ বাক্যের স্বরূপেরও পরিবর্তন ঘটে। তবে উদাহরণ বাক্যের স্বরূপ যেমনই হোক না কেন ঐ বাক্যের উদ্দেশ্য হল হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রদর্শন করা। যে সম্বন্ধের জ্ঞান হলে শ্রোতা হেতুর দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্বের অনুমান করতে সমর্থ হন। অন্বয় ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয় সেই দৃষ্টান্তকে 'অন্বয় দৃষ্টান্ত' বলে।[১৭] অপরদিকে, ব্যাতিরেক ব্যাপ্তি প্রদর্শনের

---

[১৭] "সাধ্যসাধর্ম্ম্যাতৎদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং।।১/১/৩৬।।" – মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ৩২।

জন্য যে দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করা হয় সেই দৃষ্টান্তকে ‘ব্যাতিরেক দৃষ্টান্ত’ বলে। যেমন, আলোচ্য অনুমান স্থলে ‘যো যো ন বহ্নিমান্ সো সো ন ধূমবান্, যথা: হ্রদ’।[১৮]

প্রশ্ন হল – ‘পর্বতঃ বহ্নিমান্’, ‘ধূমাৎ’, এবং ‘যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্ যথা মহানস’ এই তিনটি বাক্য শ্রবণ করলে শ্রোতা বুঝতে পারেন যে বক্তা পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সিদ্ধ করতে চাইছেন ধূমরূপ হেতুর দ্বারা এবং ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু ঐ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমই যে পর্বতে আছে সেই জ্ঞান না হলে শ্রোতার পর্বতে বহ্নির অস্তিত্বের জ্ঞান হতে পারে না। এই কারণে নৈয়ায়িকগণ অপর একটি অবয়ব স্বীকার করেন যার দ্বারা শ্রোতা বুঝতে পারেন যে পক্ষে যে হেতুর অস্তিত্বের কথা হেতু বাক্যের দ্বারা বোঝানো হয়েছে সেই হেতুটি সাধ্যের সঙ্গে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট। এই বাক্যকে তাঁরা উপনয় বাক্য বলেন। ব্যাপ্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শক উদাহরণ বাক্যের আকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই উপনয় বাক্যের আকারে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ বাক্যে যদি অন্বয় ব্যাপ্তি প্রদর্শিত হয় তাহলে পক্ষে সাধ্যের সঙ্গে অন্বয়ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর অস্তিত্ব বোধের অনুকূল উপনয় বাক্য প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন, আলোচ্য অনুমান স্থলে ‘যঃ যঃ ধূমবান্ সঃ সঃ বহ্নিমান্ যথা মহানস’ – এইরূপ উদাহরণ বাক্য প্রয়োগের পর ‘তথেতি’ এই উপনয় বাক্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ঐ পর্বতটিও ঐরূপ অগ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমবান্। অপরদিকে, যদি ‘যঃ যঃ ন বহ্নিমান্

[১৮] “তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতং।।১/১/৩৭।।” – মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ৩৩।

সঃ সঃ ন ধূমবান্ যথা হ্রদ' এই আকারের উদাহরণ বাক্য প্রয়োগ হয় তাহলে 'ন তথেতি' এইরূপ উপনয় বাক্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, পর্বতে হ্রদের ন্যায় বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের অভাব আছে এমন নয়।[১৯]

নৈয়ায়িকগণের মতে উপনয় বাক্যের পর অপর একটি বাক্য প্রয়োগ করা হয়। সেই বাক্যটিকে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিজ্ঞারই পুনর্বচন বলে মনে হয়। এই বাক্যটিকে তাঁরা নিগমন বাক্য বলেন।[২০] তবে প্রতিজ্ঞা বাক্যের সঙ্গে এই বাক্যের কিঞ্চিৎ পার্থক্য বিদ্যমান। প্রতিজ্ঞা বাক্যে পর্বতকে বহ্নি বিশিষ্টরূপে উল্লেখ করলেও পর্বতটিকে বহ্নি বিশিষ্টরূপে গণ্য করার সপক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শিত হয় নি। উক্ত বাক্যের দ্বারা বক্তা কি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন সেটির উল্লেখমাত্র করা হয়েছিল। কিন্তু নিগমন বাক্যে যখন পুনরায় পর্বতটিকে বহ্নি বিশিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয় তখন পর্বতটিকে বহ্নি বিশিষ্টরূপে গণ্য করার সপক্ষে উপযুক্ত হেতু প্রযুক্ত হয়েছে। উক্ত হেতু যে সাধ্যের সঙ্গে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট বলেই সাধ্যের সাধক সেটিরও প্রদর্শন করা হয়েছে। এবং পরিশেষে উক্ত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুই যে পক্ষে বিদ্যমান সেটির প্রদর্শন করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিজ্ঞা বাক্যে বক্তা পক্ষে যে সাধ্যটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চান সেই সাধ্য বিশিষ্টরূপে পক্ষের উল্লেখমাত্র

---

১৯ "উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ।।১।১।৩৮।।" – মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ৩৩।

২০ "হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্।।১।১।৩৯।।" – মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ৩৪।

করা হয়। অপরদিকে, নিগমন বাক্যের দ্বারা যখন পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হয় তখন সেটি ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাবিশিষ্ট হেতুর সামর্থ্যে করা হয়। যেমন, আলোচ্য অনুমান স্থলে 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' – এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা বক্তা কি সিদ্ধ করতে চাইছেন সেটির প্রদর্শন করা হয় মাত্র। কিন্তু, নিগমন বাক্যে যখন বলা হয় 'তস্মাৎ তথা' তখন ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাবিশিষ্ট হেতুর সামর্থ্যে পক্ষে সাধ্যবত্ত্বাটিকে বোঝানো হয়।

নৈয়ায়িকগণের মতে এই পাঁচটি অবয়ব বিশিষ্ট ন্যায়বাক্য শ্রবণ করলে শ্রোতার বোধ হয় যে 'অতএব পর্বতটি হয় বহ্নিব্যাপ্যধূমবান'। এটিকেই নৈয়ায়িকগণ পরামর্শ বা তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ বলেন। এই জ্ঞানের দ্বারাই শ্রোতার পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়। অর্থাৎ, যে ব্যাক্তি পর্বতে বহ্নির প্রত্যক্ষ করেননি সেই ব্যক্তিরও উক্ত অবয়ব বাক্য শ্রবণজন্য পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়ে থাকে। শ্রোতার অনুমিতির করণ হওয়ায় উক্ত লিঙ্গ পরামর্শটিকে পরার্থানুমান বলে। পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট ন্যায়বাক্যের দ্বারা লিঙ্গ পরামর্শটি হয় বলে উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট ন্যায়বাক্যকে গৌণ অর্থে পরার্থানুমান বলা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, উপনয় বাক্য জন্য শাব্দ পরামর্শের উৎপত্তি বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। যদি তা স্বীকার করেও নেওয়া হয় তবুও কিন্তু তাকে অনুমিতির অব্যবহিত কারণ রূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, উপনয় বাক্যের অনন্তর নিগমন বাক্য প্রযুক্ত হয় এবং অবশ্যই নিগমন বাক্য থেকে স্বতন্ত্র একটি জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। সুতরাং প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্য জন্য পরামর্শ উৎপন্ন হয় এই

কথা বলা যায় না। যাঁরা উপনয় বাক্য জন্য শাব্দ পরামর্শের উৎপত্তি স্বীকার করেন না তাঁদেরকেও অনুমিতির উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব ক্ষণে পরামর্শ স্বীকার করতে হয়। সেই পরামর্শ কোনও বাক্য জন্য উৎপন্ন নয়। তা মানস পরামর্শ নামে পরিচিত। যার উৎপত্তিতে ন্যায় রূপ মহাবাক্য জন্য উৎপন্ন যে শাব্দবোধ তা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আবার মহাবাক্য জন্য উৎপন্ন শাব্দবোধের উৎপত্তির প্রতি প্রত্যেকটি অবয়ব জন্য পৃথক্ পৃথক্ শাব্দবোধের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রাচীন ন্যায়ে প্রতিজ্ঞাদি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি অবয়ব থেকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ যে উৎপন্ন হয় তার আলোচনা দৃষ্ট হলেও মহাবাক্য জন্য উৎপন্ন বোধ এবং তার পরে উৎপন্ন মানস পরামর্শের আলোচনা দৃষ্ট হয় না। অন্যভাবে বলতে গেলে পঞ্চাবয়ব থেকে পরার্থানুমানের উৎপত্তির প্রক্রিয়া স্পষ্টতঃ আলোচনা করা হয় নি। আমরা নব্য ন্যায়ে এই আলোচনার সাক্ষাৎ পাই।[২১] গঙ্গেশের রচনাতেই পঞ্চাবয়ব জন্য বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে মহাবাক্য জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার থেকে মানস পরামর্শের উৎপত্তির আলোচনা পাই।[২২] বৈশেষিক

[২১] 'যেখানে 'খণ্ড খণ্ড বাক্যসমূহ মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ বাক্য হইয়াছে সে স্থলে প্রথমে খণ্ড খণ্ড বাক্যগুলি শুনিয়া প্রতিটি বাক্য হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। অনন্তর একটি বাক্যার্থের সহিত অপর একটি বাক্যার্থের সম্বন্ধ বিষয় হইয়া সমুদিত মহাবাক্যার্থের আরও একটি বোধ উৎপন্ন হয়। এই দ্বিতীয় শাব্দবোধকে বলা হয় মহাবাক্যার্থ বোধ' – ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু (অনুবাদক), ১৯৯৩, *অনুমানচিন্তামণি* অনুবাদ ও বিবৃতিসহ, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ১৮।

[২২] 'অন্যে তু পঞ্চাবয়ববাক্যাদ্বিজাতীয়মেব শাব্দজ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি তদ্বিজনকবাক্যত্বং ন্যায়ত্বম্, এবং প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বাদপি প্রত্যেকং বিজাতীয়ং শাব্দজ্ঞানমিতি তত্তদ্বিজনকশব্দত্বমেব তত্তল্লক্ষণমিতি, ...' – উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯০, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (অনুমিত্যাদি-বাধান্ত) অনুমানখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি *'রহস্য* বাই শ্রী মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ভল্যুম – II : পার্ট 1), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), দিল্লী: ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার, পৃষ্ঠা: ৬৮৯, ৬৯৮।

দর্শনেও যেকটি গ্রন্থ আমার দেখার অবকাশ হয়েছে সেইকটিতে পঞ্চাবয়ব থেকে কোন্ ক্রমে পরার্থানুমিতি উৎপন্ন হয় তার আলোচনা দৃষ্ট হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

নৈয়ায়িকগণের মতে অনুমান স্থলে কোন একটি পক্ষ বিশেষে কোন একটি সাধ্যের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান বা অনুমিতির জন্য যে পক্ষে সাধ্য সিদ্ধি অভিপ্রেত সেই পক্ষে হেতুর অস্তিত্বের জ্ঞান বা পক্ষধর্মতার জ্ঞান, যে হেতুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি করতে চাওয়া হচ্ছে সেই হেতুর সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান, এবং উক্ত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান বা পরামর্শাত্মক জ্ঞানের প্রয়োজন। সুতরাং অনুমিতির কারণ সামগ্রী বিশেষ প্রকারের। এই জ্ঞান অনুমানকর্তা নিজেই অর্জন করতে পরেন। অর্থাৎ, অনুমানকর্তা নিজেই হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করে অন্যত্র হেতুর প্রত্যক্ষ (পক্ষধর্মতার জ্ঞান) পূর্বক পূর্বজ্ঞাত ব্যাপ্তির স্মরণাত্মক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এবং পরিশেষে, ব্যাপ্তি স্মরণের উপর ভিত্তি করে পক্ষে সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান (পরামর্শ) লাভ করতে পারেন। এই জ্ঞানটির ভিত্তিতে উক্ত ব্যাক্তি পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান (অনুমিতি) লাভ করে থাকেন। এই কারণেই এই পরামর্শকে অনুমান বলা হয়। অপরদিকে, পক্ষধর্মতার জ্ঞান, ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং পরামর্শ অন্যের বাক্য শ্রবণজন্যও উৎপন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে উক্ত পরামর্শটিকে পরার্থানুমান বলা হয়; এবং যে বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতার উক্ত পরামর্শ হয়ে থাকে সেই বাক্যটিকেও গৌণ অর্থে পরার্থানুমান বলা হয়। অর্থাৎ, স্বার্থানুমান হোক বা পরার্থানুমান উভয় প্রকার অনুমানের প্রতি পক্ষধর্মতার জ্ঞান, ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং পরামর্শ কারণ হয়ে

থাকে। তবে উভয় প্রকার অনুমানের পার্থক্য হল – স্বার্থানুমানস্থলে উক্ত জ্ঞানগুলি অনুমানকর্তা স্বয়ং অর্জন করেন। অপরদিকে, পরার্থানুমানস্থলে অনুমানকর্তা অন্যের বাক্যের উপর নির্ভর করে উক্ত জ্ঞান লাভ করেন।

প্রাচীন ন্যায় ও প্রাচীন বৈশেষিক দর্শনে কোথাও মহাবাক্য থেকে অনুমিতির উৎপত্তির প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে বলে এযাবৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি; তাছাড়া বৈশেষিক দর্শনেও ন্যায়রূপ মহাবাক্য থেকে অনুমিতির উৎপত্তির প্রক্রিয়া স্পষ্টতঃ কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রাচীন ন্যায় ও প্রাচীন বৈশেষিক দর্শনে অবয়ব সমূহের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, ঐ অবয়ব বাক্যসমূহ, অনুমিতির জনক জ্ঞানগুলির উৎপাদক। সাক্ষাৎভাবে ঐ বাক্য সমুদয়, প্রযুক্ত হেতুটি যে হেতুত্ব ধর্মবিশিষ্ট তা প্রতিপাদন করে; যা কিনা অনুমিতির জনক জ্ঞানগুলি লাভের সহায়ক।

(গ)

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতের অনুমান বিষয়ক মত আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে যে যে বিষয়ে পার্থক্য উপলব্ধ হয় তা হলো নিম্নরূপ:

ন্যায়মতে অনুমিতির কারণরূপে পরামর্শ স্বীকার করা হয়েছে এবং তার সপক্ষে যুক্তিও উপস্থাপন করা হয়েছে। অপরপক্ষে, বৈশেষিক পরামর্শের অনুমিতির প্রতি কারণতা স্বীকার করেননি এবং স্বীয়মতের সপক্ষে তাঁরাও নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ

থেকে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু পক্ষধর্মতা জ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানকে উভয়েই অনুমিতির প্রতি কারণরূপে স্বীকার করেছেন।

পরার্থানুমান তথা পঞ্চাবয়বী ন্যায় নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয় দার্শনিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হলেও অবয়ব বাক্যগুলির নামের মধ্যে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। নৈয়ায়িকগণ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন – এই পঞ্চাবয়ব স্বীকার করেন। অপরপক্ষে, বৈশেষিকগণ প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান এবং প্রত্যাম্নায় – এই পঞ্চাবয়ব স্বীকার করেছেন।

ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত পরার্থানুমান ও বৈশেষিক দর্শন সম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপ পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ন্যায় বা, মহাবাক্য শ্রোতাতে হেতু তথা হেতুত্বের জ্ঞান উৎপন্ন করে তাঁর সাধ্যানুমান উৎপন্ন করে। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্রের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, “প্রমাণৈঃ অর্থ পরীক্ষণং ন্যায়ঃ”।[২৩] তাঁর এইরূপ উক্তিতে ব্যবহৃত ‘অর্থ’ শব্দ দ্বারা ‘হেতু’কেই নির্দেশ করেছেন। সুতরাং যে স্থলে ন্যায় রূপ প্রযুক্ত মহাবাক্য শ্রোতাতে হেতু তথা তার হেতুত্বের জ্ঞান উৎপন্ন করে শ্রোতাতে অনুমিতি উৎপন্ন করে সেই অনুমিতি পরার্থানুমিতি নামে

---

[২৩] (ক) “তস্মাৎ প্রমাণানামবান্তরব্যাপারঃ প্রতিজ্ঞাদয় ইত্যুপপন্নং প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণম্।” – বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৯৬, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ৩৫।

(খ) “কঃ পুনরয়ং ন্যায়ঃ? প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং,...” – বাৎস্যায়ন, ২০১১, *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৯।

পরিচিত। তার যে করণ তা পরার্থানুমান। এই অনুমান ন্যায়সাধ্য অনুমান নামেও পরিচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

ন্যায়সম্মত শব্দ প্রমাণ

ন্যায়দর্শনে শব্দ প্রমাণ অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকৃত। বর্তমান অধ্যায়ে নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত শব্দ প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা করা হবে। কারণ, ন্যায়সম্মত শব্দ প্রমাণের স্বরূপ না বুঝলে নৈয়ায়িকগণ কেন শব্দকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত না করে তাকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করেন সেটি বোঝা সম্ভব নয়। শাব্দবোধের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল তার লক্ষণের জ্ঞান।

শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকারকারী নৈয়ায়িকগণের মতে শব্দ প্রমাণজন্য শাব্দবোধ বা, বাক্যার্থবোধ বা, পদার্থসংসর্গবোধ উৎপন্ন হয়। মহর্ষি গৌতম শব্দ প্রমাণের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন – "*আপ্তোপদেশ শব্দঃ*"।[১] অর্থাৎ, আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যই হল শব্দ প্রমাণ। কিন্তু, আপ্ত ব্যাক্তি বলতে নৈয়ায়িকগণ কি বোঝেন সেটি না জানলে অর্থাৎ আপ্তের স্বরূপ না জানলে আপ্ত ব্যক্তির উপদেশরূপ

[১] "আপ্তোপদেশ শব্দঃ ।।১/১/৭।। – মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ১৪।

শব্দ প্রমাণের স্বরূপ বোঝা সম্ভব নয়।[২] অতএব শব্দ প্রমাণের স্বরূপ বুঝতে আপ্তের স্বরূপ বোঝা আবশ্যক।

আপ্তের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে নৈয়ায়িকগণ বলেন সাধারণতঃ সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অর্থের অবধারণকে "আপ্তি" বলে, আর আপ্তি যাঁর আছে তিনি হলেন আপ্ত।[৩] আচ্ছা, সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অর্থের অবধারণ করলেই কি তাকে আপ্ত বলা যায়? না, সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অর্থের অবধারণ করলেই তাকে আপ্ত বলা যায় না। কারণ, কোন ব্যাক্তি সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অর্থের অবধারণ করলেই যে সেই ব্যাক্তি যেরূপে অর্থের অবধারণ করেছেন সেইরূপে অর্থটিকে প্রকাশ করবে এমন নাও হতে পারে। সুতরাং, আপ্ত বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটি বোঝা দরকার। নৈয়ায়িকগণের মতে যদি কোন ব্যক্তি সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অর্থকে যেরূপে অবধারণ করেছেন সেইরূপেই বোঝানোর ইচ্ছা বশতঃ বাক্য প্রয়োগ করেন তাহলে তাঁকে আপ্ত বলা হবে, কেবল বাক্য প্রয়োগকারী বা সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অর্থের অবধারণকারী ব্যক্তিকে নয়। অর্থাৎ, নৈয়ায়িকগণের মতে আপ্ত হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অর্থ (পদার্থ) অবধারণ করেছেন অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎকৃতধর্মা সেই ব্যাক্তি যেরূপে অর্থাবধারণ করেছেন সেইরূপে উপস্থাপনের ইচ্ছা বশতঃ যদি বাক্য প্রয়োগে কৃতযত্ন এবং

---

[২] টেবার, জন এ., ১৯৯৬, "ইস ভার্বাল টেস্টিমোনি এ ফর্ম অফ ইনফারেন্স?", স্টাডিস ইন হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোস্যাল সাইন্সেস, ভলুাম–III নম্বর–২ : পৃষ্ঠা: ২১।

[৩] "*সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিঃ, তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাপ্তঃ।*" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ১৪।

তদনুরূপ বাক্য প্রয়োগে সমর্থ হন তাহলে তাঁকে আপ্ত বলা হয়।[৪] ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, যে কোনো সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা পদার্থের নিশ্চয় হলেই তাকে আপ্তি বলে। ফলে যিনি অনুমানের বা শব্দ প্রমাণের দ্বারা কোনো তত্ত্ব নির্ণয়পূর্বক সেই তত্ত্বপ্রতিপাদক বাক্য বলেন তিনিই হলেন আপ্ত।[৫] কিন্তু "সাক্ষাৎকৃত ধর্ম্মা" হয়েও উক্ত বিষয়ে উপদেশ করতে যাঁর ইচ্ছা হয় না অথবা, যিনি বিপরীতরূপে উপদেশ করেন, তাঁকে আপ্ত বলা যায় না। অর্থাৎ যে পদার্থ যেরূপে অবধারিত হয়েছে, সেইরূপেই তাঁর খ্যাপনেচ্ছা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যথাদৃষ্ট অর্থের খ্যাপনেচ্ছা হলেও যিনি আলস্য ইত্যাদি কারণবশতঃ তার উপদেশে প্রযত্ন উৎপন্ন করেন না, তিনি আপ্ত হতে পারেন না। অর্থাৎ, জ্ঞাত বিষয়ের উপদেশের জন্য তাঁর প্রবৃত্তি থাকতে হবে এবং সেইমত বাক্য প্রয়োগ করতে হবে। এপ্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, ঐরূপ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়পটুত্বের অভাববশতঃ যদি উপদেশ প্রয়োগসামর্থ্য না থাকে, তাহলে তিনিও আপ্ত হতে পারবেন না। নৈয়ায়িকগণের মতে উক্তরূপ আপ্তলক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যরূপ শব্দই হল শব্দপ্রমাণ। আর্য এবং ম্লেচ্ছগণের বহু দৃষ্টার্থ বাক্যও শব্দ প্রমাণ, নচেৎ তাঁদের লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যিনি ঋষি, তিনি হলেন আপ্ত, কিন্তু অন্যান্য লৌকিক বিষয়ে ঋষি ভিন্ন আর্য ও ম্লেচ্ছগণকেও আপ্তরূপেই বিবেচনা

[৪] "*আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা।*" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ১৪।

[৫] আপ্তের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি বাৎস্যায়ন "আপ্ত" শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করে বলেছেন – "সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিঃ, তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাপ্তঃ"। – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১, *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ১৮৯।

করতে হবে। সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বিষয় বিশেষে ঋষি, আর্য ও ম্লেচ্ছগণের পক্ষে উক্তরূপ একটিই আপ্তলক্ষণ দিয়েছেন, যা তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে জ্ঞায়মান বাক্যরূপ শব্দই শাব্দবোধের করণ তথা শব্দপ্রমাণ। তবে নব্য-নৈয়ায়িকগণ শব্দপ্রমাণ বিষয়ে প্রাচীনগণের এই অভিমত গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে – পদজ্ঞান শাব্দবোধের করণ, জ্ঞায়মান শব্দ (পদ) নয়। বিশ্বনাথ *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী* গ্রন্থের শব্দখণ্ডে নব্যমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন – পদজ্ঞানই শাব্দবোধের করণ, জ্ঞায়মান পদ নয়। কারণ, জ্ঞায়মান পদ অর্থাৎ, উচ্চারিত পদ না থাকলেও মৌনী-কৃত শ্লোক বা লিপি হতে শাব্দবোধ হয়ে থাকে। জ্ঞায়মান শব্দকে শাব্দবোধের করণরূপে স্বীকার করলে এইরূপ স্থলে শাব্দবোধের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং জ্ঞায়মান পদকে শাব্দবোধের করণ না বলে পদজ্ঞানকে শাব্দবোধের করণরূপে স্বীকার করতে হবে।[৬] পদজ্ঞানকে শাব্দবোধের বা অন্বয়বোধের করণরূপে স্বীকার করলে পদজন্য পদার্থের স্মৃতিকে (বা, পদজ্ঞানোৎপন্ন পদার্থের স্মরণকে) ব্যাপাররূপে স্বীকার করতে হবে। পদজ্ঞানজন্য পদস্মৃতিকে ব্যাপার না বলে শুধুমাত্র পদার্থের উপস্থিতিকে ব্যাপাররূপে স্বীকার করলে পদজ্ঞানবান্ পুরুষের প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি পদার্থের উপস্থাপক কারণসমূহ দ্বারা পদার্থের উপস্থিতি হলে, সেই

---

[৬] "শাব্দবোধ-প্রকারং দর্শয়তি-পদজ্ঞানন্তিতি। ন তু জ্ঞায়মান পদং করণম্। পদাভাবেহপি মৌনি-শ্লোকাদৌ শাব্দবোধাৎ।" – বিশ্বনাথ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী,* শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪১০।

উপস্থিত পদার্থবিষয়েও শাব্দবোধের আপত্তি হতে পারে। আবার পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি স্থলেও শক্তি ও লক্ষণার অন্যতর সম্বন্ধরূপ বৃত্তি দ্বারা পদজন্য বুঝতে হবে। বৃত্তিদ্বারা পদজন্য না বলে কেবল পদজন্য বললে ঘটাদি পদের জ্ঞান হতে সমবায় সম্বন্ধে আকাশের স্মরণ বা উপস্থিতি উৎপন্ন হলে আকাশেরও শাব্দবোধের আপত্তি হবে, যা স্বীকার করা যায় না।[৭] কিন্তু, প্রশ্ন হতে পারে কি কারণে মহর্ষি শাব্দবোধের করণরূপে শব্দ প্রমাণের লক্ষণ দিলেন না? অন্যান্য বিশেষ প্রমাণের লক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে তো উক্ত পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দ প্রমাণের স্থলে কেন ব্যাতিক্রম? এর উত্তরে বলা যায় শাব্দবোধের করণরূপে যদি শব্দ প্রমাণের ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে শাব্দবোধের লক্ষণ পূর্বে নিশ্চিত করা আবশ্যক। কারণ, শাব্দবোধের স্বরূপ না বুঝলে শাব্দবোধের করণরূপে শব্দ প্রমাণের স্বরূপ বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যা হল – শাব্দবোধকে অতিরিক্ত প্রমারূপে স্বীকার করা যাবে কি না এই বিষয়ে সমানতন্ত্র বৈশেষিকগণের সঙ্গে মত পার্থক্য বিদ্যমান। বাক্যার্থের বোধ বা শাব্দবোধ অতিরিক্ত প্রমা কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসা না হলে শাব্দবোধের করণরূপে শব্দ প্রমাণের লক্ষণ দেওয়া কার্যকর হবে না। সম্ভবতঃ শাব্দবোধের করণরূপে শব্দ প্রমাণের লক্ষণ প্রদান না করার এটি অন্যতম কারণ। আপ্তোপদেশ হলো শব্দ প্রমাণ। অর্থাৎ উক্ত লক্ষণ শব্দ প্রমাণেরই।

[৭] "স্ব স্ববৃত্ত্যাপদার্থানামুপস্থিতি..." – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দ শক্তি প্রকাশিকা* (প্রথম খণ্ড), মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

মহর্ষির মতে দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক ভেদে শব্দপ্রমাণ দ্বিবিধ।[৮] এখন মনে হতে পারে, লৌকিক আপ্তব্যক্তিগণের দৃষ্টার্থ শব্দও যে শব্দপ্রমাণ, তা তো সর্বজনস্বীকৃতই, নচেৎ লৌকিক ব্যবহার অনিষ্পন্ন হয়ে পড়ে। আমাদের প্রাত্যহিক তথা দৈনন্দিন জীবনে সত্যবাদী বিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যশ্রবণপূর্বক তদনুসারে অসংখ্য ব্যবহার প্রতিনিয়ত নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। এমনকি বিবাদ স্থলেও সত্যবাদী প্রকৃত সাক্ষীর বাক্যশ্রবণপূর্বকই সত্য নির্ণীত তথা গৃহীত হয়ে থাকে। তথাপি মহর্ষি পৃথক সূত্রের অবতারণাপূর্বক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভেদে শব্দপ্রমাণের উল্লেখ করলেন কেন? কেবলমাত্র দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যকেই শব্দপ্রমাণ বলে যদি কেউ মনে করেন, তাঁর সেই মতের বিরোধিতার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ মহর্ষি গৌতম অষ্টম সূত্রের দ্বারা বলেছেন যে, অদৃষ্টার্থ বেদাদি শাস্ত্ররূপ আপ্তবাক্যকেও শব্দপ্রমাণরূপে গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রোক্ত দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ – এই দ্বিবিধ আপ্তবাক্যকে ঋষিবাক্য ও লৌকিকবাক্যসমূহের প্রকারভেদ বলেছেন। তাঁর মতে, ইহলোকে যার প্রতিপাদ্য অর্থ দৃষ্ট হয়, তা হলো "দৃষ্টার্থ"; আর পরলোকে যার অর্থ প্রতীত হয় অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয় না, তা হলো

[৮] স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ।।১/১/৮।। – মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ১৪।

"অদৃষ্টার্থ"।[৯] এখন প্রশ্ন হতে পারে, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থসমূহ যেমন – স্বর্গ ইত্যাদি পদার্থসমূহ, আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষযোগ্য তথা দৃষ্ট না হওয়ায়, তাদের প্রামাণ্য কীরূপে স্বীকার করা যাবে? এর উত্তরে ভাষ্যকার বলেছেন, "অর্থস্যানুমানাৎ"।[১০] উক্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন যে, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য স্বর্গ ইত্যাদি অলৌকিক পদার্থ ইহলোকে আমাদের দৃষ্ট না হলেও তা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ; যেহেতু সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ।[১১] যেসকল নাস্তিক ব্যক্তিগণ নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমান প্রমাণ স্বীকার করেছেন, তাঁরা সকলেই অনুমানপ্রমাণ দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হলে, বেদ তথা শব্দকেও প্রমাণরূপে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। তাহলে অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থও পরম্পরায় সেই অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায়, তাকেও তাঁদের স্বীকার করে নিতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যিনি শব্দকে প্রমাণ বলেই স্বীকার করেন না, এমন নাস্তিক এক্ষেত্রে ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ নন, বরং যিনি শব্দপ্রমাণ

---

[৯] যস্যেহদৃশ্যতেহর্থঃ, স দৃষ্টার্থঃ। যস্যামুত্র প্রতীয়তে, সোহদৃষ্টার্থঃ। এবমৃষিলৌকিকবাক্যানাং প্রবিভাগ ইতি। – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ১৪।

[১০] – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ পৃষ্ঠা: ১৪।

[১১] "...স্বর্গযাগাদিসম্বন্ধাদীনামনুমানবিষয়তা।..." – বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৯৬, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ১৭১।

স্বীকার করেও বেদাদিকে শব্দপ্রমাণরূপে গণ্য করেন না, এমন নাস্তিককেই এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ 'নাস্তিক' শব্দের দ্বারা বুঝতে হবে।[১২]

এখানে আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রোক্ত দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ এই দ্বিবিধ আপ্ত বাক্যকে যথাক্রমে লৌকিকবাক্য ও ঋষিবাক্যের প্রকারভেদরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। লৌকিক শব্দকে যাঁরা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না তাঁদের মতেরও বিরোধিতা করেছেন। ঋষিবাক্যভিন্ন সমস্ত বাক্যই হল তাঁর মতে লৌকিক বাক্য। কিন্তু ঋষিগণ অদৃষ্টার্থবাক্য ছাড়া বহু দৃষ্টার্থবাক্যও বলেছেন। যে বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ ইহলোকে দৃষ্ট নয়, কিন্তু অনুমানাদি কোনো প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ, তা হল অদৃষ্টার্থ বাক্য। এখন কেউ আপত্তি করতেই পারেন যে, তাহলে ইহলোকে অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ বা জ্ঞাত পদার্থের প্রতিপাদক লৌকিক বাক্যসমূহকেও উক্ত অর্থে অদৃষ্টার্থ বাক্য বলা যাবে। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে, যে বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ পরলোকে প্রতীত হয়, তাকেই এক্ষেত্রে অদৃষ্টার্থ বাক্য বলে বুঝতে হবে। সুতরাং বলা যায়, ভাষ্যকারের মতে স্বর্গাদি পদার্থের প্রতিপাদক বেদবাক্যকেই অদৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যরূপে গণ্য করা সমীচীন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও 'যে বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ শব্দপ্রমাণ ও তন্মূলক অনুমান প্রমাণভিন্ন আর অন্য কোনো প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না,

---

[১২] "স ইতি। বিপ্রকৃষ্টো নাস্তিকঃ..." – বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৯৬, *ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ১৭২।

তাই হল অদৃষ্টার্থক শব্দপ্রমাণ' – এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।[১৩] পরবর্তীকালে প্রখ্যাত নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর '*তত্ত্বচিন্তামণি* নামক গ্রন্থের শব্দখণ্ডের অন্তর্গত "তাৎপর্যবাদ" অংশে অনুরূপ কথাই বলেছেন।[১৪]

এখানে এটিও বলা আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম পরে শব্দের নিত্যত্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক অনিত্যত্বপক্ষেরই সংস্থাপন করায় তাঁর মতানুসারে বেদ নিত্য নয়, কিন্তু পৌরুষেয়, অর্থাৎ আপ্ত পুরুষ কর্তৃক প্রণীত। সুতরাং সেই আপ্তপুরুষের প্রামাণ্যপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। সেই কারণে মহর্ষি প্রদত্ত অনুমানের যে লক্ষণ, তা নৈয়ায়িকগণের পরতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থন করে বলে মনে হয়। কারণ প্রযুক্ত বাক্য শ্রোতার বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ অনুভবের উৎপত্তি ঘটায় কেননা, উক্ত বাক্যের বক্তা হলেন আপ্ত পুরুষ ঈশ্বর। বস্তুতঃ শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্যকে অবলম্বন করেই প্রামাণ্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তাই পরে ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের অন্তিমতম সূত্রে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম "আপ্তপ্রামাণ্যাৎ" কথাটি উল্লেখ করেছিলেন।[১৫] অনুরূপভাবে ৬/১/১ সংখ্যক বৈশেষিক

---

[১৩] – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১, *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ১৯২।

[১৪] উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ডং,* শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ৩৬।

[১৫] "মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাত্ ।। ২/১/৬৮।।" – মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ৯৬।

সূত্রে মহর্ষি কণাদও বলেছেন, "বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদ" অর্থাৎ, বেদবাক্যের যে রচনা তাও লৌকিকবাক্য রচনার ন্যায় রচয়িতার বুদ্ধিপূর্বকই হয়ে থাকে।[১৬] তদনুসারেই পরবর্তীকালে ন্যায়বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যাতা আচার্যগণ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ খণ্ডনপূর্বক পরতঃপ্রামাণ্যবাদেরই সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে, জ্ঞানের প্রমাত্ব যেমন অনুমানপ্রমাণ দ্বারা বোধ্য, তদ্রূপ সেই প্রমাজ্ঞানের করণ প্রমাণপদার্থের প্রামাণ্যও অনুমানপ্রমাণবোধ্য। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে, "প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তি–সামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং" - এইভাবে সেই অনুমানটিকে প্রকাশ করেছেন।[১৭] উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় নৈয়ায়িক প্রদত্ত লৌকিক বাক্য ও অলৌকিক বাক্য উভয় ক্ষেত্রের ব্যাখ্যাতেই সাম্য আছে। লৌকিক বাক্যকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করে বৈদিক বাক্যকেই একমাত্র প্রমাণরূপে তাঁরা স্বীকার করেননি। আবার উভয় প্রকার বাক্যার্থের জ্ঞানকেই নৈয়ায়িকগণ শাব্দবোধ বলেই গণ্য করেছেন। কেবলমাত্র বৈদিক বাক্যার্থবোধকেই শাব্দবোধের ক্ষেত্র বলে গণ্য করেননি। এই অর্থে নৈয়ায়িকের ব্যাখ্যা উভয় প্রকার বাক্য স্থলেই সাধারণ।

পদ জন্য পদার্থ জ্ঞান আর বাক্য জন্য বাক্যার্থ বোধের মধ্যে তফাৎ আছে। সেই কারণেই পদজন্য পদার্থ জ্ঞান আর বাক্যজন্য বাক্যার্থ জ্ঞানের আলোচনা পৃথকভাবে করা

---

[১৬] – চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ১৮৮৭, *কণাদমহর্ষি-প্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্যসমেতম্*, কলিকাতা: সেরপুরনিবাসী শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা: ১২০।

[১৭] – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ১।

প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনে পদের আলোচনা ও বাক্যের আলোচনা সর্বদাই পৃথক পৃথকভাবে করা হয়েছে। পদশাস্ত্র হিসাবে ব্যাকরণ ও বাক্যশাস্ত্র হিসাবে মীমাংসা দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পদ জন্য পদার্থ বোধের স্বরূপ নিয়েও চিন্তাবিদগণের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়কে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নি। আমরা বাক্যার্থবোধের স্বরূপ নিয়েই আলোচনা করছি।

আমরা জানি, বাক্য শ্রবণ জন্য বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় এবং বিশেষ অর্থে পদসমূহকে বাক্য বলা হয়। বাক্যের ঘটক পদের লক্ষণ বিষয়ে প্রাচীন এবং নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। মহর্ষি গৌতম পদের লক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে ন্যায়সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের আটান্ন সংখ্যক সূত্রে বলেছেন, "*তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদং।*"[১৮] সূত্রোক্ত "তে" শব্দের দ্বারা তিনি যথাপ্রমাণ অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বিকৃত বর্ণসমূহকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, মহর্ষির মতে বর্ণ বিকৃতি বলতে ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে 'ই'কারাদি বর্ণের প্রয়োগ না করে 'য'কারাদি বর্ণের প্রয়োগকে বোঝানো হয়েছে।[১৯] সুতরাং, তাঁর মতে, পূর্বোক্ত বিকৃত বর্ণসমূহ বিভক্ত্যন্ত হলে তাকে পদ বলে। এখানে বলা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার আরও সুস্পষ্টভাবে মহর্ষির অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি নামিকী এবং তি, তস্, অন্তি,

---

[১৮] – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ১২৮।

[১৯] – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০০০, *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ৪৮৫।

প্রভৃতি আখ্যাতিকীরূপ বিভক্তি যুক্ত হয়ে বিকৃত বর্ণসমূহ পদত্ব প্রাপ্ত হয়।[২০] কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকগণ বিভক্ত্যন্তকে পদ বলেন না। তাঁদের মতে পদার্থবোধক সামর্থ্য যার আছে তাকে পদ বলে। বিভক্তির অর্থবোধক সামর্থ্য থাকায় বিভক্তিকেও পদ বলতে হবে।[২১] সুতরাং, নব্যমতে, প্রাচীন সম্মত বিভক্তি বিশিষ্টকে পদ না বলে বাক্য বলাই সঙ্গত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও *ন্যায়সূত্রবৃত্তিতে* নব্যগণের এই অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে অথবা-কল্পে বৃত্তিমত্ত্বকেই পদের লক্ষণ বলেছেন।[২২] তাছাড়া, 'চ', 'তু' প্রভৃতি নিপাতের উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ হয় না। সুতরাং, "বিভক্ত্যন্তাঃ পদং" – এইরূপ পদের লক্ষণ করলে নিপাত প্রভৃতি পদের লক্ষণাক্রান্ত হবে না। এই কারণেই নব্যনৈয়ায়িকগণ বিভক্ত্যন্তকে পদের লক্ষণ না বলে বৃত্তিমত্ত্বকে পদের লক্ষণ বলেছেন। তবে ভাষ্যকার স্বয়ং ন্যায়সূত্রভাষ্যে এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করে উত্তর প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, নিপাতাদি অব্যয় শব্দ। আর অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ ব্যাকরণ সম্মত হওয়ায়

---

[২০] "*যথাদর্শনং বিকৃতা বর্ণা বিভক্ত্যন্তাঃ পদসংজ্ঞা ভবন্তি। বিভক্তির্দ্বয়ী, নামিক্যাখ্যাতিকী চ।*" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ১২৮।

[২১] The Naiyāyika-s does not follow the Grammarians, definition of *pada* which is "সুপ্তিঙন্তং পদম্". (Pā. I.4.14). They define *pada* as that form which meaning is understood. শক্তং পদম্. Thus the stem and the suffix are also considered to be separate *pada -s*, whereas, according to the Grammarians, the stem and the suffix together make a *pada*. - শর্মা, ই. আর. শ্রীকৃষ্ণ (অনুবাদক), ১৯৬০, *মণিকণা* এ নব্যন্যায় ম্যানুয়াল, ম্যাড্রাস: আড্যার লাইব্রেরী অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, পৃষ্ঠা: ১৩৩।

[২২] "*অথবা বিভক্তির্বৃত্তিরন্তঃ সম্বন্ধস্তেন বৃত্তিমত্ত্বং পদত্বমিতি,......।*" – ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ, *ন্যায়সূত্র-বৃত্তি,* শ্রী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), বেনারস: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ২১৫।

নিপাতাদি পদের লক্ষণাক্রান্তই হবে, পদের পৃথক লক্ষণ নিষ্প্রয়োজন।[২৩] কিন্তু, নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে উপসর্গ সার্থক হলেও সেগুলি নিপাতই, এবং নিপাতের উত্তর বিভক্তির প্রয়োগও তিনি স্বীকার করেননি।[২৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে পদের লক্ষণ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্পষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। তবে ফণিভূষণ তর্কবাগীশের মতে, ভাষ্যকারের অভিমতের মধ্যে প্রাচীন শাব্দিক মতের প্রতিফলন দৃষ্ট হলেও জগদীশ তর্কালঙ্কারের সিদ্ধান্ত কোনও ব্যাকরণ-শাস্ত্রগ্রন্থ সম্মত কিনা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। সেই দিক থেকে বিচার করলে ভাষ্যকারের অভিমতই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। অর্থাৎ, পদের লক্ষণরূপে 'বৃত্তিমত্ত্বং পদত্বং' অপেক্ষা 'বিভক্ত্যন্তাঃ পদং' অধিক গ্রহণযোগ্য।[২৫]

আমরা পূর্বেই বলেছি যে পদসমূহাত্মক বাক্যার্থের বোধই আমাদের আলোচ্য বিষয়। যদিও পদার্থের বোধ ব্যতীত বাক্যার্থের বোধ সম্ভব নয়; তাই বাক্যার্থবোধ এবং পদার্থবোধের স্বরূপ বোঝা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই নৈয়ায়িকগণ শাব্দবোধের আলোচনায় যে পদসমূহের দ্বারা বাক্য গঠিত হয়, সেই পদসমূহের দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থ

---

[২৩] "*উপসর্গনিপাতাস্তর্হি ন পদসংজ্ঞাঃ? লক্ষণান্তরং বাচ্যমিতি। ন, শিষ্যতে চ খলু নামিক্যা বিভক্তেরব্যয়াল্লোপস্তয়োঃ পদসংজ্ঞার্থমিতি।*" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ১২৮।

[২৪] "*স্বার্থে শব্দান্তরার্থস্য তাদাত্ম্যেনান্বয়ক্ষমঃ।*

সুবাদ্যন্যো নিপাতোঽসৌ বিবিধশ্চাদিভেদেতঃ।।১১।।" – তর্কালঙ্কার, জগদীশ, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* ১৯৮০, মধুসুদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা: ১২২।

[২৫] – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০০০, *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ৪৮৮।

বোধের প্রক্রিয়া আলোচনা করেন, এবং সম্পূর্ণ বাক্যার্থবোধের অর্থাৎ, পদজন্য স্মৃত পদার্থ-সমূহের মধ্যে সংসর্গবোধের প্রক্রিয়ার আলোচনা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করেছেন। প্রশ্ন হল, পদ-শ্রবণজন্য পদার্থ স্মরণের প্রক্রিয়াই বা কী, আর উক্ত স্মৃত পদার্থ-সমূহের মধ্যে সংসর্গবোধের প্রক্রিয়াই বা কী? এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, পদ ও পদার্থের মধ্যে "বৃত্তি" নামক একটি সম্বন্ধ থাকে; সেই সম্বন্ধের জ্ঞান যাঁর আছে বিশেষ পদ শ্রবণ করলে তাঁর বিশেষ অর্থের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের স্বরূপ কী? এই বিষয়ে মতপার্থক্য আছে।[২৬] কারও কারও মতে পদ শ্রবণ জন্য পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান যাঁর আছে তাঁর পদার্থের অনুমান হয়। উক্ত মতে পদ ও পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বর্তমান। কিন্তু এই সম্বন্ধ সর্ববাদী সম্মত নয়। বিভিন্ন যুক্তিতে পদ ও পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে – এই মতের খণ্ডন করা হয়েছে। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হলো বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ। শব্দ ও অর্থের মধ্যে ব্যাপ্তি নামক স্বাভাবিক সম্বন্ধ নেই; কারণ শব্দ ও অর্থের মধ্যে যদি স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকত তাহলে ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো অর্থ বিশেষকে বোঝাতে কোনও বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা যেত না অথবা, একই শব্দ দিয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থকে নির্দেশ করা যেত না। উপরন্তু বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থেকে স্বরূপতঃ পৃথক তা ব্যাপ্তিগ্রহোপায় ও বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ গ্রহণের উপায়ের ভিন্নতা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের নিয়ামক স্বভাব। অর্থাৎ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ

[২৬] "*বৃত্তিত্বং তু পদার্থ-প্রতিযোগিক-পদানুযোগিক-শাব্দবোধানুকূল-সম্বন্ধত্বম্।*" – শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর* উপর *মুক্তাবলী-সংগ্রহ*, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, পৃষ্ঠা: ৪১১ – ৪১২।

স্বভাবের উপর নির্ভর করে। কিন্তু শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ হলো সংকেত বা, ‘এই শব্দের দ্বারা এই অর্থকে বুঝতে হবে’ – এইরূপ ইচ্ছা। এই কারণে পদ জ্ঞান জন্য পদার্থ জ্ঞান, ব্যাপ্য জ্ঞান জন্য ব্যাপকের জ্ঞান হতে পৃথক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমরা কিন্তু পদ শ্রবণ জন্য পদার্থ জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে মতপার্থক্য নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করবো না। এই বোধকে স্মরণাত্মক ধরে নিয়েই আলোচনা করবো। নৈয়ায়িকগণের মতে এই বৃত্তি সম্বন্ধ শক্তি ও লক্ষণা ভেদে দ্বিবিধ। শক্তির স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে “এই পদ হতে এই অর্থ বুঝতে হবে” – এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি। আধুনিক নামের ক্ষেত্রেও এই ইচ্ছা বিদ্যমান। “পুত্রজন্মের একাদশ দিবসে পিতা পুত্রের নামকরণ করবে” - এইরূপ বেদবাক্যের দ্বারা বোঝা যায় আধুনিক নামের দ্বারা যে অর্থ আমরা বুঝিয়ে থাকি সেই নামকরণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরেচ্ছা বিদ্যমান থাকায় আধুনিক নামজন্য যে অর্থের বোধ হয় সেটিও ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তিজন্যই হয়ে থাকে।[২৭] প্রতিবাদী কেউ এইরূপ বেদবাক্যের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধ হতেই পারেন; সেক্ষেত্রে নৈয়ায়িকগণের পক্ষ থেকে উত্তর হতে পারে – তাঁদের মতে ঈশ্বরেচ্ছা সকল কার্যের প্রতি সাধারণ কারণ। সুতরাং, আধুনিক নামকরণের প্রতিও ঈশ্বরেচ্ছা কারণরূপে বিদ্যমান থাকায় বলা যেতে পারে আধুনিক

[২৭] “আধুনিকে নাম্নি শক্তিরস্ত্যেব, “একাদশেঽহনি পিতা নাম কুর্য্যাদি”তীশ্বরেচ্ছায়াঃ সত্ত্বাৎ।” – বিশ্বনাথ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী,* শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪১৬ – ৪১৭।

নামকরণের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তি বিদ্যমান। তবে, নব্য-নৈয়ায়িকগণ কেবল ঈশ্বরেচ্ছাকে শক্তি না বলে ইচ্ছা মাত্রকেই শক্তি বলেন।

প্রশ্ন হল, পদ ও পদার্থের মধ্যে শক্তিরূপ সম্বন্ধ থাকলেই কি কোন একটি পদ শ্রবণ করলে পদার্থের স্মরণ হবে? এর উত্তরে বলা যায়, পদ ও পদার্থের মধ্যে শক্তি সম্বন্ধ থাকলেই কেবল হবে না, ঐ শক্তি সম্বন্ধের জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। অর্থাৎ, কোন পদে কোন পদার্থ-বোধক শক্তি বিদ্যমান সেটি না জানলে পদ শ্রবণ করলেও পদার্থের স্মরণ হবে না।[২৮] এই কারণে নৈয়ায়িকগণ শক্তিগ্রহের বিভিন্ন উপায়ও প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের মতে,

"*শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোষাপ্ত-বাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ।*

বাক্যস্য শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধা।"

অর্থাৎ, ব্যাকরণ, উপমান, কোশ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি বা বিবরণ এবং সিদ্ধপদের (প্রসিদ্ধার্থক পদের) সান্নিধ্য থেকে শক্তির জ্ঞান হয়।[২৯] সুতরাং, কোন্ পদের শক্তি কোন্ অর্থে - এই জ্ঞান যে ব্যক্তির আছে সেই ব্যক্তিরই উক্ত বিশেষ পদ শ্রবণ জন্য বিশেষ অর্থের স্মরণ হয়ে থাকে, সকল ব্যক্তির বা সকল পদের নয়।

---

[২৮] "অত্রৈব শক্তিজ্ঞানস্যোপযোগঃ, পূর্ব্বং শক্তিগ্রহাভাবে পদজ্ঞানেঽপি তৎসম্বন্ধেন তৎস্মরণানুৎপত্তেঃ।" – বিশ্বনাথ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী*, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪১৩।

[২৯] বিশ্বনাথ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী*, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪১৮ – ৪১৯।

নৈয়ায়িকগণের মতে এই শক্তির দ্বারা পদ যে অর্থকে বোঝায় তাকে শক্যার্থ বা মুখ্যার্থ বলা হয়ে থাকে। নৈয়ায়িকগণ শক্তি ভিন্ন অপর একটি সম্বন্ধও স্বীকার করেন। যেটিকে তাঁরা লক্ষণাবৃত্তি বলেন। তবে এই লক্ষণাবৃত্তিও শক্তি সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। এই কারণে তাঁরা লক্ষণাকে শক্য সম্বন্ধ বলেন। নৈয়ায়িকগণের মতে কোন বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে তাৎপর্যের অনুপপত্তি হলে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা লক্ষার্থ গ্রহণ করতে হয়।[৩০] শক্তি ও লক্ষণার স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীন এবং নব্যন্যায়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থাকলেও বর্তমান নিবন্ধে উক্ত বিচারের পর্যালোচনা প্রয়োজনীয় না হওয়ায় সেবিষয়ের অবতারণা থেকে বিরত থাকলাম।

সুতরাং, নৈয়ায়িকগণের মতে আপ্ত ব্যক্তি প্রদত্ত বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহের বৃত্তি জ্ঞান যাঁর আছে তিনি যদি উক্ত বাক্যটি শ্রবণ করেন তাহলে তাঁর বাক্যান্তর্গত পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের স্মরণ হয়ে থাকে।[৩১] পরবর্তীতে স্মৃত পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের বোধরূপ শাব্দবোধ হয়ে থাকে। একটি বাক্যের ঘটক নানা পদ হতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নানা পদার্থের জ্ঞান হলেই তাকে বাক্যার্থজ্ঞান বা বাক্যার্থবোধ বলা যায় না। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পদার্থপ্রতীতির পরে প্রতীত পদার্থগুলির পরস্পর সংসর্গপ্রতীতি বা অন্বয়প্রতীতিই হলো বাক্যার্থপ্রতীতি; যার অপর নাম অন্বয়বোধ, শাব্দবোধ, সংসর্গবোধ

[৩০] "*লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ*" – বিশ্বনাথ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, *কারিকাবলী*, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৪৪।

[৩১] কেউ কেউ আবার পদশ্রবণ জন্য পদার্থের অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলে স্বীকার করেছেন।

বা বাক্যার্থবোধ।[৩২] একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা বিষয়টি আলোচনা করতে পারি। ধরা যাক দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে বললেন – "ঘটম্ আনয়ঃ"। এই বাক্য শ্রবণ করলে যজ্ঞদত্তের বাক্যান্তর্গত পদ শ্রবণজন্য পদার্থের স্মরণ হয়ে থাকে। (এখানে ঘট পদের অর্থ – ঘট, অম্ পদের অর্থ – কর্মত্ব, আ+নী ধাতুর অর্থ – আনয়ন এবং আখ্যাতের অর্থ – কৃতি।) পরবর্তীতে যজ্ঞদত্তের স্মৃত পদার্থসমূহের সংসর্গের বোধ তথা শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ঘট পদার্থের সাথে অম্ পদার্থের (কর্মত্বের) আধারত্ব সম্বন্ধ, তার সঙ্গে ধাত্বর্থতাবচ্ছেদক সন্নিহিতদেশসংযোগের নিরূপকত্ব সম্বন্ধ, ঐ সংযোগের সঙ্গে ধাত্বর্থব্যাপারের অনুকূলত্ব সম্বন্ধ, ধাত্বর্থব্যাপারের সঙ্গে আখ্যাতার্থ কৃতির অনুকূলত্ব সম্বন্ধ এবং ঐ কৃতির সঙ্গে কর্তৃ পদার্থের (ত্বম্ পদার্থের) আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধও বিষয় হয়। ফলে 'ঘটনিষ্ঠাধেয়তানিরূপকসন্নিহিতদেশসংযোগানুকূলকৃতিমান ত্বম্' – এই আকারের শাব্দবোধ হয়ে থাকে। পদশ্রবণজন্য পদার্থের স্মরণ উৎপন্ন হলেও বাক্যার্থবোধ বা পদার্থ সংসর্গবোধ কিন্তু কোনও পদশ্রবণজন্য উৎপন্ন হয় না; তা আকাঙ্ক্ষাভাস্য। অর্থাৎ পদগুলি যে ক্রমে উচ্চারিত হয় সেই ক্রম থেকেই সংসর্গের বোধ হয়।

প্রশ্ন হল, যে কোন পদ সমূহের জ্ঞান হতে স্মৃত পদার্থ সমূহের মধ্যে অন্বয়ের বোধই কি শাব্দবোধ? এর উত্তরে বলা যায়, যে কোন পদ সমূহের জ্ঞান হতে উপস্থিত পদার্থ সমূহের মধ্যে অন্বয়ের বোধ শাব্দবোধ নয়; বিধি সম্মত বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহের জ্ঞান হতে স্মৃত পদার্থ সমূহের মধ্যে অন্বয়ের বোধই শাব্দবোধ। বিধিসম্মত

[৩২] – কর, গঙ্গাধর, ২০০৩, *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা*, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃষ্ঠা: ৫২৪।

বাক্য বলতে আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট পদ সমূহকে বোঝায়। বাক্য শ্রবণ জন্য বাক্যার্থের জ্ঞানের উৎপত্তিতে এদের জ্ঞানকে নৈয়ায়িকগণ সহকারী কারণ বলে স্বীকার করেন। অনেকার্থক পদ বিশিষ্ট বাক্যের শ্রবণ জন্য বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে তাৎপর্য জ্ঞানকে সহকারী কারণ বলা হয়েছে।[৩৩] এই কারণে নৈয়ায়িকগণ আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতার (এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাৎপর্যের) জ্ঞানকে শাব্দবোধের সহকারী কারণরূপে স্বীকার করেন।

নৈয়ায়িকগণ তাৎপর্যের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, - বক্তার অভিপ্রায় বা ইচ্ছাই তাৎপর্য।[৩৪] আর, এই তাৎপর্যের জ্ঞান হল শাব্দবোধের কারণ। যে পদসমূহ দ্বারা বাক্য গঠিত সেই পদসমূহ একার্থক ও অনেকার্থক উভয়ই হতে পারে। যেমন, বক্তা যখন "সৈন্ধবমানয়" – এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন তখন, "সৈন্ধব" শব্দের দ্বারা তিনি সিন্ধু দেশের অশ্বকে বোঝাতে চাইছেন নাকি লবণ বিশেষকে বোঝাতে চাইছেন সেটি জানা আবশ্যক। অর্থাৎ, "সৈন্ধব" শব্দের দ্বারা বক্তা কোন অর্থ বোঝাতে চাইছেন সেটি

---

[৩৩] "*আসত্তিজ্ঞানং যোগ্যতাজ্ঞানম্ আকাঙ্ক্ষাজ্ঞানং তাৎপর্য্যজ্ঞানঞ্চ শাব্দবোধে কারণম্।*" – বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ কারিকাবলী*, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৬৪।

[৩৪] "*বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতম্*"। - বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ কারিকাবলী*, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৭৩।

জানা প্রয়োজন। এই কারণেই বক্তার অভিপ্রায় বা ইচ্ছারূপ তাৎপর্যের জ্ঞানকে শাব্দবোধের অন্যতম কারণরূপে গণ্য করা হয়।[৩৫]

কিন্তু আপত্তি হল, প্রকরণের দ্বারাই আমরা বক্তার অভিপ্রায় জানতে পারি। যেমন, বক্তা যদি ভোজন কালে "সৈন্ধব" শব্দের প্রয়োগ করেন তাহলে শ্রোতা বুঝতে পারেন যে তিনি লবণ বিশেষকে বোঝাতে উক্ত শব্দ প্রয়োগ করেছেন। পক্ষান্তরে, গমনোদ্যোগকালে যদি উক্ত শব্দ প্রয়োগ করেন তাহলে বোঝা যায় তিনি অশ্ব বিশেষকে বোঝাতে চাইছেন। সুতরাং, তাৎপর্যের জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণরূপে স্বীকার না করে প্রকরণের জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণরূপে গণ্য করাই শ্রেয়।[৩৬]

এর উত্তরে বলা যায়, শাব্দবোধের প্রতি প্রকরণের জ্ঞান জন্যই তাৎপর্যের জ্ঞান হয়ে থাকে। তবে এই প্রকরণগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অর্থাৎ, এদের কোন অনুগত ধর্ম না থাকায়, অসংখ্য প্রকরণকে শাব্দবোধের কারণরূপে স্বীকার করতে হবে। ফলে, মহাগৌরব হবে। এই কারণে প্রকরণের জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না। এর উত্তরে কেউ বলতে পারেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ থাকলেও প্রত্যেকেই

---

৩৫ "'বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্যম্' অর্থাৎ বক্তার ইচ্ছাই হল তাৎপর্য। তবে বক্তার ইচ্ছামাত্রই তাৎপর্য নয়। 'সোঽর্থঃ পরো বিবক্ষিতো বোধয়িতুমুক্তো যস্য পদস্য তত্ তত্পরং, তস্য ভাবঃ তাৎপর্যম্' অর্থাৎ 'তদর্থবোধেচ্ছয়া উচ্চারিতত্বমিত্যর্থঃ'। 'সেই অর্থ বোধের ইচ্ছায় এই শব্দটি উচ্চারিত হয়েঢ়ে' –এরূপ তাৎপর্যজ্ঞান সেই অর্থের শাব্দবোধের প্রতি কারণ।" – কর, গঙ্গাধর, ২০০৩, শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃষ্ঠা: ৫৩৭।

৩৬ অতএব 'সৈন্ধবমানয়' ইত্যাদৌ অপি লবণপরত্বধীঃ ন লবণাদ্যন্বয়বুদ্ধৌ হেতুঃ, কিন্তু তদর্জকত্বেন অভিমতং ভোজনাদিপ্রকরণস্য প্রতিসন্ধানমিতি ন্যায়সিদ্ধান্তঃ। - জগদীশ তর্কালঙ্কার, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ১ম খণ্ড, ১৯৮০, শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য (সম্পাদিত ও অনূদিত), কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৬৪।

তাৎপর্যজ্ঞানের জনক হয়ে থাকে। সুতরাং, তাৎপর্যজ্ঞানজনকত্বরূপ ধর্মটিকে প্রকরণের অনুগতধর্মরূপে গ্রহণ করা যায়। ফলে পূর্বোক্ত গৌরবের আপত্তি প্রযোজ্য নয়।

পুনরায়, আপত্তি হতে পারে, যে স্থলে নানার্থক শব্দযুক্ত বাক্য থাকে না সেখানে শাব্দবোধের জন্য তাৎপর্যজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।[৩৭] তাছাড়া, শাব্দবোধের অন্যান্য কারণসামগ্রী উপস্থিত থাকলে তাৎপর্যজ্ঞানের বিলম্বে শাব্দবোধের বিলম্বও হয় না। তাৎপর্যজ্ঞানের অভাবেও সংবাদী শুকবাক্য শ্রবণজন্য শাব্দবোধ হয়ে থাকে।[৩৮] এই কারণেই গঙ্গেশোপাধ্যায়াদি নব্য নৈয়ায়িকগণ শাব্দবোধের প্রতি তাৎপর্যজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন না।[৩৯]

---

[৩৭] – কর, গঙ্গাধর, ২০০৩, *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা,* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃষ্ঠা: ৫৩৮।

[৩৮] "...তাবৎ পদজ্ঞানাদেব শুকস্যৈব বাক্যরচনোপপত্তেঃ।" – উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ডং,* শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ৩।

[৩৯] বিশ্বনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন – "*অন্যে তু নানার্থাদৌ ক্বচিদেব তাৎপর্য্যজ্ঞানং কারণম্। তথাচ শুকবাক্যে বিনৈব তাৎপর্য্যজ্ঞানং শাব্দবোধঃ*"। (– বিশ্বনাথ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী,* ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৭৫ – ৪৭৬।) তবে, বিশ্বনাথ নিজে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে বহু স্থলেই তাৎপর্য্যজ্ঞান ব্যতীত শাব্দবোধের উপপত্তি হয় না। যেমন, "সৈন্ধবমানয়" ইত্যাদি বাক্য স্থলে শাব্দবোধের প্রতি তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তবে, নানার্থক শব্দবিশিষ্ট বাক্য ভিন্ন বাক্যার্থের প্রতি অর্থাৎ, শাব্দবোধ সামান্যের প্রতি তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণতাও স্বীকার করা যায় না। কিন্তু, ক্ষেত্র বিশেষে শাব্দবোধের প্রতি তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণতা অস্বীকার করে অন্যত্র স্বীকার করলে অনুগতও হয় না। এই কারণে তিনি শাব্দবোধ সামান্যের প্রতি তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন। পঞ্চানন ভট্টাচার্য *মুক্তাবলী সংগ্রহ* নামক টীকাগ্রন্থে বিশ্বনাথের এই অভিমতেরই সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, "*অত্র যাদৃশশাব্দবোধস্তাৎপর্য্যজ্ঞানং বিনা নোৎপত্তুমর্হতি, তত্তচ্ছাব্দব্যক্তিং প্রতি তত্তৎতাৎপর্য্যজ্ঞানব্যক্তের্বিশিষ্য কারণত্বস্য বক্তব্যতয়া গৌরবমিত্যস্বরসাৎ–আহুরিত্যুক্তমিতি বোধ্যম্।*" – ভট্টাচার্য, পঞ্চানন, *মুক্তাবলী সংগ্রহ,* ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৭৬। ।

নৈয়ায়িকগণ আসত্তির স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন – পদার্থ সমূহের মধ্যে যে অন্বয়ের বোধ শাব্দবোধরূপে বিবেচিত সেই অন্বয়ের প্রতিযোগী ও অনুযোগী পদার্থের বোধক পদমূহের অব্যবধানই আসত্তি। এই আসত্তির জ্ঞান শাব্দবোধের কারণ।[৪০] তবে নব্য-নৈয়ায়িকগণের মতে পদগুলির অব্যবধানে উপস্থিতি মাত্রকেই আসত্তি বলা যায় না। কারণ, অব্যবধানে পদোচ্চারণ হলেও শক্তিজ্ঞানের বিলম্বের কারণে পদার্থের উপস্থিতিতে বিলম্ব হলে শাব্দবোধ হয় না। আবার অনেক স্থলে পদসমূহ অব্যবধানে উপস্থিত না হলেও উক্ত পদসমূহজন্য উপস্থিত পদার্থ সমূহের মধ্যে অন্বয়ের বোধ হয়ে থাকে। যেমন, 'নীলো ঘটো দ্রব্যং পটঃ' - এইরূপ বাক্য স্থলে 'নীল' পদ ও 'পট' পদ অব্যবধানে উপস্থিত না হলেও নীল পদার্থ ও পট পদার্থের মধ্যে অন্বয়ের বোধ হয়ে থাকে। সুতরাং, পদ সমূহের অব্যবধানে উপস্থিতিকে আসত্তি না বলে যে পদার্থের সঙ্গে যে পদার্থের অন্বয় অপেক্ষিত সেই পদার্থ সমূহের অব্যবধানকেই আসত্তি বলতে হবে। আর এই আসত্তির জ্ঞান হল শাব্দবোধের হেতু।[৪১]

নৈয়ায়িকগণ যোগ্যতাজ্ঞানের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, বাক্যস্থ পদের অর্থ যদি অবাধিত হয় অর্থাৎ, এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকলেই

---

[৪০] "*তত্রাসত্তিপদার্থমাহ–সন্নিধানন্ত্বিতি। অন্বয়-প্রতিযোগ্যনুযোগি-পদয়োরব্যবধানমাসত্তিঃ, তজ্-জ্ঞানং শাব্দবোধে কারণম্।*" - – বিশ্বনাথ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী*, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৬৪।

[৪১] "*বস্তুতস্তব্যবধানজ্ঞানস্যানপেক্ষিতত্বাদ্ যৎ পদার্থস্য যৎ পদার্থেনাঽন্বয়োঽপেক্ষিতস্তয়োরব্যবধানেনোপস্থিতিঃ শাব্দবোধে কারণম্।*" – বিশ্বনাথ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী*, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৬৫।

উক্ত পদার্থ সমূহের মধ্যে যোগ্যতা আছে বুঝতে হবে।[৪২] অর্থাৎ, যদি বাক্যস্থ পদ জন্য উপস্থিত এক পদার্থের সঙ্গে অপর পদার্থের সম্বন্ধ অসম্ভব হয় তাহলে তাদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব আছে বুঝতে হবে। যেমন, 'বহ্নিনা সিঞ্চতি' প্রভৃতি বাক্য স্থলে বহ্নি এবং সেচনরূপ ক্রিয়ার সম্বন্ধ অসম্ভব হওয়ায় অর্থাৎ, সেচনে বহ্নি-করণকত্বের সম্বন্ধরূপ যোগ্যতার অভাব থাকায় 'বহ্নির দ্বারা সেচন কর' - এইরূপ শাব্দবোধ হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ন্যায়মতে বাধাভাব হল যোগ্যতার লক্ষণ। অপরপক্ষে, নব্য ন্যায়মতানুসারে "তৎ পদার্থে তৎ পদার্থবত্ত্বা" হল যোগ্যতার লক্ষণ।

কিন্তু, আপত্তি হল – যোগ্যতার জ্ঞান অর্থাৎ, পদজন্য উপস্থিত পদার্থ সমূহের সম্বন্ধের জ্ঞান শাব্দবোধের পূর্বে সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিটি বাক্যার্থ (পদজন্য উপস্থিত পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ) অভিনব, ফলে পূর্ব হতে উক্ত সম্বন্ধের সম্ভাবনার নিশ্চয় বা যোগ্যতার জ্ঞান থাকতে পারে না। যেমন, পূর্বোক্ত বাক্যস্থলে 'বহ্নির দ্বারা সেচন কর' – এই বাক্যার্থটি অভিনব হওয়ায় বাক্যার্থবোধের পূর্বে সেচনে বহ্নি-করণকত্বের সম্বন্ধরূপ যোগ্যতার অস্তিত্ব বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। আবার, শাব্দবোধের উৎপত্তির পরে যোগ্যতাজ্ঞানের প্রয়োজনও থাকে না। ফলে, যোগ্যতার জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ বলা যায় না। এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, বাক্যস্থ পদজন্য পদার্থের স্মরণ হওয়ার পর স্থল বিশেষে যোগ্যতার সংশয়াত্মক জ্ঞান অথবা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হতে পারে। একটি

---

[৪২] "*পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা।*" – বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ-কারিকাবলী*, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভাট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা:৪৭০।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বাখ্যা করা যাক। 'বহ্নিনা সিঞ্চতি' – এই বাক্য স্থলে বাক্যান্তর্গত পদজন্য পদার্থের স্মৃতি হলেই বহ্নির দ্বারা সেচনরূপ ক্রিয়ার যোগ্যতার অভাবের নিশ্চয় আমাদের হয়ে যায়। অতএব, বাক্যার্থবোধের পূর্বে যোগ্যতাজ্ঞান সম্ভব নয় – এরূপ অভিমত সঙ্গত নয়। এক্ষেত্রে পদজ্ঞান করণ, পদার্থস্মরণ ব্যাপার। এখন যেহেতু নব্য-নৈয়ায়িকগণ অযোগ্যতার জ্ঞানের অভাবকে কারণ বলে স্বীকার করেন, তাই তাঁরা আর অতিরিক্তরূপে যোগ্যতাজ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণরূপে স্বীকার করেন না।[৪৩] তাঁদের মতে, বাক্যস্থ পদজন্য উপস্থিত পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধের সম্ভাবনার অভাব তথা অযোগ্যতার নিশ্চয় শাব্দবোধের প্রতিবন্ধক।[৪৪] প্রতিবন্ধকের অভাব কার্যমাত্রের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায়, অযোগ্যতানিশ্চয়াভাব ভিন্ন যোগ্যতার জ্ঞানকে শাব্দবোধের অতিরিক্ত কারণরূপে স্বীকার করা অনাবশ্যক। তাছাড়া, যোগ্যতাজ্ঞানের বিলম্বজন্য শাব্দবোধের বিলম্বও পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং, যোগ্যতাজ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণরূপে গণ্য করা যায় না।

আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে নৈয়ায়িকগণ বলেছেন যে, যদি কোনো একটি পদ ছাড়া অপর একটি পদ অন্বয় বোধের জনক না হয়, তাহলে বুঝতে হবে

---

[৪৩] "*নব্যাস্তু যোগ্যতায়া জ্ঞানং ন শাব্দজ্ঞানে কারণম।*" – বিশ্বনাথ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী,* ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৭১।

[৪৪] পদশ্রবণজন্য পদার্থের জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই পদার্থস্মৃতির কল্পনা করেছেন। শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলীর উপর বিশিষ্ট নব্য বৈশেষিক শঙ্কর মিশ্রের যে টীকা পাওয়া যায়, সেখানে এবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও বর্তমান গবেষণা গ্রন্থে আমরা সেবিষয়ে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করি নি।

উক্ত সেই পদদ্বয়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান।[৪৫] অর্থাৎ, তাঁদের মতে এই আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান শাব্দবোধের হেতু। যেমন, 'ঘট' পদের পরে 'অম্' পদ না থাকলে 'ঘটবৃত্তিকর্মতা' –এর বোধ হয় না। এই কারণে বলা হয় 'ঘট' পদের সঙ্গে 'অম্' পদের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। নৈয়ায়িকগণের মতে এই আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি কারণ।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, নৈয়ায়িকগণের মতে, শাব্দবোধ বা বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থের মধ্যে অন্বয় বোধের প্রতি পদজ্ঞান, পদার্থের স্মরণ সাক্ষাৎ কারণ। পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের স্মরণ আবার পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এবং তাৎপর্য – এই সকল বিষয়ের জ্ঞান হল শাব্দবোধের প্রতি সহকারী কারণ।

কিন্তু, প্রশ্ন হল – পদজ্ঞান এবং পদজন্য উপস্থিত পদার্থের মধ্যে সংসর্গের বোধ বা শাব্দবোধ কীভাবে সম্ভব? কারণ, নৈয়ায়িকগণের মতে বিভুর প্রত্যক্ষযোগ্য গুণগুলি স্বোত্তরবৃত্তি গুণের দ্বারা বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ, উক্ত গুণগুলি দ্বিক্ষণমাত্র স্থায়ী হয় এবং তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়।[৪৬] শব্দ ও জ্ঞান যথাক্রমে বিভু আকাশ ও আত্মার প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ হওয়ায় তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। ফলে, প্রাচীন-মতানুসারে জ্ঞায়মান শব্দকে শাব্দবোধের কারণরূপে গ্রহণ করলে বহু স্থলে উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়

---

[৪৫] "*যৎপদেন বিনা যস্যাঽননুভাবকতা ভবেৎ*"। - বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ-কারিকাবলী,* ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৭২।

[৪৬] "*যদ্যপি জ্ঞানানাং দ্বিক্ষণমাত্র-স্থায়িত্বম্, যোগ্য-বিভু-বশেষগুণানাং স্বোত্তরবৃত্তি-গুণনাশ্যত্বাৎ;...... ।*" – বিশ্বনাথ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী,* ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৭১।

না। যেমন, 'ঘটম্ আনয়' – এই বাক্য স্থলে জ্ঞায়মান শব্দরূপে 'ঘটম্' এবং 'আনয়' পদের বোধ হতে পারে না। কারণ, 'ঘটম্' পদটি ঘ্+অ+ট্+অ+ম্ – এই বর্ণসমূহের দ্বারা গঠিত এবং এই বর্ণসমূহের উৎপত্তি (উচ্চারণ) ও বোধ (প্রত্যক্ষ) একত্রে সম্ভব নয়। যে ক্ষণে 'ঘ্' বর্ণটি উৎপন্ন হয় সেই ক্ষণে অপর বর্ণগুলির অস্তিত্ব থাকে না। আবার যে ক্ষণে 'অ' বর্ণটি উৎপন্ন হয় সেই ক্ষণে 'ঘ্' বর্ণটি বিদ্যমান থাকলেও অপর বর্ণগুলির অস্তিত্ব থাকে না। 'ট্' বর্ণটির উৎপত্তি ক্ষণে পূর্বোক্ত 'অ' বর্ণটি বিদ্যমান থাকলেও অপর বর্ণগুলি অবিদ্যমান থাকে। 'ট্' বর্ণের পশ্চাৎ 'অ' বর্ণের উৎপত্তি ক্ষণে 'ট্' বর্ণটি বিদ্যমান থাকলেও অপর বর্ণগুলি অবিদ্যমান থাকে। 'ম্' বর্ণের উৎপত্তি ক্ষণে পূর্বোৎপন্ন 'অ' বর্ণটি ব্যতীত অপর বর্ণগুলি বিদ্যমান থাকে না। অর্থাৎ, 'ঘটম্' পদটি যে বর্ণ সমূহের দ্বারা গঠিত সেগুলির একত্রে উচ্চারণ কোন ভাবেই সম্ভব নয়। 'ঘটম্' পদের অন্তর্গত বর্ণ সমূহের উচ্চারণ বা উৎপত্তি যেমন ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে তেমনি উক্ত বর্ণগুলির জ্ঞানও ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হলো – জ্ঞান স্বোত্তরোৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়।[৪৭] ফলে প্রথম বর্ণের জ্ঞানটি পরবর্তী বর্ণের জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। সুতরাং, 'ঘটম্' পদের অন্তর্গত সকল বর্ণের জ্ঞান একত্রে উৎপন্ন বা অস্তিত্ববান হতে পারে না। ফলে, 'ঘটম্' পদের জ্ঞান সম্ভব হয় না। 'ঘটম্' পদ যে বর্ণ সমূহের দ্বারা গঠিত সেই বর্ণ সমূহের বোধক লিপি দর্শনের ফলে আকাশস্থ শব্দের জ্ঞান হয়ে থাকে।

---

[৪৭] "অনিত্যত্বগ্রহণাদ্বুদ্ধের্বুদ্ধ্যন্তরাদ্বিনাশঃ শব্দবৎ।।৩।২।২৪।। – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা: ১৭৮।

উক্ত বর্ণ সমূহের দর্শন এবং তজ্জন্য শব্দের বোধ ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে এবং পূর্ববর্তী বর্ণের জ্ঞান উত্তরবর্তী বর্ণের জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে 'ঘটম্' পদের অন্তর্গত বর্ণ সমূহের বোধ একত্রে উৎপন্ন এবং অস্তিত্বশীল না হওয়ায় উক্ত পদের বোধ এক্ষেত্রেও সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহের জ্ঞান কালে পূর্ব পদের জ্ঞান উত্তর পদের জ্ঞানজন্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং পদজন্য পদার্থের স্মরণকালেও উত্তর পদের অর্থ স্মরণের দ্বারা পূর্ব পদজন্য যে অর্থ স্মৃত হয় সেটি বিনষ্ট হওয়ায় বাক্যের এবং বাক্যার্থের জ্ঞান সম্ভব হয় না।

এই সমস্যার সমাধান কল্পে নৈয়ায়িকগণ বলেন, পদের অন্তর্গত প্রতিটি বর্ণের বোধ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হলেও অন্তিম বর্ণটি পূর্বজ্ঞাত এবং বিনষ্ট বর্ণ সমূহের সংস্কার উদ্বুদ্ধ করায় সমস্ত বর্ণ সমূহকে অবলম্বন করে সমূহালম্বনাত্মক স্মৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। ফলে, সম্পূর্ণ পদের বোধ হয়ে থাকে। যেমন, পূর্বোক্ত 'ঘটম্' পদস্থলে অন্তিম 'ম্' বর্ণটি পূর্ব-জ্ঞাত বর্ণ সমূহের সংস্কারের উদ্বোধক হওয়ায় সমস্ত বর্ণ সমূহের সমূহালম্বনাত্মক স্মৃতি উৎপন্ন হয়। ফলে, 'ঘটম্' পদের বোধ সম্ভব হয়।[৪৮] অনুরূপভাবে বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদের অর্থের বোধ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হলেও অন্তিম অর্থের বোধটি পূর্বজ্ঞাত এবং বিনষ্ট অর্থ সমূহের সংস্কার উদ্বুদ্ধ করায় সমস্ত অর্থ সমূহকে অবলম্বন করে সমূহালম্বনাত্মক স্মৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

---

[৪৮] বিশ্বনাথ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী,* ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা: ৪৬৬।

ফলে, বাক্যের অন্তর্গত সমস্ত পদের অর্থের বোধ সম্ভব হয় এবং পরিশেষে বাক্যার্থের বোধ হয়ে থাকে।

নৈয়ায়িক সম্মত শব্দ প্রমাণ আলোচনার শেষে এই কথা স্পষ্ট যে, অনুমিতির কারণসামগ্রী এবং শাব্দবোধের কারণসামগ্রী স্বতন্ত্র। যে প্রক্রিয়ায় অনুমিতি উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা ভিন্ন প্রক্রিয়ায় শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। শাব্দবোধের প্রক্রিয়া শুরু হয় পদ শ্রবণ জন্য। তদনন্তর পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের স্মরণ উৎপন্ন হয় অবশ্যই পদ-পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। এই বিষয়ে বৈশেষিকও কিন্তু সহমত। কিন্তু পদার্থ স্মরণান্তর পদার্থসংসর্গের অনুমিতি হয় – এই কথা বৈশেষিক স্বীকার করলেও নৈয়ায়িক কিন্তু পদার্থসংসর্গের অতিরিক্ত শাব্দবোধই হয় – একথা স্বীকার করেন। এখানেই উভয়ের মতপার্থক্য।

পঞ্চম অধ্যায়

পদপক্ষক অনুমান ও তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তি

আমরা পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে নৈয়ায়িকগণ বাক্য শ্রবণজন্য বাক্যার্থের বোধকে স্বতন্ত্র প্রমারূপে স্বীকার করলেও বৈশেষিকগণ তা করেন না। তাঁদের মতে বাক্যার্থের বোধটি অনুমেয়। বৈশেষিকগণ যখন বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করেন তখন তাঁরা বাক্যরূপ শব্দকে সেই বাক্যার্থ অনুমিতির পক্ষ অথবা হেতুরূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু একথা ঠিকই যে তা কোনও না কোনওভাবে অনুমিতির জনক জ্ঞান উৎপাদন করে। ফলে ব্যাপক অর্থে শব্দকে অনুমিতির জনক রূপে গণ্য করা যায়। অর্থাৎ তাঁদের মতে হেতু যে প্রক্রিয়ায় অনুমিতি উৎপন্ন করে শব্দরূপ বাক্যও সেই প্রক্রিয়ায় বাক্যার্থের জ্ঞান উৎপন্ন করে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যে অনুমানের সাহায্যে বৈশেষিকগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করেন সেই অনুমানের সম্পূর্ণ আকারটি কীরূপ? আমরা জানি, যে অনুমানের দ্বারা বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করা যায় সেই অনুমানের ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রচলিত।[১] বৈশেষিক আচার্যগণ তাঁদের সিদ্ধান্ত

---

[১] প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক প্রশস্তপাদাচার্য বা শ্রীধরাচার্য বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলেও যে অনুমানের দ্বারা তা সিদ্ধ করা যায় সেই অনুমানের আকারটি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেননি। তবে পরবর্তীকালের ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রদর্শন করতে অনুমানের ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রদর্শন করেছেন।

স্থাপনের জন্য উক্ত অনুমান প্রদর্শন করেছেন।[২] এমনকি নৈয়ায়িকগণও পূর্বপক্ষের অভিমত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৈশেষিক সম্মত উক্ত অনুমান উপস্থাপন পূর্বক খণ্ডন করেছেন।[৩] বর্তমান আলোচনায় আমি যে আকারের অনুমানটি সহজে বিষয় উপলব্ধির সহায়ক বলে মনে করি সেই আকারের অনুমান বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করবো অনুমিতির উৎপত্তিতে বৈশেষিকগণ শব্দের কীরূপ ভূমিকা স্বীকার করেন। বৈশেষিকগণের আলোচনা থেকে বোঝা যায় তাঁরা বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করতে পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক ভেদে দুই ধরণের অনুমান প্রদর্শন করেন। উক্ত অনুমানগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বৈশেষিকগণের অভিমত অনুধাবন করতে পারি।

বর্তমান অধ্যায়ে বৈশেষিক সম্মত পদপক্ষক অনুমানের স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে উক্ত অনুমানের দ্বারা বৈশেষিক প্রদত্ত বাক্যার্থের অনুমিতির স্বরূপ কি প্রকার এবং এই অনুমানের মাধ্যমে বৈশেষিকের কোন্ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর তার গ্রহণযোগ্যতা কতোখানি তা আলোচনা করে দেখতে হবে। পদপক্ষক

---

[২] (ক) "এতে পদার্থা মিথঃ সংসর্গবন্তো বাক্যত্বাদিতি...।"

"এতানি পদানি স্মারিতার্থসংসর্গবন্তি তত্স্মারকত্বাদিতি...।" - উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী*, নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃষ্ঠা: ৫৭২।

(খ)প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উদয়নাচার্য তাঁর ন্যায়কুসুমাঞ্জলী নামক গ্রন্থেও অনুরূপ অনুমান প্রদর্শন করেছেন। যথা -

"*এতানি পদানি স্মারিতার্থসংসর্গবন্তি তৎ স্মারকত্বাদিতি...।*" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৫।

[৩] "গৌঃ পদমস্তিত্ববদ্‌গোগোচরজ্ঞানপূর্বকম্ অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষগৌঃ পদত্বাৎ, যন্নৈবম্ তন্নৈবম্ যথাঽঽকাশম্...।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৯।

অনুমানের পর পরবর্তী অধ্যায়ে পদার্থপক্ষক অনুমানের পর্যালোচনা করা হবে একই উদ্দেশ্যে। 'বাক্যার্থবোধ যে অনুমিতি' – এই পক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কি কি আপত্তি হতে পারে, তা ভেবে দেখার বিষয়। এই বৈশেষিকমতের বিপক্ষে উপস্থাপিত আপত্তির উত্তর কি বৈশেষিক পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব? – তাও যথাক্রমে আলোচিত হবে।

(ক)

পদপক্ষক অনুমান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা যে অনুমানটির উল্লেখ করবো সেটি হল – "এতানি পদানি স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকাণি আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্বাৎ গামভ্যাজেতি পদকদম্ববদিতি"।[৪] অর্থাৎ, এই পদগুলি স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বক প্রযুক্ত, যেহেতু এই পদগুলি আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট হয়ে ঐসকল অর্থের স্মারক। যেমন, গামভ্যাজ এই পদসমূহ। এই অনুমানে প্রযুক্ত (সামান্য) ব্যাপ্তির আকারটি হল – "যত্র যত্র আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্ব তত্র তত্র স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব"। এই অনুমানটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই অনুমানে পক্ষ হল এই পদসমূহ, সাধ্য হল স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব, হেতু হল আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্ব। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হলো গামভ্যাজ এই পদসমূহ। এই অনুমানে শব্দ হেতুরূপে গৃহীত হয়নি; আকাঙ্ক্ষাদি হেতুরূপে গৃহীত হয়েছে। আকাঙ্ক্ষাদি

[৪] উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী*, নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কোলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃষ্ঠা: ৫৭৩।

শব্দের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম।[৫] আমরা পূর্বেই দেখেছি হেতু স্বভাবতঃই সাধ্যের সাধক নয়। হেতুর সঙ্গে সাধ্যের যদি অবিনাভাব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধ থাকে এবং উক্ত সম্বন্ধের জ্ঞান যদি আমাদের থাকে তাহলে আমরা পক্ষে হেতুর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সাধ্যের অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান লাভ করে থাকি। তাই আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্বরূপে হেতুর সঙ্গে স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্বরূপ সাধ্যের অবিনাভাব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। যে সম্বন্ধের জ্ঞান থাকলে আমরা পক্ষে হেতুর জ্ঞানের ভিত্তিতে সাধ্যের জ্ঞান লাভ করতে পারবো। এই অনুমানটির আশয় হচ্ছে বাক্যার্থ অর্থাৎ পদার্থসংসর্গবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানপূর্বকই বক্তা এইরূপ পদার্থসংসর্গের উপস্থাপক বাক্য প্রয়োগ করেছেন। যাঁর এই ব্যাপারে জ্ঞান নেই তিনি কোনোভাবেই উক্তরূপ বাক্য প্রয়োগে সমর্থ হতে পারেন না। সুতরাং পদার্থসংসর্গের উপস্থাপক পদসমূহরূপ বাক্যের উপস্থাপনা থেকে বক্তার অনুরূপ পদার্থসংসর্গবোধ অনুমিত হওয়া সম্ভব।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে উক্ত অনুমানের সাধ্য হল স্মারিতার্থ সংসর্গ জ্ঞান পূর্বকত্ব। আমরা দেখলাম উক্ত জ্ঞান বক্তারই; যিনি এই জ্ঞানের উপস্থাপনার্থে আলোচ্য বাক্যের উপস্থাপনা করেছেন। কিন্তু বৈশেষিকের অভিপ্রায় তো হচ্ছে বাক্যার্থের অনুমিতিত্ব স্থাপন করা। এখন উক্ত পদপক্ষক অনুমানে হেতুর দ্বারা বক্তার

---

[৫] আকাঙ্ক্ষাদি পদের বৈশিষ্ট্য না পদার্থের বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সাধারণত মনে করা হয় আকাঙ্ক্ষাদি পদেরই ধর্ম।

স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব সিদ্ধ হলেও বাক্যার্থের বোধ অর্থাৎ পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সিদ্ধি হয় কীরূপে? এই অনুমানের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, বক্তা যে বাক্য প্রয়োগ করেছেন সেই বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ শ্রবণ করলে যে অর্থের স্মরণ হয় সেই অর্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞানপূর্বক বক্তা উক্ত পদসমূহ প্রয়োগ করেছেন। উক্ত অনুমান স্থলে সরাসরি বক্তার পদার্থ সংসর্গ জ্ঞানের অনুমান হয় শ্রোতার। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় উক্ত অনুমানে পদার্থ সমূহের সংসর্গ অনুমিত হচ্ছে কিভাবে? এই কারণে পদপক্ষক অনুমানের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তৃতভাবে করা প্রয়োজন।[৬]

আপত্তি হতে পারে, উক্ত অনুমানের সাধ্যরূপে 'স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব' সিদ্ধ হলেও পদার্থ সমূহের সংসর্গবোধরূপ বাক্যার্থের বোধ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ, উক্ত অনুমানের দ্বারা পদার্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞান হয় না বরং, পদার্থসমূহের সংসর্গজ্ঞানের জ্ঞান হয়। সুতরাং উক্ত অনুমানের দ্বারা বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব স্থাপন সম্ভব নয়। বৈশেষিক পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর কি হতে পারে তা আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে উল্লেখ করতে পারি। যেমন, ঘটজ্ঞানের জ্ঞান (অনুব্যবসায়) কালে উক্ত অনুব্যবসায়ের বিষয়রূপে ঘটজ্ঞান এবং ঘটজ্ঞানের আশ্রয় আত্মার যেমন বোধ হয়

[৬] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের রচনাতেও এইরূপ পদপক্ষক অনুমানের আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। যেমন – "When Rabbit tells Pooh that there's honey, Pooh's inference is indirect: It goes via Rabbit's belief. Pooh only believes what Rabbit says because he believes that Rabbit believes it too. In other words, he adopts Rabbit's belief. And that's what makes this a communication: the way the teller's belief is passed on – communicated – to the tellee. That's the difference that matters between Pooh believing Rabbit and Pooh believing his bees." – Mellor, D. H., 2012, *Mind, Meaning and Reality* Essays in Philosophy, United Kingdom: Oxford University Press, Page No. 54.

তেমনি ঘটজ্ঞানের বিষয় যে ঘট সেটিও বিষয় হয়ে থাকে। তেমনি 'গামানয়' – এই বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতা যদি এইরূপ অনুমান করেন যে, এই পদসমূহ স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বক, যেহেতু এই পদগুলি আকাঙ্ক্ষাদিযুক্ত এবং ঐ ঐ অর্থের স্মারক, যেমন 'গামভ্যাজ' এই বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহ; তা হলে উক্ত অনুমানের যেটি সাধ্য তথা অনুমেয়, সেই অনুমিতির বিষয়রূপে উক্ত 'পদার্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞান' যেমন বিষয় হবে তেমনি সেই জ্ঞানের বিষয়রূপে 'পদার্থসমূহের সংসর্গ'ও বিষয় হবে। অর্থাৎ, জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান স্ববিষয়ীভূত জ্ঞানের বিষয়কেও বিষয় করে। তবে, কীরূপে বিষয় করে সেই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলা যায়, বস্তুতঃপক্ষে উক্ত অনুমানে বক্তা কর্তৃক উচ্চারিত পদ সমূহ পক্ষরূপে ব্যবহৃত হয়। সাধ্য হলো সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব। এবং এক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদস্মারিতত্ব হেতুরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ পদার্থসংসর্গ জ্ঞান বক্তার পদার্থসংসর্গ জ্ঞানপূর্বকত্বের অংশবিশেষ। বৈশেষিক মতে শ্রোতার সেই বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান জন্মাতেই পারে না কেবলমাত্র বক্তার পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের জ্ঞানের মাধ্যমে ছাড়া। নৈয়ায়িক কিন্তু এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন পদার্থসংসর্গের জ্ঞান স্বতন্ত্র উপায়ে লাভ করা সম্ভব। মূলতঃ এই বিষয়েই বৈশেষিকের সঙ্গে ন্যায়মতের পার্থক্য। পদার্থসংসর্গ অনুমিত হলে যে উদ্দেশ্য সাধন করে বক্তার পদার্থসংসর্গের অনুমিতির অংশ হিসাবেও তা একই উদ্দেশ্য সাধন করে। তাই, বাক্যার্থের জ্ঞান অর্থাৎ সংসর্গের

জ্ঞান উক্ত পদপক্ষক অনুমানের দ্বারা হয় না – এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়।[৭] উপস্কারকার শঙ্করমিশ্রও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে পদপক্ষক অনুমানের সাধ্যরূপে যা স্বীকার করা হয়েছে সেই সাধ্যের বিষয়রূপেই পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের জ্ঞান হয়ে যায়।[৮]

বৈশেষিক সম্মত পদপক্ষক অনুমানের আরেকটি আকার হতে পারে – "গৌঃ পদমস্তিত্ববদ্গোগোচরজ্ঞানপূর্বকম্ অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষগৌঃ পদত্বাৎ, যন্নৈবম্ তন্নৈবম্ যথাঽঽকাশম্...।"[৯] বিশিষ্ট নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর *শব্দশক্তি প্রকাশিকা* নামক গ্রন্থে এইভাবে পদপক্ষক অনুমানের উপস্থাপনা করেছেন, যেখানে বিশেষ ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। পদপক্ষক অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এই আকারটি অভিনবত্বের দাবী রাখে, তাই এখানে জগদীশ প্রদত্ত আকারটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো। এই অনুমানে বৈশেষিকগণ "গো" পদটিকে পক্ষরূপে গ্রহণ করে অস্তি পদ সাকাঙ্ক্ষ গো পদত্বরূপ হেতুর দ্বারা অস্তিত্ববিশিষ্ট – গোবিষয়ক – জ্ঞানপূর্বকত্বরূপ সাধ্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তমূলে গৃহীত ব্যাপ্তির আকারটি হলো: – "যত্র যত্র অস্তিত্ববদ্গোগোচরজ্ঞানপূর্বকত্বাভাব তত্র তত্র অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষ গৌঃ

---

[৭] "তস্য চ সংসৃজ্যমানোপহিতস্যৈবাবচ্ছেদকত্বান্ন বিশেষাপ্রতিলম্ভ ইতি।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৭।

[৮] "...... জ্ঞানবচ্ছেদকতয়াঽভিমতবিশেষসিদ্ধিঃ।" – শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*, নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৫০১।

[৯] জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য, কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৯।

পদত্বাভাব”, যেমন– আকাশ। অর্থাৎ বৈশেষিকগণের অভিপ্রায় হল, “গৌরস্তি” –এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হলে শ্রোতা উক্ত বাক্য শ্রবণ করে অনুমান করতে সক্ষম হবেন যে বক্তা “গো” পদটি অস্তিত্ববিশিষ্ট – গোবিষয়ক – জ্ঞানপূর্বক প্রয়োগ করেছেন কারণ, “গো” পদটি অস্তি পদের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট। অতএব, বৈশেষিক মতে “গৌরস্তি” – এই বাক্য শ্রবণজন্য শ্রোতার যে বাক্যার্থের বোধ হয় সেটি হলো অনুমিতি এবং বাক্যরূপ শব্দ হলো উক্ত অনুমিতির সাধক হেতু। পদপক্ষক অনুমানের এই আকার বিষয়ে বিশদ আলোচনা যথাস্থানে করা হবে।

(খ)

এই অংশে আমরা বৈশেষিকের উক্ত মতের পক্ষে বর্তমান পূর্বস্বীকৃতি কিছু আছে কি না, যদি তা থেকে থাকে তবে তা কীরূপ তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো। যদি কোনও পূর্বস্বীকৃতির উপরে তা নির্ভর করে তবে বৈশেষিকগণের উক্ত অভিমতের যাথার্থ্য নির্ভর করবে যে পূর্বস্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে তাঁরা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেই পূর্বস্বীকৃতির যাথার্থের উপর। এখন দেখা যাক উক্ত সিদ্ধান্তটি প্রকৃতই কোনও পূর্বস্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা। বৈশেষিকগণের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্বস্বীকৃতি হল – জ্ঞানের জ্ঞান পূর্ব জ্ঞানের বিষয়কেও বিষয় করে। অর্থাৎ, জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার অর্থ পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয়েরও জ্ঞান হওয়া। বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ঘটজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিষয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘটও বিষয় হয়। ফলে ঘটজ্ঞানের জ্ঞান হলে ঘটেরও জ্ঞান হয়ে

যায়। এই পূর্বস্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে বৈশেষিকগণ বলেন বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান অনুমিত হলেই বাক্যার্থেরও অনুমিতি হয়ে যায়। বাক্যার্থ উভয় জ্ঞানেই বিষয় হয়েছে। সেই কারণে বাক্যার্থ জ্ঞানের জ্ঞান বাক্যার্থ জ্ঞানও বটে।

কিন্তু নৈয়ায়িক পক্ষ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, ঘট বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান এবং ঘট বিষয়ক জ্ঞান – এই দুটি জ্ঞান অভিন্ন কীভাবে হবে? যেমন ঘটজ্ঞান ও ঘটজ্ঞানের জ্ঞান কখনোই এক হতে পারে না তেমনই বাক্যার্থজ্ঞান ও বাক্যার্থজ্ঞানের জ্ঞান – এই দুটিও এক হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রথম জ্ঞানের বিষয় হলো বাক্যার্থ, আর দ্বিতীয় জ্ঞানটি হলো বাক্যার্থ জ্ঞানের জ্ঞান। বিষয়ের জ্ঞান সেই জ্ঞানের জ্ঞান কখনোই এক হতে পারে না কারণ, প্রথম জ্ঞানটি দ্বিতীয় জ্ঞানের এক অর্থে প্রকার হয়েছে। কেউ ঘটকে জানলো। অতঃপর তার 'আমি ঘটকে জানি' – এই আকারের ঘটজ্ঞানের জ্ঞান হল। 'ঘট' – এই আকারের জ্ঞানের প্রকার অংশে ভাসমান হল ঘটত্ব। কিন্তু ঘট জ্ঞানের জ্ঞান অংশে ঘটত্ব প্রকার হয়নি। বরঞ্চ ঘটত্ব প্রকারতাবচ্ছেদক অংশে ভাসমান। সুতরাং দুটি জ্ঞান অভিন্ন হওয়ার অবকাশ কোথায়?

পরিষ্কার করে বলতে গেলে আলোচ্য স্থলে বস্তুতঃপক্ষে এই জ্ঞানদুটিকে এক বলা সম্ভব নয়। পদার্থসংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞান এবং পদার্থ সংসর্গের জ্ঞান কখনও এক হতে পারে না। কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, বক্তার পদার্থ সংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞান পদার্থ সংসর্গের জ্ঞান ছাড়া অনুমিত হতে পারে না। কিন্তু পদার্থসংসর্গের জ্ঞান পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের জ্ঞানের অবচ্ছেদকরূপে থাকায় তা পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে

না অথবা ভিন্ন ভাষায় সেই জ্ঞানকে পদার্থসংসর্গের জ্ঞান বলা যায় না। পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের প্রকারাংশে যা ভাসমান – পদার্থসংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞানে তাই প্রকাররূপে ভাসমান না হওয়ায় জ্ঞানদ্বয়কে ভিন্ন বলেই মানতে হবে।[১০]

যদি বলা হয় বাক্যার্থটি অনুমিতই হবে বা, আরও পরিষ্কারভাবে বলা হয় বাক্য শ্রবণজন্য সরাসরি বক্তার বাক্যার্থবোধের অনুমান করা হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে বাক্যার্থটিও অনুমিত হচ্ছে তাও সম্ভব নয়। আমরা ব্যাপকের অনুমান করি যার সঙ্গে ব্যাপকের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে সেই ব্যাপ্যের জ্ঞানের ভিত্তিতে। এখন ব্যাপক যে তাতে ব্যাপকতা ধর্ম আছে। ব্যাপকতা আবার নির্দিষ্ট ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, যাকে বলে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম। তাহলে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম বিশিষ্ট ব্যাপক হলো অনুমিতির বিধেয় বা, সাধ্য। আমাদের আলোচ্য এই অনুমানস্থলে অনুমেয় হলো বক্তার বাক্যার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব। বাক্যার্থসংসর্গ হচ্ছে সেই বক্তার জ্ঞানের বিষয়। বক্তার যে জ্ঞানের অনুমান করা হচ্ছে তার নিরূপক বা অবচ্ছেদক হলো পদার্থসংসর্গ। কিন্তু প্রশ্ন হলো ব্যাপক অনুমেয় হলেও তন্নিষ্ঠ যে ব্যাপকতাবচ্ছেদক তা কি অনুমেয় হয়? ব্যাপকতাধর্মাবচ্ছিন্ন ব্যাপকের অনুমান হয় একথা ঠিক, কিন্তু যদি বলা হয়, বক্তার বাক্যার্থবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানের ভিত্তিতে বাক্যার্থের অনুমান হয় তাহলে বলতে হবে, বাক্যার্থরূপ যে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম তারও অনুমান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

[১০] "ন চৈবমর্থাসিদ্ধিঃ, জ্ঞানবচ্ছেদকতয়ৈব তৎসিদ্ধিঃ।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৭।

ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মের অনুমান হয় না, ব্যাপকের অনুমান হয়ে থাকে। বৈশেষিকমত অনুসরণ করলে বলতে হয়, জ্ঞানের জ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু আমরা দেখি যে, বস্তুতঃ পার্থক্য আছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে জ্ঞানদুটির প্রকার ভিন্ন। উপরন্তু জ্ঞানটি না থাকলে জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ 'ঘট' – এই আকারের জ্ঞানটি থাকলে তবেই ঘটজ্ঞানের জ্ঞানের অবকাশ আছে। জ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি পূর্ববর্তী জ্ঞানটি এক অর্থে কারণ। কারণ না থাকলে কার্য উৎপত্তির প্রসঙ্গ নেই।

যদি জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞানকে অভিন্ন বলা হয় তবে প্রথম জ্ঞানটি যদি মিথ্যা হয় তবে সেই জ্ঞানের জ্ঞানটিও মিথ্যা হবে। অর্থাৎ দুটি জ্ঞানকেই সমানভাবে মিথ্যা বলতে হবে। বৈশেষিকগণ উক্ত আপত্তিটিকে তাঁদের পক্ষে ইষ্টাপত্তি বলতে পারবেন না। কেননা, এই আপত্তিটিকে যথার্থ বলে স্বীকার করে নিলে আবার অন্যত্র সমস্যা দেখা দেবে। যেমন বৈশেষিক দর্শনের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় মতের সঙ্গে তার বিরোধ উপস্থিত হবে। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের আমাদের ভ্রমজ্ঞান বিষয়ে যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানটিকেও ভ্রম বলতে হবে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলেই কেবলমাত্র স্বীকার করা হয়নি, তাঁকে অভ্রান্ত বলেও স্বীকার করা হয়েছে। ঈশ্বরের জ্ঞানকে ভ্রান্ত বলে যদি স্বীকার করা হয় তবে তা হয়ে যাবে বৈশেষিকসম্মত ঈশ্বর বিষয়ক ধারণার বিরোধী।[১১] অর্থাৎ ঈশ্বর

---

[১১] "অথৈবং ভ্রান্তিজ্ঞানমপি ভ্রমঃ স্যাৎ। ন চেষ্টাপত্তিঃ, ঈশ্বরস্যাপি ভ্রান্তত্বাপত্তেঃ।" – উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ডং*, শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ২।

আমাদের ভ্রম জ্ঞান বিষয়েও জ্ঞানবান হওয়ায় তাঁর জ্ঞানটাও ভ্রম বলে স্বীকার করলে তা 'ঈশ্বর অভ্রান্ত' –এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়ে যাবে।

"ঈশ্বর আমাদের ভ্রম জ্ঞানকেও জানেন কারণ তিনি সর্বজ্ঞ তবে তাঁর জ্ঞানও ভ্রম হোক্" – এই আপত্তি পরিহারের জন্য বৈশেষিক পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে, ঈশ্বরের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরূপ আপত্তি প্রযোজ্যই নয়। ঈশ্বর ও জীবের প্রত্যক্ষ এতোটাই আলাদা যে এই দুটি কখনোই তুলনীয় হতে পারে না। এখানে তো জন্য (বা, উৎপন্ন) জ্ঞানের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। জন্য জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়, আর ঈশ্বরের জ্ঞান হলো নিত্য সাক্ষাৎকারাত্মক, অতএব সেটি জন্য না হওয়ায় এই দুই প্রকার জ্ঞান কখনোই তুলনীয় হতে পারে না। তাই ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা অসঙ্গত। আমাদের জ্ঞান ভ্রম, ঈশ্বর সেই জ্ঞানের জ্ঞাতা হলেও আসল বিষয়টি যে কী তাও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জানেন। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁর ভ্রমের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই 'ভ্রম জ্ঞানের জ্ঞানও ভ্রম' এরকম আপত্তি ঈশ্বরের জ্ঞানের ক্ষেত্রে করা যায় না। কারণ, আমাদের যে ভ্রমজ্ঞান আছে, সেই ভ্রম জ্ঞানকে ঈশ্বর জানলেও ঈশ্বর প্রকৃত বিষয়ের স্বরূপটিকেও স্বতন্ত্রভাবে জানেন। তাই তিনি উক্ত ভ্রমে কখনোই পতিত হতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বরের ভ্রমবিষয়ক জ্ঞান থাকায় ঈশ্বরের জ্ঞানটিও ভ্রম এমন আপত্তি কখনোই গ্রাহ্য নয়।

বৈশেষিক পক্ষ থেকে আরও বলা যেতে পারে যে, এইরূপ আপত্তি নৈয়ায়িকগণের পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য। নৈয়ায়িকগণও তো জ্ঞানের জ্ঞান স্বীকার

করেন। জ্ঞানের জ্ঞানকে বলা হয় অনুব্যবসায়। অনুব্যবসায়ে যেমন পূর্ব জ্ঞান বিষয় হয় তেমনি পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয়ও বিষয় হয়। সুতরাং নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত অনুব্যবসায়ের বিরুদ্ধেও তো এই একই আপত্তি প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোনও জ্ঞান যদি ভ্রম হয় তবে সেই জ্ঞানের অনুব্যবসায়ও ভ্রম হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল এই যে অনুব্যবসায় কিন্তু কেবলমাত্র নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত নয় তা বৈশেষিকগণ কর্তৃকও স্বীকৃত। উভয়েই স্বীকার করেন যে পূর্ববর্তী জ্ঞানের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নিশ্চায়ক হলো অনুব্যবসায়। সেক্ষেত্রে বাক্যার্থবোধের স্বরূপ নির্ণায়ক হিসেবে উভয়েই অনুব্যবসায়কে উপস্থাপিত করবেন। অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ বাক্যার্থজ্ঞানের পর “অহং শাব্দয়ামি” বা “আমার শাব্দবোধ হয়েছে” এবং বৈশেষিকগণ “অহং অনুমিনোমি” বা, “আমার অনুমান হয়েছে” – এই আকারের অনুব্যবসায়কে পূর্ববর্তী জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণায়ক হিসেবে উপস্থাপিত করেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যাবে কোনও জ্ঞান অনুমিতি হলে তা শাব্দ নয়। আবার, শাব্দ হলে তা অনুমিতি নয়। সেক্ষেত্রে জন্য জ্ঞানটিকে অনুব্যবসায়ের দ্বারা শাব্দ এবং অনুমিতি – এই দুইভাবে কীরূপে নির্ণয় করা সম্ভব? আমরা এই বিষয়ের আলোচনায় আবার ফিরে আসবো যথাস্থানে।

বৈশেষিক কর্তৃক উত্থাপিত এই আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িক স্বমত রক্ষার্থে যুক্তি প্রয়োগ করে বলতে পারেন যে, অনুব্যবসায়ের স্থল আর বাক্যার্থবোধের স্থল ভিন্ন। বৈশেষিকসম্মত বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান এবং অনুব্যবসায়ের মধ্যে মূল ভেদ বর্তমান। অনুব্যবসায়রূপ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের ক্ষেত্রে, প্রথম ব্যবসায় জ্ঞানের যে বিষয়

তার সাথে মন রূপ ইন্দ্রিয়ের (অন্তরিন্দ্রিয়ের) একটি অলৌকিক সন্নিকর্ষ আছে। কিন্তু বৈশেষিকগণ যে বাক্যার্থজ্ঞানের কথা বলছেন সেক্ষেত্রে, অনুমানের সাহায্যে জানতে পারা যাচ্ছে বক্তার জ্ঞানকে এবং বক্তার সেই জ্ঞানের মাধ্যমেই বাক্যার্থকে জানতে পারা যায় বলে বৈশেষিকগণ বিশ্বাস করেন। বৈশেষিক মতে বাক্যার্থজ্ঞানে উপনীত হওয়ার জন্য আমাদের কাছে সরাসরি কোনো অন্য পন্থা বিদ্যমান নেই; বৈশেষিক মতে একমাত্র বক্তার জ্ঞানকে মাধ্যম করেই আমরা বাক্যার্থের জ্ঞান লাভ করতে পারি। সুতরাং এই দুটি ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, তাই একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা করার অবকাশ নেই। ফলতঃ বৈশেষিকগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিটি নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত অনুব্যবসায়ের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা সম্ভব নয়।

উপরন্তু নৈয়ায়িক পক্ষ থেকে বলা যায়, উক্ত আপত্তি অনুব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ারই বা অবকাশ কোথায়? কারণ, একটি জ্ঞান তখনই মিথ্যা হয় যখন উক্ত জ্ঞানের প্রকারাংশে যা ভাসমান হয়েছে তা প্রকৃতই উক্ত জ্ঞানের বিশেষ্যে না থাকে। অর্থাৎ যদি প্রকারটি ব্যধিকরণ হয়, তবেই জ্ঞানটি ভ্রম হয়। “অয়ং ঘটঃ” বা, “এটি ঘট” –এইরূপ জ্ঞানের অনন্তর “ঘটমহং জানামি” বা, “আমি ঘটকে জানি” – এই আকারের অনুব্যবসায় হয়। এই অনুব্যবসায়ে আত্মাতে জ্ঞান, জ্ঞানে ঘট, এবং ঘটে ঘটত্ব প্রকাররূপে ভাসমান হয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী জ্ঞানটি কি প্রকারের জ্ঞান তাও অনুব্যবসায়ে জ্ঞাত হয়। পূর্ববর্তী জ্ঞানটির প্রকার অংশে কোন্ ধর্ম ভাসমান হয়েছে তা জ্ঞাত হয়

অনুব্যবসায়ের সাহায্যে। অনুব্যবসায়টির প্রকার ব্যধিকরণ না হওয়ায় তার ভ্রম হওয়ার অবকাশ কোথায়?

বৈশেষিক মতের বিরুদ্ধে পুনরায় একটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, একটি ভ্রম জ্ঞান যার আছে আর ভ্রম জ্ঞানের জ্ঞান যার আছে উভয় জ্ঞানের কর্তা একই ব্যবহার করুক। ভ্রম জ্ঞানের জ্ঞান ভ্রম – এই আপত্তি যদি অস্বীকৃতও হয় তথাপি বৈশেষিকগণের বিরুদ্ধে উক্ত আপত্তি উত্থাপনপূর্বক বলাই যায় যে, ভ্রমজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের জ্ঞান যে ভিন্ন তা বোঝার অন্যতম উপায় হচ্ছে উভয় জ্ঞানজন্য ব্যবহারের ভিন্নতা। বৈশেষিকমত স্বীকার করে নিলে বলতে হয়, ঐ জ্ঞানদুটি জন্য যে ব্যবহার উৎপন্ন হয় তা অভিন্ন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় আদৌ তা হয় না। অর্থাৎ, যদি ভ্রমজ্ঞানের জ্ঞানটিকেও ভ্রম বলেই ধরে নেওয়া হয় তাহলে প্রশ্ন হবে, যার ভ্রমজ্ঞান আছে এবং যার ভ্রমজ্ঞানের জ্ঞান আছে তাদের দুজনের ব্যবহারও কি এক হবে? এর উত্তর একটাই, না তাদের দুজনের ব্যবহার কখনোই অভিন্ন হবে না। যেমন: উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একজন ব্যক্তির সমুদ্র উপকূলে ভ্রমণের সময় সম্মুখস্থ একটি শুক্তিতে রজতের ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হলো। আরও ধরা যাক, অপর একজন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত রয়েছেন যিনি উক্ত ভ্রম জ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানবান, অর্থাৎ শুক্তিতে রজত ভ্রম রূপ জ্ঞানের জ্ঞান তাঁর আছে, আরও স্পষ্টভাবে বললে, সম্মুখস্থ শুক্তিটি বিষয়ে 'এটি রজত' – এইরূপ জ্ঞান যার হয়েছে সে ভ্রান্ত, তা তিনি জানেন। তাহলে দেখা যাবে উক্ত দুই ব্যক্তির উক্ত দুই জ্ঞান জন্য প্রবৃত্তি কিন্তু অভিন্ন হবে না। প্রথম (রজতার্থী) ব্যক্তি সম্মুখস্থ

শুক্তিটিকে দেখে 'এটি রজত' – এইরূপ ভ্রম জ্ঞানের বশবর্তী হয়ে রজত গ্রহণে প্রবৃত্ত হবেন।[১২] কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটির কখনোই ঐরূপ প্রবৃত্তি হবে না। সুতরাং বলা যায়, যাঁর ভ্রমজ্ঞান আছে এবং যাঁর ভ্রমজ্ঞানের জ্ঞান আছে তাঁদের দুজনের ব্যবহার কখনও এক হতে পারে না।

যদি বৈশেষিক পক্ষ অবলম্বন করে কেউ বলেন, যেখানে জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা হচ্ছে, সেখানে ব্যবহারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করাটাই দোষের; তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, না এক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রসঙ্গ উত্থাপন আদৌ দূষণীয় নয়। কারণ, জ্ঞানটিকে শুধুমাত্র জ্ঞানেই আমরা সীমাবদ্ধ রাখি না, আমাদের জ্ঞানজন্য ব্যবহারও হয়ে থাকে। একটি তথ্য কারোর কাছে জ্ঞাত হলো, সেই তথ্য জ্ঞাত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়; বরং উক্ত তথ্যটির ভিত্তিতে শ্রোতা কর্মসম্পাদন করে থাকেন। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এই পক্ষই সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো একজন ব্যক্তি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার পর যদি তাঁর বাড়ি থেকে অপর একজন ব্যক্তি তাঁকে ডেকে বললেন যে, "তুমি তোমার ছাতাটি নিতে ভুলে গেছো", এখন ঐ ব্যক্তিটি কি ঐ নির্দিষ্ট তথ্যটি পাওয়ার পরেও চলে যান? না কি ফিরে এসে ছাতাটি নিয়ে আবার বেড়িয়ে যান? তাহলে তাঁর কর্মপ্রবৃত্তি অবশ্যই তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞানের দ্বারাই নির্ধারিত হয় বলে বুঝতে হবে। এই ব্যবহারের জনক জ্ঞান উক্ত প্রযুক্ত বাক্য থেকে উৎপন্ন। সুতরাং জ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার তথা

[১২] " ইদং রজতমিতি ভ্রমাদিব শুক্তৌ রজতজ্ঞানবানয়মিতি ভ্রমস্য জ্ঞানাৎ ভ্রান্তিজ্ঞাপ্রবৃত্ত্যাপত্তেশ্চ।" – উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ডং*, শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ২ – ৩।

প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা কখনোই অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না। নিছক কিছু তথ্য জানাতেই আমরা থেমে থাকি না, বরং জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই; তাই ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা উত্থাপিত হওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। আর তাছাড়া ব্যবহার তথা প্রবৃত্তির সাফল্য দেখে প্রবৃত্তির উৎপাদক জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ণয় করা হয়। সুতরাং ব্যবহারকে বাদ দিয়ে জ্ঞানের আলোচনা সম্ভব নয়। বাস্তবতঃ আমরা দেখতে পাই যিনি ভ্রান্ত, আর যিনি জ্ঞানটিকে ভ্রম বলে জানেন – এই বিষয়ে জ্ঞানবান দুজনের ব্যবহার তথা প্রবৃত্তির মধ্যেও পার্থক্য আছে। বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে ইতিপূর্বেই রজতার্থী দুইজন ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। উদাহরণটি আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে যাঁর শুক্তিতে রজত বিষয়ক ভ্রম জ্ঞান আছে, আর 'শুক্তিতে রজতের জ্ঞান' – এটি যে একটি ভ্রম জ্ঞান – এই বিষয়ক জ্ঞান যাঁর আছে, তাঁদের দুজনের ক্ষেত্রে উক্ত জ্ঞান জন্য প্রবৃত্তি বা ব্যবহারটি আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ভ্রম জ্ঞান ও ভ্রম জ্ঞানের জ্ঞান জন্য যে ব্যবহার তা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ফলতঃ জ্ঞানদুটিকে অভিন্ন বলে গ্রহণ করা চলে না।

সাধারণতঃ দার্শনিকগণ মনে করে থাকেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রসঙ্গ আবশ্যিকভাবেই আসবে। বস্তুতঃ বাক্যশ্রবণ করে অর্থবোধ হয় ও তজ্জন্য প্রবৃত্তিও হয়। বৈশেষিক মত স্বীকার করলে শ্রোতার বক্তার বাক্যার্থ জ্ঞানের অনুমিতি থেকে প্রবৃত্তি হয় তা বলতে হবে। কিন্তু বস্তুতঃ এই পক্ষে একইসাথে গৌরব দোষ ও ব্যভিচার দোষ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কার্যকারণের সামানাধিকরণ্যও ব্যাহত হয়। যাঁর বস্তুর জ্ঞান আছে তাঁরই

সেই জ্ঞান জন্য উক্ত বস্তু বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় স্বীকার করলে জ্ঞান ও প্রবৃত্তির আশ্রয়কে অভিন্ন বলতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বক্তার বস্তু বিষয়ক যে জ্ঞান হয়ে থাকে তার জন্য শ্রোতার প্রবৃত্তি কীরূপে স্বীকার করা যাবে? বস্তুতঃ বক্তার কোনও বিষয়ের জ্ঞানের জ্ঞান শ্রোতার থাকলেও সেই বিষয়ে শ্রোতার প্রবৃত্তি হয়নি – এই রকম হতেই পারে। অর্থাৎ শ্রোতার, বক্তার বাক্যার্থ জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান থাকলেও – সেই বিষয়ক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়নি – এমন সম্ভাবনা বর্তমান।

'ক' বিষয়ক জ্ঞান, 'ক' বিষয়ক প্রবৃত্তির হেতু হলে 'ক' বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান থেকে 'ক' বিষয়ক প্রবৃত্তি হয় স্বীকার করলে তা গৌরব দোষে দুষ্ট হবে। কোনো বিষয়ক জ্ঞানকে যদি আমি উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুরূপে পেয়েই যাই তাহলে অনর্থক তার জ্ঞানের জ্ঞানকে উক্ত বিষয়ের প্রবৃত্তির হেতুরূপে কল্পনা করতে যাবো কেন? সেক্ষেত্রে লাঘব নীতি লঙ্ঘিত হবে এবং উক্ত মতটি গৌরব দোষে দুষ্ট হবে, যা কখনোই নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রেত হতে পারে না। বস্তুতঃ বাক্যের বক্তার 'ক' বিষয়ক জ্ঞান আছে তা জানলেও শ্রোতার 'ক' বিষয়ক প্রবৃত্তি নাও হতে পারে। যাঁর "ইদং রজতম্" – এইরূপ জ্ঞান আছে তাঁরই রজত আহরণে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হতে দেখা যায়। বক্তার রজত বিষয়ক জ্ঞান আছে – এটি জানা সত্ত্বেও রজত আহরণে কারও প্রবৃত্তি নাই হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যভিচারের সম্ভাবনা বর্তমান এবং ব্যভিচারের সম্ভাবনা কার্য–কারণ সম্বন্ধ স্বীকারের প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে।

বৈশেষিকগণ আপত্তি করে বলতে পারেন, "ক" জ্ঞানের জ্ঞান তো "ক" – এর জ্ঞানও। তাহলে তা প্রবৃত্তি উৎপন্ন করতে পারবে না কেন? এই মতের পক্ষে পূর্বস্বীকৃতি হচ্ছে "দুটি জ্ঞানের বিষয় যদি এক হয় তাহলে জ্ঞান দুটিও এক হবে" – এইরূপ বৈশেষিক পূর্বস্বীকৃতির ক্ষেত্রে সমস্যা হলো এই যে, সেক্ষেত্রে ভ্রম জ্ঞান ও ভ্রম জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান – এই দুটির জ্ঞানকে এক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। ভ্রম জ্ঞানের জ্ঞানকেও ভ্রম বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ দুটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিষয় সাধারণভাবে বর্তমান। কিন্তু, ভ্রম জ্ঞান ও ভ্রম জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান – এই দুটির জ্ঞানকে এক বলা চলে না যেহেতু এই দুটি জ্ঞান জন্য ব্যবহারের ভিন্নতা রয়েছে। এই আপত্তি পূর্বেই উত্থাপিত হয়েছে। কোনো বিষয়ে ভ্রম জ্ঞান যাঁর আছে আর ভ্রম জ্ঞানের জ্ঞান যাঁর আছে এই দুজনের ব্যবহারও কখনও এক বা অভিন্ন হতে পারে না। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে দুটি জ্ঞানের বিষয়রূপে একটি বিষয় ভাসমান হওয়াতে জ্ঞান দুটিকে যদি অভিন্ন বলা হয় তবে তা নানা রকম অসম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় – এই আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। ন্যায়মতেও কি এই অসুবিধা আছে? এই বিষয়ে ন্যায়মত কি? ন্যায়মত কিন্তু এই বিষয়ে ভিন্ন। ন্যায়মতে যে যে ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর প্রবৃত্তি হয়, সেই ধর্মকে প্রকার করে সেই বস্তুকে বিশেষ্য করে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই ঐরূপ প্রবৃত্তির জনক। ফলে এক্ষেত্রে সামানাধিকরণ্য আছে। এই পক্ষে বৈশেষিক মতের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করা যায় সেই আপত্তির অবকাশ নেই। এই কথা স্বীকার করলে বৈশেষিকমতে বাক্যার্থের জ্ঞান কখনোই কর্মের প্রবর্তক হতে পারবে না। কারণ

বৈশেষিকমতে বস্তু যে ধর্মবিশিষ্ট, সেই ধর্মকে প্রকার করে বক্তার বাক্যজন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তা বক্তার বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান দেয়। তাতে বক্তার জ্ঞানের বিষয়ে বর্তমান ধর্ম প্রকার হয় না। বস্তুতঃপক্ষে বৈশেষিক মতে বাক্যার্থ জ্ঞান কোনও রকমেই প্রবর্তক হতে পারে না।

হয় স্বীকার করতে হয় বাক্যার্থের জ্ঞানজন্য প্রবৃত্তি হয় না অথবা বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মত স্বীকার্য নয়।

বক্তার প্রযুক্ত বাক্য শ্রবণ হেতু শ্রোতার বাক্যার্থ বিষয়ক অনুমিতি হয় এবং তার দ্বারাই বাক্যার্থও অনুমিত হয় – এই বৈশেষিক পক্ষ অবলম্বন করে কেউ বলতে পারেন, আমাদের ভাষায় অনেকার্থক শব্দ প্রযুক্ত হয়। কোনো বক্তা যদি অনেকার্থক শব্দ ব্যবহার করে তখন সেই বাক্যার্থের জ্ঞান হতে গেলে পূর্ব থেকে বক্তার অভিপ্রায় সম্পর্কে শ্রোতাকে অবগত থাকতে হয়। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন বক্তার অভিপ্রায় শ্রোতা জানবেন কীভাবে? এর উত্তরে বলা যায় প্রকরণ দেখে অনুমানের মাধ্যমে শ্রোতা বক্তার অভিপ্রায় তথা তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। কিন্তু তা যদি বলা হয় তাহলেও সমস্যা হবে। কেননা সেক্ষেত্রে আবার বাক্যার্থের জ্ঞানের অনুবাদকত্বের আপত্তি হবে কারণ বাক্যার্থ, বাক্যার্থবোধের পূর্বেই তাৎপর্য গ্রাহক অনুমানের দ্বারা গৃহীত হয়ে যাবে।

কারণ সেক্ষেত্রে তাৎপর্য জ্ঞান হওয়ার অর্থ হচ্ছে বক্তা কোন্ বিশেষ অর্থ উপস্থাপনার্থে বাক্য প্রয়োগ করেছেন তার জ্ঞান হওয়া।[১৩]

এই আপত্তির উত্তরে কেউ বলতে পারেন, শাব্দবোধের প্রতি তাৎপর্য জ্ঞানের কারণতা সর্বজনস্বীকৃত নয়। একমাত্র অনেকার্থক শব্দ প্রয়োগ স্থলেই বক্তার বক্তব্য অনুধাবনের জন্য তাৎপর্য জ্ঞানের অবকাশ আছে, অন্যত্র নয়। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে তাৎপর্য জ্ঞানের প্রয়োজন না থাকায় সর্বত্র তাৎপর্য জ্ঞান পূর্বে উৎপন্ন হয়ে বাক্যার্থবোধ হবে এমনটি নয়। এই কথা স্বীকার করলে অনেকার্থক শব্দ প্রয়োগ স্থলে একভাবে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় এবং অনেকার্থক শব্দ যে স্থলে প্রয়োগ হচ্ছে না সেই স্থলে অন্য ভাবে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় এইকথা স্বীকার করতে হবে। সেক্ষেত্রে আর বাক্যার্থবোধের কোনও সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। এখন যদি কেউ বলেন যে বক্তার তাৎপর্য অনুমিত হওয়ার পরে স্বতন্ত্র উপায়ে অর্থাৎ শব্দের সাহায্যে বাক্যার্থবোধ হয় সেই পক্ষও স্বীকার করা যাবে না। কারণ, বাক্যার্থটি তাৎপর্য জ্ঞান কালেই জ্ঞাত হওয়ায় পুনরায় বাক্যার্থ বোধে অনুবাদকত্বের আপত্তি হবে। গৃহীতগ্রাহিত্ববশতঃ শব্দ অনুবাদকই হবে, প্রমা নয়। এইরূপ আপত্তি ন্যায় পক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ তাঁরা কখনওই প্রমাকে অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক হতে হবে তা বলেননি, উপরন্তু তাঁরা প্রমাণ

[১৩] With regard to any effect the absence of impediment (*pratibandhakābāhva*) is the general cause. But in this instance with regard to verbal comprehension, the absence of the definite knowledge of the absence of intension will have to be assumed as the cause, which is cumbrous. Some modern logicians do not accept *tātpaya-jñāna* as a cause of verbal comprehension. - শর্মা, ই. আর. শ্রীকৃষ্ণ (অনুবাদক), ১৯৬০, *মণিকণা* এ নব্যন্যায় ম্যানুয়াল, ম্যাড্রাস: আড্যার লাইব্রেরী অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, পৃষ্ঠা: ১৩৪।

সংপ্লব স্বীকার করেন; অর্থাৎ একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হতে পারে – একথা স্বীকার করেন।

বৈশেষিক মতের সমর্থনে কেউ বলতে পারেন যে, মীমাংসকসমতে বাক্যার্থবোধের প্রতি আপ্তোক্তত্বনিশ্চয় হলো হেতু। তাহলে কোনো বাক্য শ্রবণের পর তার থেকে অর্থবোধ হতে গেলে আপ্তোক্তত্বনিশ্চয় প্রয়োজন। কোনো বিষয়ে কেউ আপ্ত – এটি বলার অর্থ হলো বক্তব্য বিষয়ে তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানবান। তা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে তো শ্রোতাকে বক্তার বক্তব্য বিষয় পূর্ব থেকে জানতে হচ্ছে। তাহলে যখন আপ্তোক্তত্বনিশ্চয় হচ্ছে তখনই তো বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে এমনটিই স্বীকার করে নিতে হবে। এই আপ্তোক্তত্বনিশ্চয় করা হচ্ছে অনুমানের সাহায্যে। তাহলে সেই অনুমানের মাধ্যমেই বক্তার জ্ঞানের যে বিষয় সেই পদার্থসংসর্গবোধ বিষয়েও জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, যে পদার্থসংসর্গ জ্ঞাত হচ্ছে সেই পদার্থসংসর্গ হলো প্রথম জ্ঞানের বিষয়; আর দ্বিতীয় জ্ঞানটি হলো পদার্থসংসর্গজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ দ্বিতীয় জ্ঞানে বিষয় হচ্ছে বক্তার পদার্থসংসর্গের জ্ঞান। তাহলে তো পদার্থসংসর্গ জ্ঞাত হয়ে যাচ্ছে সেই অনুমানের মাধ্যমেই। পরে যদি আবার বলা হয় পদার্থসংসর্গের বা বাক্যার্থের জ্ঞান বাক্যশ্রবণজন্য বাক্যার্থবোধ তাহলে মীমাংসকগণ বলবেন উক্ত

বাক্যার্থবোধটি এক্ষেত্রে অনুবাদক হয়ে যাবে; কেননা, সেটি আমাদের নতুন কোনো তথ্য জ্ঞাপন করছে না।[১৪]

এক্ষেত্রে নৈয়ায়িকগণ স্বীয়মত প্রতিষ্ঠার্থে বলতে পারেন, আপ্তোক্তত্বনিশ্চয়কে তাঁরা কখনোই বাক্যার্থবোধের হেতুরূপে স্বীকার করেন না। আপ্তোক্তত্বনিশ্চয়কে বাক্যার্থবোধের প্রামাণ্যনিশ্চয়ের হেতুরূপে স্বীকার করেন। বাক্যার্থবোধের প্রতি হেতুরূপে নয়। কারণ বাক্যার্থবোধের প্রতি আপ্তোক্তত্ব নিশ্চয়কে হেতু বললে নিশ্চিত মিথ্যাবাদীর উক্তি থেকে কখনোই বাক্যার্থবোধ হবে না।

ধরা যাক একজন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত, তাহলে তো তার বাক্যশ্রবণ করে আমার কোনো বাক্যার্থবোধই উৎপন্ন হবে না। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে সেক্ষেত্রেও বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে।[১৫] যদিও সেই বাক্যার্থবোধের প্রামাণ্য নিশ্চয় তার বক্তার প্রামাণ্য নিশ্চয়ের উপরে নির্ভরশীল। বাক্যার্থবোধ হওয়া আর বাক্যার্থবোধের প্রামাণ্য নিশ্চয় হওয়া – এই দুটি অভিন্ন নয়, এদের মধ্যে তফাৎ আছে। উপরন্তু কোনো জ্ঞান,

---

[১৪] "...জরন্মীমাংসকাস্তু লোকে বক্তৃজ্ঞানানুমানাপ্তদুপজীবিসংসর্গানুমানাদ্বা বাক্যার্থসিদ্ধৌ শব্দস্যানুবাদকত্বং বেদে তু তদভাবাৎ..." – উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ডং*, শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ৭।

[১৫] "For what is to be inferred is simply not there where, unknown to the hearer, the 'words' have been uttered by a deceiver or an unwise parrot or a child. But even in such cases an unsuspecting hearer comes to entertain definite belief. " – Mukhopadhay, Pradyot Kumar, 1991, *The Nyāya Theory of Linguistic Performance* (A NEW INTERPRETATION OF TATTVACINTĀMAṆI), Calcutta: K. P. Bagchi & Company (For Jadavpur University), Page No. 267.

আরেকটি জ্ঞানের অনুবাদক না অনুবাদক নয় বা, আরও স্পষ্টভাবে বললে, একটি জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর আরেকটি জ্ঞানকে তার অনুবাদক বলতে গেলে দুটি জ্ঞানের আকার অভিন্ন হতে হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্ষেত্রে দুটি জ্ঞানের আকার আদৌ এক নয়। প্রথমটি হলো পদার্থসংসর্গের জ্ঞান, আর দ্বিতীয়টি হলো পদার্থসংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞান। এই দুটির আকার কোনোভাবেই এক নয়; এদের প্রকার ভিন্ন, উদ্দেশ্য ভিন্ন। তাহলে একটি অপরটির অনুবাদক হওয়ায় প্রশ্নই ওঠে না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নৈয়ায়িক পক্ষ অবলম্বনপূর্বক আরও বলা যেতে পারে যে, অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বকে তাঁরা প্রমার লক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করেননি। নৈয়ায়িকগণ হলেন প্রমাণ – সংপ্লববাদী। একই বিষয় তাঁদের মতে সম্ভাব্য স্থলে বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। যে বিষয়ের সিদ্ধি আছে, সেই বিষয়টিকে অনুমানের মাধ্যমে জানার ইচ্ছা তথা সিষাধয়িষা থাকলে সেক্ষেত্রেও অনুমান সম্ভব বলে তাঁরা স্বীকার করে থাকেন। সুতরাং নৈয়ায়িকগণের ক্ষেত্রে এবিষয়ে অনুবাদকত্বের আপত্তি প্রযোজ্যই হতে পারে না।

(গ)

পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম, যে পূর্বস্বীকৃতির ভিত্তিতে বৈশেষিকগণ পদপক্ষক অনুমানের উপস্থাপনা করেছেন সেটি গ্রহণযোগ্য নয় তাই পদপক্ষক অনুমানকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা যায় না। তবে পদপক্ষক অনুমানের বিরুদ্ধে অন্য আপত্তির উত্থাপনও সম্ভব। বৈশেষিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমানের পদার্থসমূহের

সংসর্গরূপ সাধ্য সিদ্ধি করতে হলে উক্ত অনুমানের হেতুর বিষয়ীভূত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান ব্যতীত হেতুর জ্ঞান সম্ভব নয়। আর হেতুর জ্ঞান না হলে উক্ত হেতুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব হবে না। এখন দেখা যাক হেতুর বিষয়ীভূত আকাঙ্ক্ষা শব্দের দ্বারা 'বিশেষণ-বিশেষ্যভাব' বা 'বিশেষণ-বিশেষ্যভাবযোগ্যতা' কোনটিকেই গ্রহণ করা যায় কিনা। কারণ, বিশেষণবিশেষ্যভাব বলতে বিশেষণ ও বিশেষ্যের সংসর্গকেই বোঝায় যেটি উক্ত অনুমানের সাধ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং, বিশেষণবিশেষ্যভাবরূপ আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর অংশরূপে গ্রহণ করে পূর্বোক্ত প্রকার পদপক্ষক অনুমান প্রয়োগ করলে হেতুর জ্ঞানের দ্বারাই সাধ্যের জ্ঞান হয়ে যাওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেবে। অপরদিকে, বিশেষণবিশেষ্যভাবযোগ্যতাকেও আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না। কারণ, হেত্বংশে নিবিষ্ট 'আকাঙ্ক্ষাদি' অংশের দ্বারা যোগ্যতাকেও বোঝানো হয়ে থাকে। উদয়নাচার্যের মতে হেতুর বিষয়ীভূত যোগ্যতার দ্বারাই বিশেষণবিশেষ্যভাবযোগ্যতার বোধ হয়ে যাওয়ায় হেত্বংশে পৃথকরূপে 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। সুতরাং, আকাঙ্ক্ষার অর্থরূপে বিশেষণবিশেষ্যভাব বা বিশেষণবিশেষ্যভাবযোগ্যতা কোনোটিকেই গ্রহণ করা যায় না।[১৬] আবার, পদজন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের পরস্পর অবিনাভাবকেও আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না। কারণ, অবিনাভাবের অভাবেও বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে। যেমন, 'নীলং সরোজম্' এই বাক্য

[১৬] "*ন তাবদ্ বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ, তস্য সংসর্গস্বভাবতয়া সাধ্যত্বাৎ। নাপি তদ্যোগ্যতা, যোগ্যতয়ৈব গতার্থত্বাৎ।*" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৯।

স্থলে নীল ও সরোজের মধ্যে অবিনাভাব নেই। নীল ও সরোজ পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধরহিত হয়েও থাকতে পারে। অর্থাৎ, নীল ও সরোজের মধ্যে অবিনাভাব না থাকলেও 'নীলং সরোজম্' এই বাক্য থেকে বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে। সুতরাং, অবিনাভাবকে আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না।[১৭] কেউ মনে করতেই পারেন বিশেষের দ্বারা আক্ষিপ্ত (উপস্থাপিত) সামান্যদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাব বিদ্যমান। যেমন, 'নীলং সরোজম্' বাক্য স্থলে 'নীল' পদের দ্বারা গুণসামান্যের এবং 'সরোজ' পদের দ্বারা দ্রব্যসামান্যের আক্ষেপ হয়ে থাকে। আর এই গুণ ও দ্রব্য সামান্যের মধ্যে অবিনাভাব বিদ্যমান। সুতরাং, পদার্থ সমূহের পরস্পর অবিনাভাবকে আকাঙ্ক্ষারূপে স্বীকার করা যায়।[১৮] এর উত্তরে বলা যেতে পারে, বিশেষের দ্বারা সামান্যের আক্ষেপ স্বীকার করে সামান্যতো পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাবের অস্তিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে যদি আকাঙ্ক্ষার উপপত্তি করা হয় তা হলে 'বিমলং জলং নদ্যাঃ কচ্ছে মহিষশ্চরতি' এইরূপ স্থলে বাক্যভেদের অনুপপত্তি হবে।[১৯] কারণ, 'বিমলং জলং নদ্যাঃ কচ্ছে মহিষশ্চরতি' অর্থাৎ, নদীর নির্মল

---

[১৭] "নাপ্যবিনাভাবঃ, নীলং সরোজমিত্যাদৌ তদভাবেঽপি বাক্যার্থপ্রত্যয়াৎ।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৯।

[১৮] "*নাপ্যবিনাভাবঃ, নীলং সরোজমিত্যাদৌ তদভাবেঽপি বাক্যার্থপ্রত্যয়াৎ। তত্রাপি বিশেষাক্ষিপ্তসামান্যয়োরবিনাভাবোঽস্তীতি চেৎ ......।*" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৯।

[১৯] "...যত্র বিমলং জলং ইত্যশ্রুত্বৈব নদ্যাঃ কচ্ছে মহিষশ্চরতীতি শৃণোতি তত্রাকাঙ্ক্ষাদিকমস্তি। ন চ নদী-কচ্ছয়োঃ সংসর্গ ইতি, ব্যভিচারাৎ।..." – উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ডং,* শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ৫ – ৬।

জল তীরে মহিষ চরছে এইরূপ বাক্য স্থলে 'নদ্যাঃ' পদটি জলের সঙ্গে অন্বিত হলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়ে যায় ফলে পুনরায় 'নদ্যাঃ' পদের সঙ্গে কচ্ছে অন্বয়ানুকূল আকাঙ্ক্ষা না থাকায় 'নদ্যাঃ' পদটি কচ্ছের সঙ্গে অন্বিত হতে পারে না। তাই উক্ত স্থলে 'বিমলং জলং নদ্যাঃ' অর্থাৎ, নদীত নির্মল জল এবং 'নদ্যাঃ কচ্ছে মহিষশ্চরতি' অর্থাৎ, নদী তীরে মহিষ চরছে এইরূপ দুটি পৃথক বাক্য স্বীকার করতে হবে। কিন্তু, পূর্বোক্ত যুক্তিতে অর্থাৎ সামান্যতো পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাব স্বীকার করলে নদীর সঙ্গে কচ্ছের অবিনাভাব থাকায় আকাঙ্ক্ষা আছে বলে স্বীকার করতে হবে। ফলে উক্ত বাক্যস্থলে দুটি পৃথক বাক্যের উপপত্তির পরিবর্তে একটি বাক্যের উপপত্তি হবে যা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং, সামান্যতো অবিনাভাবকে আকাঙ্ক্ষারূপে স্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে কেউ মনে করতে পারেন শ্রোতার জিজ্ঞাসাই হলো আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ, যে বাক্যে শ্রোতার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি থাকে সেই বাক্যকেই আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট সম্পূর্ণ বাক্যরূপে গ্রহণ করা যাবে, অন্যথায় নয়।[২০] কিন্তু, এইরূপ অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এইরূপ অভিমত গ্রহণ করলে যথার্থ শাব্দবোধের জনক সম্পূর্ণ বাক্যকেও অসম্পূর্ণ এবং শাব্দবোধের অজনকরূপে গণ্য করতে হবে। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যক্ত করা যায়। যদি কোন শ্রোতা 'রক্ত পটো ভবতি' এইরূপ বাক্য শ্রবণ করেন তাহলে তাঁর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় বলে পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে এই বাক্যটিকে আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্টরূপে গণ্য করতে হবে। তবে এই বাক্যের একটি অংশ যেমন, 'পটো ভবতি'কে

---

[২০] তবে, আকাঙ্ক্ষা পদের ধর্ম না বাক্যের ধর্ম – এবিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান।

আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট বাক্যরূপে গ্রহণ করা যাবে না। যেহেতু, ঐ অংশে শ্রোতার জিজ্ঞাসার নিবর্তক 'রক্ত' পদটি নেই। কিন্তু সমস্যা হল – বক্তা যখন স্বতন্ত্রভাবে 'পটো ভবতি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন তখন শ্রোতা এই বাক্য শ্রবণ করে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। অর্থাৎ, শ্রোতার যথার্থ বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে। যদিও উক্ত বাক্যস্থলে পটের শুক্লাদিবিষয়ক জিজ্ঞাসা বিদ্যমান থাকায়, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে বাক্যটিকে আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট সম্পূর্ণ বাক্যরূপে গণ্য করা যাবে না। সুতরাং, শ্রোতার জিজ্ঞাসাই আকাঙ্ক্ষা এইরূপ অভিমত গ্রহণ করলে শাব্দবোধের জনক বাক্যকেও শ্রোতার জিজ্ঞাসার নিবর্তকত্বরূপ আকাঙ্ক্ষার অভাবে নিরাকাঙ্ক্ষরূপে স্বীকার করতে হবে। ফলে উক্ত বাক্য শ্রবণজন্য শ্রোতার শাব্দবোধের উপপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। তাই, শ্রোতার জিজ্ঞাসাকে আকাঙ্ক্ষারূপে গ্রহণ করা যায় না।[২১] এর উত্তরে কেউ বলতে পারেন শ্রোতার গুণক্রিয়াদি নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকলেও পদস্মারিত যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা সেটিই আকাঙ্ক্ষা।[২২] আমোদকার শঙ্করমিশ্র এর অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, কোন একটি বাক্যের অন্তর্গত একটি পদের আকাঙ্ক্ষা বলতে আমরা সেই জিজ্ঞাসাকেই বুঝবো যে জিজ্ঞাসা ঐ বাক্যস্থ পদের দ্বারা স্মারিত অর্থকে বিষয় করে। সেই অর্থ

---

[২১] "নাপি প্রতিপত্তুর্জিজ্ঞাসা, পটো ভবতীত্যাদৌ শুক্লাদিজিজ্ঞাসায়াং রক্তঃ পটো ভবতীত্যস্যৈকদেশবৎ সর্বদা বাক্যাপর্যবসান প্রসঙ্গাৎ।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, (সম্পাদিত) শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৯।

[২২] "গুণক্রিয়াদ্যশেষবিশেষজিজ্ঞাসায়ামপি পদস্মারিতবিশেষজিজ্ঞাসা আকাঙ্ক্ষা।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, (সম্পাদিত) শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮১।

বিষয়ক জিজ্ঞাসাই হলো আকাঙ্ক্ষা।[২৩] যেমন, 'পটঃ' পদ শ্রবণ করলে শ্রোতার পটের গুণবিষয়ক বা অধিকরণবিষয়ক বা ক্রিয়াবিষয়ক জিজ্ঞাসা হতে পারে। কিন্তু, এই সকল প্রকার জিজ্ঞাসাই সর্বদা আকাঙ্ক্ষারূপে বিবেচিত হয় না। 'পটঃ' পদের পর যদি 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদ উচ্চারিত হয় তা হলে বুঝতে হবে যে সেই স্থলে ক্রিয়াবিষয়ক জিজ্ঞাসাই আকাঙ্ক্ষা, গুণাদিবিষয়ক জিজ্ঞাসা নয়। পূর্বোক্ত 'রক্ত পটো ভবতি' এই দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে 'পটো ভবতি' এই অংশের পূর্বে 'রক্ত' এই গুণপদ প্রযুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে উক্ত স্থলে গুণবিষয়ক জিজ্ঞাসাই আকাঙ্ক্ষা। অপরদিকে যে স্থলে কেবল 'পটো ভবতি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে 'পটো' পদের পরে 'ভবতি' পদ প্রযুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে উক্ত স্থলে ক্রিয়াবিষয়ক জিজ্ঞাসাই আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং, 'পটো ভবতি' এই বাক্যটি নিরাকাঙ্ক্ষ এইরূপ অভিমত সঙ্গত নয়। অতএব শ্রোতার জিজ্ঞাসাকে আকাঙ্ক্ষারূপে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসাকে আকাঙ্ক্ষারূপে গ্রহণ করলেও প্রশ্ন ওঠে উক্ত প্রকার আকাঙ্ক্ষা, সংসর্গ জ্ঞানের স্বরূপসৎরূপে কারণ না জ্ঞাতসৎরূপে কারণ?[২৪] প্রথম কল্প অর্থাৎ স্বরূপসৎরূপে আকাঙ্ক্ষাকে সংসর্গের কারণরূপে স্বীকার করলে দ্বিবিধ সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। প্রথমত, আকাঙ্ক্ষাকে সংসর্গের প্রতি স্বরূপসৎ অর্থাৎ তার সত্তাকেই কারণরূপে স্বীকার করলে বৈশেষিকগণ কর্তৃক

---

[২৩] "যা জিজ্ঞাসা তদ্বাক্যস্থপদস্মারিতমর্থং বিষয়ীকরোতি সেত্যর্থঃ।" – শঙ্করমিশ্র, ১৯৭২, *আমোদ*, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলির* টীকা, শ্রী মহাপ্রভুলাল গোস্বামী (সম্পাদিত), মিথিলা বিদ্যাপীঠ, দারভাঙ্গা, পৃষ্ঠা: ৪২৩।

[২৪] "..........কিমস্যাং জাতবামন্বয় প্রত্যয়োঽথ জ্ঞাতায়ামিতি।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮১।

প্রদত্ত পদপক্ষক অনুমানের হেত্বংশে আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষণরূপে নিবেশ ব্যর্থ বলতে হবে। কারণ, হেতুর বিশেষণরূপে আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান না হলেও তার সত্তামাত্রের দ্বারাই সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব। দ্বিতীয়ত, আকাঙ্ক্ষাকে উক্ত অনুমানের হেত্বংশে নিবেশ না করলে অর্থাৎ, কেবল আসত্তি ও যোগ্যতাকে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করলে হেতুটিতে ব্যভিচার দোষ দেখা দেবে।[২৫] যেমন, 'অয়মেতি পুত্রোরাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম্' – এইরূপ স্থলে যোগ্যতা ও আসত্তি থাকলেও রাজা ও পুরুষের মধ্যে সংসর্গ নেই।[২৬] অর্থাৎ, হেতুটি সাধ্যের অভাবের অধিকরণ বৃত্তি হওয়ায় ব্যভিচার দোষযুক্তরূপে প্রতিপন্ন হবে। পক্ষান্তরে, আকাঙ্ক্ষাকে হেত্বংশে বিশেষণরূপে অন্তর্ভুক্ত করলে পূর্বোক্ত ব্যভিচার দোষ বারণ সম্ভব। কারণ, উক্ত স্থলে যোগ্যতা ও আসত্তি থাকলেও 'পুত্র' পদের সঙ্গে 'রাজ্ঞঃ' পদের অন্বয় হয়ে যায় বলে 'পুরুষ' পদের সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। 'রাজ্ঞঃ' পদের সঙ্গে 'পুরুষ' পদের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় উভয়ের মধ্যে সংসর্গও থাকে না। তাই পূর্বোক্ত ব্যভিচার দোষেরও উদ্ভব ঘটে না। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে উদয়নাচার্যের মতে আকাঙ্ক্ষার সত্তামাত্রকেই সংসর্গের কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় কল্প অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাকে জ্ঞাতসৎরূপেও অন্বয়বোধের কারণ বলা যায় না।

[২৫] "...নন্বেতে পদার্থাস্তাৎপর্য্যবিষয়মিথঃ সংসর্গবন্তঃ আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদস্মারিতত্বাৎ যোগ্যতাসত্তিমত্ত্বে সতি সংসর্গপরপদস্মারিতত্বাদবা, অনাপ্তোক্তে যোগ্যতাবিরহাৎ ন ব্যভিচারঃ,..." – উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ডং*, শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ৪ – ৫।

[২৬] - শর্মা, ই. আর. শ্রীকৃষ্ণ (অনুবাদক), ১৯৬০, *মণিকণা* এ নব্যন্যায় ম্যানুয়াল, ম্যাড্রাস: আড্যার লাইব্রেরী অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, পৃষ্ঠা: ১৩৮ – ১৩৯।

কারণ, যোগ্যতা ও আসত্তির জ্ঞান থাকলে আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান না থাকলেও সাকাঙ্ক্ষ পদজন্য উপস্থিত পদার্থের অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, কোন একটি বাক্য শ্রবণ করলে অন্বয়প্রতিযোগিপদার্থস্মরণের অব্যবহিত পরেই অন্বয়ের বা সংসর্গের বোধ হয়, জিজ্ঞাসার জ্ঞান নয়। তাছাড়া, আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাতরূপে হেতুর বিশেষণ হলেও হেতুটি অব্যভিচারী হবে না। কারণ, অনেক স্থলে বক্তা সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করলেও অন্যমনস্কতা হেতু শ্রোতা তার অংশ বিশেষ শ্রবণ করলে উক্ত বাক্যে আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদসমূহ থাকলেও স্মারিতার্থ সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব থাকে না। যেমন, বক্তা "অয়মেতি পুত্রোরাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম্' – এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করলেও অন্যমনস্কতাবশতঃ শ্রোতা যদি 'রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম্' – এই অংশ শ্রবণ করে তা হলে উক্ত স্থলে আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদসমূহ থাকলেও স্মারিতার্থ সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব নেই। কারণ, শ্রোতার শ্রুত অংশটিতে স্মারিতার্থ সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব থাকে না। ফলে হেতুটিকে অব্যভিচারীরূপে গণ্য করা যায় না।[২৭] উল্লিখিত সমস্যার সমাধানকল্পে কেউ বলতে পারেন পদপক্ষক অনুমানের হেতুর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত আকাঙ্ক্ষা বলতে কোন বিশেষ পদের আকাঙ্ক্ষাকে বোঝানো হয় নি, বাক্যের মধ্যে যতগুলি পদের সমাহার ঘটেছে সেই সবগুলি পদের আকাঙ্ক্ষাদিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বাক্যের অন্তর্গত

---

[২৭] "যদা হি অয়মেতি পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতামিতি বক্তোচ্চারয়তি শ্রোতা চ ব্যাসঙ্গাদিনা নিমিত্তেনায়মেতি পুত্র ইত্যশ্রুত্বৈব রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতামিতি শৃণোতি তদাস্ত্যাকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি পদকদম্বকত্বং, ন চ স্মারিতার্থসংসর্গ জ্ঞানপূর্বকত্বমিতি।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৩।

যাবৎ পদের আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট এবং ঐ ঐ পদার্থের স্মারকত্ব হল পদপক্ষক অনুমানের হেতু। সুতরাং, শ্রোতা যখন অন্যমনস্কতা হেতু বক্তার উচ্চারিত বাক্যের অংশ বিশেষ শ্রবণ করে তখন বাক্যের মধ্যে যতগুলি পদের সমাহার ঘটেছে সেই সকল পদের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় হেতুটিকে সম্পূর্ণরূপে গণ্য করা যায় না। ফলে উক্ত স্থলে সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর বৃত্তিত্বের অভাব থাকায় পূর্বোক্ত ব্যভিচার দোষ বারিত হয়। যেমন, পূর্বোল্লিখিত উদাহরণস্থলে শ্রোতা অন্যমনস্কতাহেতু কেবল 'রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম্' অংশটি শ্রবণ করলে বক্তার উচ্চারিত বাক্যের মধ্যে যে পদগুলি ছিল সেই সমস্ত পদের আকাঙ্ক্ষার অভাব থাকায় উক্ত স্থলে হেতুর অভাব থাকে। ফলে পূর্বোক্ত ব্যভিচার দোষ হয় না।[২৮] এখন সমস্যা হল যাবৎ পদের আকাঙ্ক্ষা স্বীকার করলে ক্ষেত্রবিশেষে শ্রোতা বক্তার উচ্চারিত বাক্যের অংশবিশেষ শ্রবণ করলে অন্বয়বোধ না হওয়ারই কথা। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখি যে, স্থলবিশেষে শ্রোতা বক্তার উচ্চারিত বাক্যের অংশবিশেষ শ্রবণ করলেও অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। যেমন, পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে আমরা দেখলাম বক্তা 'অয়মেতি পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম' উচ্চারণ করলেও শ্রোতা যদি 'রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম' – এই অংশ শ্রবণ করেন তা হলেও অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। সুতরাং, বাক্যের অন্তর্গত যাবৎ পদ আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট এবং ঐ

[২৮] "স্যাদেতৎ-যাবৎ সমব্যাহৃতত্বেন বিশেষিতে হেতৌ নায়ং দোষঃ, তথাবিধস্য ব্যভিচারোদাহরণাসংস্পর্শাৎ।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৪।

ঐ পদার্থের স্মারকত্ব হল পদপক্ষক অনুমানের হেতু – এইরূপ স্বীকার করা যায় না।[২৯] পূর্বপক্ষী উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে বলতে পারেন, উপযুক্ত স্থলে হেতুটি সদ্ হেতু নয়। অর্থাৎ, অহেতুতে হেতুত্ব আরোপজন্য ঐরূপ অন্বয়বোধ হয়। বিষয়টি উক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে বক্তা 'অয়মেতি পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম' উচ্চরণ করলেও শ্রোতা অন্যমনস্কতাহেতু 'রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম' শ্রবণ করেন। সুতরাং, বক্তার বাক্যবিষয়ে শ্রোতার জ্ঞানটি যথার্থ নয়, ভ্রান্ত। কারণ, বক্তা 'অয়মেতি পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম' – এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করলেও তিনি মনে করছেন বক্তা 'রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম' বলেছেন এবং সেই অনুসারে শ্রোতা 'রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম' এই অংশে ব্যবহৃত পদসমূহকে বক্তার উচ্চারিত বাক্যের অন্তর্গত যাবৎ পদরূপে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, তিনি মনে করেন বক্তা 'রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম' – এই পদসমূহ উচ্চারণ করেছেন এবং এই পদগুলি আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট হয়ে ঐ ঐ পদার্থের স্মারক। সুতরাং, এটি একটি সদ্ হেতু। হেতুবিষয়ে এইরূপ ভ্রান্তিজন্য শ্রোতার ঐরূপ অন্বয়ের বোধ হয়ে থাকে। তাই, উক্ত অন্বয়ের বোধকে যথার্থ বোধ বলা যায় না।[৩০] এর উত্তরে বলা যায়, এমন নয় যে সর্বদাই হেতুবিষয়ে ভ্রান্ত জ্ঞানজন্যই অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে হেতুর

---

[২৯] "কুতস্তর্হি কতিপয়পদশ্রাবিণঃ সংসর্গপ্রত্যয়ঃ।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৪।

[৩০] "অলিঙ্গ এব লিঙ্গত্বাধ্যারোপাৎ। এতাবানেবায়ং সমভিব্যাহার ইতি তত্র শ্রোতুরভিমানঃ।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৪।

সংশয়াত্মক জ্ঞানজন্যও অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। যেমন, শ্রোতার এইরূপ জ্ঞান হতে পারে যে – 'জানি না এই ব্যক্তি আর কি বলেছেন, আমি 'রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম' এই মাত্র শ্রবণ করেছি'।[৩১] আর এইরূপ জ্ঞান থেকেও অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। সুতরাং, হেতুর ভ্রমাত্মক জ্ঞান থেকেই কেবল অন্বয়বোধ হয় এমন নয়, হেতুর সংশয়াত্মক জ্ঞান জন্যও অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু, বক্তার উচ্চারিত যাবৎ পদের আকাঙ্ক্ষাকে অন্বয়বোধের জনক হেতুর অন্তর্ভুক্ত করলে যেখানে বক্তার উচ্চারিত যাবৎ পদ বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান সেখানে অন্বয়বোধের উৎপত্তি হওয়ার কথা নয়। যদিও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বক্তার উচ্চারিত যাবৎ পদ বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও অন্বয়বোধের উৎপত্তি হচ্ছে। সুতরাং, বক্তার উচ্চারিত যাবৎ পদের আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর অংশরূপে গ্রহণ করা যায় না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন, উক্ত স্থলে প্রকৃতপক্ষে বাক্যের একাংশের সংসর্গের বোধ হয় না, কেবল পদার্থসমূহের অসংসর্গের অগ্রহবশতঃ সংসর্গব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যে স্থলে বক্তার উচ্চারিত বাক্যের পদসমূহ বিষয়ে শ্রোতার সংশয় থাকে সেই স্থলে শ্রুত বাক্যাংশের অন্তর্গত পদ নির্দেশিত পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গবোধ বা অন্বয়বোধ শ্রোতার হয় না বরং, ঐ পদার্থগুলি যে অসংসর্গ বিশিষ্ট এইরূপ জ্ঞানের অভাব (অগ্রহ) থাকে। আর এই অসংসর্গের অগ্রহবশতঃ আমরা উক্ত পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গ আছে এইরূপ ব্যবহার করে থাকি। এর উত্তরে বলা যায়,

[৩১] "ন, তৎসন্দেহেঽপি শ্রুতানুরূপসংসর্গাবগমাৎ। ভবতি হি তত্র প্রত্যয়ো ন জানে কিমপরমনেনোক্তমেতাবদেব শ্রুতং যদ্ রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতামিতি।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৪।

সংসর্গের অগ্রহবশতঃ সংসর্গের ব্যবহার হয় এইরূপ স্বীকার করলে পূর্বোক্ত হেতুতে যাবৎ পদের সমভিব্যাহাররূপ বিশেষণ প্রয়োগ করলেও ইষ্ট সিদ্ধি হবে না। কারণ, আমরা জানি বাক্য শ্রবণজন্য আমাদের প্রবৃত্তির হেতু হল সংসর্গগ্রহ, অসংসর্গের অগ্রহ নয়। তাই, অনাপ্ত বাক্যের স্থলে পদার্থ সমূহের মধ্যে অসংসর্গের অগ্রহবশতঃ তাদের মধ্যে সংসর্গের ব্যবহার হলেও প্রবৃত্তির নিয়ামক যে সংসর্গের বোধ সেটি না থাকায় অনাপ্ত বাক্যজন্য প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব নয়।[৩২] উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন অনাপ্ত বাক্যস্থলে সাধ্যরূপে সংসর্গের বোধকে গ্রহণ না করে অসংসর্গাগ্রহপূর্বকত্বকে গ্রহণ করলে পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।[৩৩] অর্থাৎ, তাঁদের মতে আপ্তবাক্যের ক্ষেত্রে সংসর্গবোধ বা অন্বয়বোধকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করলে এবং অনাপ্তবাক্যের ক্ষেত্রে অসংসর্গাগ্রহপূর্বকত্বকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করলে পূর্বোক্ত ব্যভিচার দোষ হবে না।[৩৪] এর উত্তরস্বরূপ বলা যায় সর্ববিষয়ে আপ্তত্বই অসিদ্ধ।[৩৫] অর্থাৎ, কোন

[৩২] "নাস্ত্যেব তত্র সংসর্গ প্রত্যয়োঽসংসর্গাগ্রহমাত্রেন তু তথা ব্যবহার ইতি চেৎ, তর্হি যাবৎ সমভিব্যাহারেণাপি বিশেষণে নাপ্রতিকারঃ, তথাভূতস্যানাপ্তবাক্যস্য সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্বাভাবাৎ।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৪।

[৩৩] – উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ডং,* শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ১৩।

[৩৪] "অসংসর্গাগ্রহপূর্বকত্বমাত্রে সাধ্যে ন ব্যভিচার ইতি চেৎ এবং তর্হি সংসর্গো ন সিধ্যেৎ। আপ্তবাক্যেষু সেৎস্যতীতি চেৎ........।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৪।

[৩৫] " অতএব ব্যভিচারশঙ্কাবিরহো হেতুঃ সা চ লোকে ভ্রমাদিমূলেত্যাপ্তোক্তত্বানুমানাদুচ্ছিদ্যতে, বেদেচাপৌরুষেয়ত্বনিশ্চয়েনেতি নিরস্তং।" – উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ:*

ব্যক্তি সর্ববিষয়ে আপ্ত হতে পারেন না। একজন ব্যক্তি একটি বিশেষ বিষয়ে আপ্ত হলেও ভিন্ন বিষয়ে অনাপ্ত হতে পারে। সুতরাং, কোন একটি বাক্য শ্রবণ করলে সেটি আপ্ত বাক্য না অনাপ্ত বাক্য তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বক্তার উচ্চারিত বাক্যের অর্থবোধ হলে তবেই আমরা বক্তার আপ্তত্ব বা অনাপ্তত্ব নির্ধারণ করতে পারি। সুতরাং, কোন একটি বাক্যের নিরিখে যদি বক্তার আপ্তত্ব সিদ্ধি হয় তা হলে স্বীকার করতে হবে যে ঐ বাক্যের অন্তর্গত পদ নির্দেশিত পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের বোধও পূর্বে সিদ্ধ হয়েছে। আর এরূপ স্বীকার করলে শব্দকে জ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক তাথা অনুবাদক রূপে গণ্য করতে হবে। ফলে শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা যাবে না।[৩৬] সুতরাং, জিজ্ঞাসারূপ আকাঙ্ক্ষাকে জ্ঞাতসৎরূপেও সংসর্গবোধের কারণরূপে স্বীকার করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হল – আকাঙ্ক্ষা বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝতে হবে? জিজ্ঞাসার যোগ্যতাকেই কি আকাঙ্ক্ষা বলা যাবে? কিন্তু প্রশ্ন হল – 'জিজ্ঞাসার যোগ্যতা' বলতে কি বুঝতে হবে? এর উত্তরে বলা যায়, পদস্মারিত পদার্থদ্বয়ের অবিনাভাব এবং শ্রোতার সেই বাক্যজন্য সংসর্গাবগতির প্রাগভাবই জিজ্ঞাসার যোগ্যতারূপে বিবেচিত। আর

শব্দখণ্ডং, শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ৯।

৩৬ "..... ন সর্ববিষয়াপ্তত্বস্যাদিদ্ধেঃ। যত্র ক্বচিদাপ্তত্বস্যানৈকান্তিকত্বাৎ। প্রকৃতবিষয়ে চাপ্তত্বসিদ্ধৌ সংসর্গবিশেষস্য প্রাগেব সিদ্ধ্যভ্যুপগমাদিত্যুক্তম্।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৪।

জিজ্ঞাসার এইরূপ যোগ্যতাই আকাঙ্ক্ষা।[৩৭] যেমন, 'ওদনং পচতি' এই বাক্য স্থলে বাক্যান্তর্গত পদস্মারিত কারক ও ক্রিয়া এই পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাব রয়েছে। কারণ, ক্রিয়া না থাকলে কারক হয় না, আবার কারক না থাকলে ক্রিয়াও হয় না। আবার 'ওদনং পচতি' এই বাক্যজন্য যে সংসর্গের বোধ সেই সংসর্গবোধের প্রাগভাবও শ্রোতার রয়েছে। অপরদিকে 'নীলম্ উৎপলম্' এই বাক্যস্থলে নীল পদের দ্বারা স্মারিত নীলের দ্বারা আক্ষিপ্ত যে গুণসামান্য এবং উৎপল পদের দ্বারা স্মারিত উৎপলের দ্বারা আক্ষিপ্ত দ্রব্যসামান্যের মধ্যে অবিনাভাব আছে, এবং 'নীলম্ উৎপলম্' এই বাক্যজন্য যে সংসর্গবোধ তার প্রাগভাবও শ্রোতার আছে।[৩৮] এইরূপ প্রাগভাবই হল আকাঙ্ক্ষা। আরও প্রশ্ন হতে পারে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাতসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ না স্বরূপসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ? বস্তুতঃ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাতসৎ নয়, স্বরূপসৎরূপেই অন্বয়বোধের কারণ হয়ে থাকে। কারণ, আমরা জানি অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগির জ্ঞানাধীন তাই ঐরূপ প্রাগভাবের জ্ঞান তার প্রতিযোগী যে সংসর্গেবোধ তার জ্ঞানকে অপেক্ষা করে আর সংসর্গবোধের জ্ঞান সংসর্গবোধকে অপেক্ষা করে। সুতরাং, আকাঙ্ক্ষাকে জ্ঞাতসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণরূপে স্বীকার করলে বাক্যার্থবোধের পূর্বেই সংসর্গবোধরূপ বাক্যার্থবোধ স্বীকার করতে হবে। ফলে বাক্যকে অভিনব অর্থের

---

[৩৭] "সা চ পদস্মারিত তদাক্ষিপ্তয়োরবিনাভাবে সতি শ্রোতরি তদুৎপাদ্যসংসর্গাবগম প্রাগভাবঃ।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৫ – ২৮৬।

[৩৮] - শর্মা, ই. আর. শ্রীকৃষ্ণ (অনুবাদক), ১৯৬০, *মণিকণা* এ নব্যন্যায় ম্যানুয়াল, ম্যাড্রাস: আড্যার লাইব্রেরী অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, পৃষ্ঠা: ৮৩।

জ্ঞাপকরূপে স্বীকার করা যাবে না, সেটিকে অনুবাদকরূপে স্বীকার করতে হবে।[৩৯] সুতরাং আকাঙ্ক্ষা স্বরূপসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ হওয়ায়, অর্থাৎ জ্ঞাতসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ না হওয়ায় আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করে পদপক্ষক অনুমানের দ্বারা অন্বয়বোধরূপ সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব নয়। কারণ, আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করলে তাকে জ্ঞাতসৎরূপেই গ্রহণ করতে হবে, স্বরূপসৎরূপে নয়। অতএব বৈশেষিক বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য যে পদপক্ষক অনুমান প্রদান করেছেন তার দ্বারা বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব স্থাপন সম্ভব নয়। তাই বাক্যার্থবোধকে পৃথক্ প্রমিতিরূপে অবশ্যই স্বীকার কারতে হবে। আর বাক্যার্থবোধ পৃথক্ প্রমিতিরূপে স্বীকৃত হলে তার করণকে অবশ্যই স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে অনুমিতি ও শাব্দবোধের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে আরও বলা যায়, যেখানে পক্ষ সাধ্যসামান্যাভাবের জ্ঞান থাকবে সেই স্থলে পক্ষ সাধ্যবান এই আকারের অনুমিতি হবে না। কারণ, আমরা জানি পক্ষঃ সাধ্যবান্ এই আকারের জ্ঞানের (অনুমিতির) প্রতি পক্ষঃ সাধ্যসামান্যাভাববান্ এই আকারের বাধনিশ্চয় প্রতিবন্ধক। ইতিপূর্বে আমরা পদপক্ষক অনুমানের যে বিশেষ আকারটি ("গৌঃ পদমস্তিত্ববদ্গোগোচরজ্ঞানপূর্বকম্ অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষগৌঃ পদত্বাৎ, যন্নৈবম্ তন্নৈবম্

---

[৩৯] "ন চৈষোঽপি জ্ঞানমপেক্ষতে, প্রতিযোগিনিরূপণাধীন নিরূপণত্বাৎ, তদভাবেনিরূপণস্য চ বিষয়নিরূপ্যত্বাদিতি।" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৬।

যথাঽহকাশম্...।”[৪০]) উল্লেখ করে এসেছি সেই স্থলে অর্থাৎ, ‘গৌরস্তি’ ইত্যাদি স্থলে যদি ‘গৌ’পদবিশেষ্যক অস্তিত্ববদ্‌গোগোচরজ্ঞানপূর্বকত্বের সামান্যাভাব নিশ্চিত থাকে তা হলে ‘গৌঃ’পদম্ অস্তিত্ববদ্‌গোগোচরজ্ঞানপূর্বকম্ এই আকারের অনুমিতি হতে পারে না। অথচ শব্দপ্রামাণ্যবাদিগণ ‘গৌঃ’ পদবিশেষ্যক অস্তিত্ববদ্‌গোগোচরজ্ঞানপূর্বকত্বের অভাবনিশ্চয় কালেও ‘অস্তিতাবান্ গৌঃ’ এই আকারের বাক্যার্থবোধ স্বীকার করেন। সুতরাং, বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করা যায় না।[৪১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অনুমিতি ও শাব্দবোধের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে যে উভয় জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রী তথা কারণকূট, করণ এমনকি উৎপত্তি প্রক্রিয়াও ভিন্ন। সুতরাং বাক্যার্থের জ্ঞানকে অনুমিতিরূপে গণ্য করা যায় না। যেসকল যুক্তির ভিত্তিতে নৈয়ায়িক বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত শাব্দবোধরূপে ব্যবস্থিত করেছেন, তন্মধ্যে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

বৈশেষিক পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ‘গৌঃ’ পদবিশেষ্যক অস্তিত্ববদ্‌গোগোচরজ্ঞানপূর্বকত্বের অভাবনিশ্চয় কালেও ‘অস্তিতাবান্ গৌঃ’ এই আকারের

---

[৪০] জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৯।

[৪১] “গবাদিপদানাং জ্ঞানপূর্বকত্বাদ্যভাবনিশ্চয়দশোৎপন্নস্য গবাদিমুখ্যধর্মিকাস্তিত্বাদ্যন্বয়বোধস্য সর্বজনানুভবসিদ্ধস্য উক্তলিঙ্গাদপি অনিষ্পত্তেঃ,....।” – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৯।

বাক্যার্থবোধ সর্ববাদী সম্মত নয়। অতএব, পূর্বোক্ত বাধনিশ্চয় কালে শাব্দবোধের উৎপত্তি হয় এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নয়।

উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে বৈশেষিকগণের অভিমত গ্রহণ করলে স্বীকার করতে হবে পদপক্ষক অনুমানের ক্ষেত্রে অনুমানের পূর্বে সর্বদাই বাক্যার্থের বোধ থাকতেই হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বাক্যার্থবোধের পূর্বে বাক্যার্থের উপস্থিতি না থাকলেও বাক্যান্তর্গত বৃত্তিমৎ পদজন্য উপস্থিত (স্মৃত) পদার্থ থেকে বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, অভিনব বা অপূর্বশ্রুত বাক্য শ্রবণজন্যও বাক্যার্থের বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অভিনব বাক্যজন্য বাক্যার্থের অনুমিতি হতে পারে না। যেহেতু অনুমানকর্তার অনুমানের পূর্বে বাক্যার্থের জ্ঞান নেই তাই বাক্যার্থকে সাধ্যতার অবচ্ছেদকরূপে গ্রহণ করে সাধ্যের জ্ঞানও থাকতে পারে না। আর সাধ্যের জ্ঞান অনুমানের পূর্বে না থাকলে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞানও থাকতে পারে না। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবে অনুমানও সম্ভব নয়।[৪২] বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, দেবদত্ত এবং সোমদত্ত নামক দুজন ব্যাক্তির প্রথম জন 'গৌরস্তি' এই বাক্য পূর্ব শুনেছিলেন ফলে তিনি জানেন উক্ত বাক্যের বাক্যার্থ হল 'অস্তিত্ববিশিষ্ট গো'। পরবর্তীকালে দেবদত্ত যদি 'গৌরস্তি' এই বাক্য শ্রবণ করেন তাহলে তিনি 'গৌঃ'পদরূপ পক্ষে 'অস্তি'পদ সাকাঙ্ক্ষ 'গৌঃ'পদত্বরূপ হেতুর দ্বারা

[৪২] 'বাক্যার্থস্য অপূর্বত্বেন তদ্গর্ভসাধ্যস্য প্রায়শঃ প্রাগনুপস্থিত্যা অনুমানাযোগাচ্চ।' – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪০।

অস্তিত্ববিশিষ্ট-গোবিষয়ক-জ্ঞানপূর্বকত্ব সাধ্যরূপে সিদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। কারণ, দেবদত্তের অস্তিত্ববিশিষ্ট গোরূপ সাধ্যতার অবচ্ছেদকের জ্ঞান পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকায় অস্তিত্ববিশিষ্ট-গোবিষয়ক-জ্ঞানপূর্বকত্বরূপ সাধ্যের জ্ঞানও বিদ্যামান এবং হেতু 'অস্তি'পদ সাকাঙ্ক্ষ 'গৌঃ'পদত্বের সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানও বিদ্যমান। অপরদিকে, ধরা যাক সোমদত্ত 'গৌরস্তি' এই বাক্য কখনোই শোনেন নি। যদিও পৃথকভাবে 'অস্তি'পদ এবং 'গৌঃ'পদের অর্থবিষয়ে জ্ঞান তাঁর আছে। এখন তিনি যদি 'গৌরস্তি' বাক্য শ্রবণ করেন তাহলে তাঁর সাধ্যতার অবচ্ছেদক অস্তিত্ববিশিষ্ট গো – এর জ্ঞান না থাকায় সাধ্যের জ্ঞানও থাকতে পারে না। সাধ্যের জ্ঞান না থাকলে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির জ্ঞানও সম্ভব হবে না। সুতরাং, সোমদত্তের 'গৌরস্তি' এই বাক্য শ্রবণজন্য বাক্যার্থের বোধ হবে না। যদিও বাস্তবে তা হয় না। অভিনব বাক্য শ্রবণজন্য বাক্যার্থের বোধের উৎপত্তি হতেই দেখা যায়। এর বিরুদ্ধে বৈশেষিকগণ বলতে পারেন ন্যায়মতে বাক্যার্থবোধের প্রতি যোগ্যতা অর্থাৎ একপদার্থে অপর পদার্থবত্তা কারণ হওয়ায় যোগ্যতার জ্ঞান পূর্বে থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ, 'গৌরস্তি' ইত্যাদি বাক্যস্থলে গো ধর্মীতে অস্তিত্বের সম্বন্ধের জ্ঞান পূর্ব থেকে থাকলে 'অস্তিত্ববিশিষ্ট গো' – এইরূপ বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে, অন্যথায় নয়। অতএব স্বীকার করতে হবে সম্পূর্ণ অপূর্ববাক্যার্থবিষয়ক বাক্যার্থবোধ অর্থাৎ বাক্যস্থ বৃত্তিমৎ পদজন্য উপস্থিত সম্বন্ধরহিত পদার্থসমূহ হতে পৃথকশব্দপ্রমাণবাদিগণও বাক্যার্থবোধ স্বীকার করেন না। সুতরাং, অভিনব বাক্য শ্রবণজন্য বাক্যার্থবোধ সম্ভব নয় বলে বৈশেষিকগণের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়

তা পৃথকশব্দপ্রমাণবাদিগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলতে পারেন যোগ্যতার জ্ঞান বাক্যার্থবোধের কারণ হলেও যোগ্যতার জ্ঞানের দ্বারা বাক্যার্থের বোধ হয়ে যায় না। বাক্যার্থের বোধ বাক্য থেকেই হয়ে থাকে। যদি "গৌরস্তি" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণজন্য বাক্যার্থবোধের পূর্বেই বাক্যার্থবোধের কারণ যোগ্যতার জ্ঞানের দ্বারাই গো ধর্মীতে অস্তিত্বের সম্বন্ধের জ্ঞান অর্থাৎ অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো-এর জ্ঞান হয়ে যায় তাহলে, সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যের নিশ্চয় থাকায় গো পদে (পক্ষে) অস্তিত্ববদ্ গো-গোচর জ্ঞান পূর্বকত্বরূপ সাধ্যের অনুমিতি হতে পারে না। কারণ সাধ্যের নিশ্চয় অনুমিতির প্রতি প্রতিবন্ধক। অতএব পদপক্ষক অনুমানের দ্বারা অনুমানে বাক্যার্থবোধের অন্তর্ভূক্তি সম্ভব নয়।

অপরদিকে, বৈশেষিকগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে পদপক্ষক অনুমান প্রদর্শন করেছেন সেই অনুমানের হেতুরূপে 'আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভিঃ পদৈঃ স্মারিতত্বাৎ' এবং সাধ্যরূপে 'স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব'কে গ্রহণ করেছেন। এখন পদজন্য পদার্থের জ্ঞান অনুমিতিরূপে স্বীকার করলে 'আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব'কে হেতুরূপে বা 'স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব'কে সাধ্যরূপে গ্রহণ করা সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। কারণ, কোনো কোনো বৈশেষিক আচার্য পদজন্য পদার্থের স্মরণ স্বীকার না করে অনুমিতি স্বীকার করেছেন।[৪৩] এই সমস্যার সমাধানে বলা যেতে পারে

[৪৩] "তদর্থবিবক্ষয়া চার্থানুমানম্।" - প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, *পদার্থধর্মসংগ্রহ*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারণাসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫১৫।

উক্ত হেতু ও সাধ্যে উল্লিখিত 'স্মারিত' শব্দের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যারা পদার্থকে স্মৃতি বলেন তাঁদের সিদ্ধান্ত (অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত) গ্রহণ করে বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। যদিও পরবর্তীতে তাঁরা বিচারপূর্বক প্রদর্শন করেছেন যে পদজন্য পদার্থের জ্ঞান অনুমিতি, স্মৃতি নয়। তবে এইরূপ সমাধান সর্বজন সম্মত নাও হতে পারে। পদ জন্য পদার্থের জ্ঞান যদি অনুমিতি হয় তবে পদ ও পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তিরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। কেননা একই শব্দের ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থ বোঝানো হয় – এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সর্বদেশে সকলে সমানভাবে সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থই বুঝবে – এইরূপ কোনো নিয়ম নেই, তাই শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ কোনোভাবেই উপপন্ন হয় না।[৪৪]

---

[৪৪] "জাতিবিশেষে চানিয়মাৎ।।১/১/৫৬।।১১৭।।" – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০০০, *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৯৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পদার্থপক্ষক অনুমান ও তার খণ্ডন

পূর্বাধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গেল বৈশেষিকমতে পদপক্ষক অনুমানের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বাক্যার্থের বা, পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের অনুমিতি হয় না। সাক্ষাৎভাবে পদার্থ সংসর্গের অনুমান হয় পদার্থপক্ষক অনুমান স্থলে। বর্তমানে পদার্থপক্ষক অনুমান কতোটা গ্রহণযোগ্য সেই আলোচনায় আমরা প্রবেশ করবো। এই প্রসঙ্গে আমি সর্বপ্রথম পদার্থপক্ষক অনুমানের স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করবো বৈশেষিকগণ উক্ত অনুমানের দ্বারা বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেন কীভাবে। পরিশেষে বৈশেষিকের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকগণের অভিমত অনুধাবনে সচেষ্ট হব।

পদার্থপক্ষক অনুমানের আকারটি প্রদর্শন করতে গিয়ে বৈশেষিক বলেন – "এতে পদার্থাঃ মিথঃ সংসর্গবন্তঃ আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভি পদৈঃ স্মারিতত্বাৎ, গামভ্যাজ ইতি পদার্থবৎ"।[১] অর্থাৎ, এই পদার্থগুলি পরস্পর সংসর্গ বিশিষ্ট যেহেতু এগুলি আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিত। এখানে প্রযুক্ত (সামান্য) ব্যাপ্তির আকারটি হল – "যত্র যত্র আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভি পদৈঃ স্মারিতত্ব তত্র তত্র মিথঃ সংসর্গবন্তত্ব"। এই অনুমানের পক্ষ হল এই পদার্থগুলি, সাধ্য হল পদার্থ সমূহের পরস্পর সংসর্গ বিশিষ্টত্ব, এবং হেতু হল

[১] উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী*, নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কোলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃষ্ঠা: ৫৭২ – ৫৭৩।

আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব। দৃষ্টান্ত হল গামভ্যাজ ইত্যাদি পদার্থসমূহ। বৈশেষিক প্রদত্ত পদার্থপক্ষক অনুমানটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, পদার্থপক্ষক অনুমানের হেতু হল আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব। অর্থাৎ, আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদ উক্ত অনুমানের হেতু হয়নি, আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব হেতু হয়েছে।

উদয়নাচার্য তাঁর *'ন্যায়কুসুমাঞ্জলী'* শীর্ষক গ্রন্থে বৈশেষিকাচার্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত পদার্থপক্ষক অনুমানের সাধ্য বিষয়ে দুটি বিকল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে উক্ত অনুমানের সাধ্য বিষয়ক উভয় প্রকার বিকল্পই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে বৈশেষিকগণ যখন পদার্থসমূহের সংসর্গকে সাধ্য বলেন তখন তাঁরা উক্ত সংসর্গের নিশ্চয়কে অথবা সংসর্গের সম্ভাবনাকে সাধ্যরূপে বোঝাতে পারেন। সুতরাং, প্রশ্ন উঠতে পারে বৈশেষিকগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য যে পদার্থপক্ষক অনুমান প্রদর্শন করেন সেই অনুমানের সাধ্যরূপে পদার্থসমূহ পরস্পর সংসৃষ্টই হবে এইরূপ নিশ্চয়কে গ্রহণ করেন অথবা পদার্থসমূহের মধ্যে সম্ভাবিত সংসর্গকেই সাধ্যরূপে গণ্য করেন?[২] যদি পদার্থসমূহের সংসর্গের নিশ্চয়কে বৈশেষিকগণ শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্যরূপে গ্রহণ করেন তাহলে তা দোষদুষ্ট হবে। কারণ, অনাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পদসমূহ থেকে উপস্থিত পদার্থের মধ্যে সংসর্গ থাকে না। যেমন, কোন

---

[২] *"এতে পদার্থা মিথঃ সংসর্গবন্ত ইতি সংসৃষ্টা এবেতি নিয়মো বা সাধ্যঃ সম্ভাবিতসংসর্গা ইতি বা?'* – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৮।

ব্যক্তি শ্রোতাকে প্রতারিত করার জন্য যদি বলেন "নদী তীরে ফল রয়েছে" তা হলে, উক্ত বাক্যান্তর্গত পদ জন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গ থাকবে না। সুতরাং, পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গকে সাধ্য করলে উক্ত অনুমানে ব্যভিচার দোষ দেখা দেবে।[৩] অপরদিকে পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের সম্ভাবনাও উক্ত পদার্থপক্ষক অনুমানের সাধ্য হতে পারে না। কারণ, শাব্দবোধে পদজন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়ই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়ই বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধের ফল, নিশ্চয়ের সম্ভাবনা নয়। তাছাড়া, বৈশেষিকগণ শাব্দবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য "*আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভি পদৈঃ স্মারিতত্বাৎ*"রূপ যে হেতু প্রয়োগ করেন সেই হেতুর বিষয়ীভূত "আকাঙ্ক্ষাদি" পদের দ্বারা যোগ্যতাকেও বুঝিয়ে থাকেন। পরিষ্কারকার পঞ্চানন তর্করত্ন স্পষ্টতোই বলেছেন "*আদিনা যোগ্যতাপরিগ্রহঃ।*"[৪] অপরদিকে, চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যোগ্যতার স্বরূপ আলোচনায় দেখিয়েছি বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত এক পদার্থের সঙ্গে অপর পদার্থের সম্বন্ধের সম্ভাবনাই যোগ্যতা। সুতরাং, বৈশেষিক আচার্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত হেতুর বিষয়ীভূত "যোগ্যতা" শব্দের দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, "*আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভি পদৈঃ স্মারিতত্বাৎ*"-রূপ হেতুর দ্বারা সংসর্গের সম্ভাবনা

---

[৩] "*ন প্রথমতঃ, অনাপ্তোক্তপদকদম্ব স্মারিতৈরনৈকান্তাৎ।*" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,পৃষ্ঠা: ২৭৮।

[৪] তর্করত্ন, পঞ্চানন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, *পরিষ্কার, বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*-এর উপর, কলিকাতা: বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রোমেসিন প্রেস, পৃষ্ঠা: ৪৪৪।

সাধন করলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেবে। শঙ্কর মিশ্রও তাঁর *উপস্কার* টীকাতে অনুরূপ আপত্তির উত্থাপন পূর্বক তার নিরসনে সচেষ্ট হয়েছেন।[৫] এখানে বলা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য, শঙ্কর মিশ্র প্রমুখ আচার্যগণ পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়কে সাধ্যরূপে গণ্য করা যায় না – এইরূপ পূর্বপক্ষের উপস্থাপনার অনন্তর উক্ত প্রকার সংসর্গের সম্ভাবনাও সম্ভব নয় – এইরূপ পূর্বপক্ষের উপস্থাপন করেছেন। কারণ, তাঁদের অভিপ্রায় হল – কেউ কেউ মনে করতে পারেন পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয় শাব্দবোধের অনুমিতিত্ব সাধক অনুমানের সাধ্য না হলেও সংসর্গের সম্ভাবনা সাধ্য হতে পারে। তাই প্রথমে সংসর্গের নিশ্চয় পক্ষের উল্লেখের পর সংসর্গের সম্ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে। শঙ্কর মিশ্রও অনুরূপ ক্রমাবলম্বনে পূর্বপক্ষরূপে "*আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভি পদৈঃ স্মারিতত্ব*"-রূপ হেতুর দ্বারা যে সংসর্গ নিশ্চয়রূপ সাধ্য সিদ্ধ সম্ভব সেটি প্রদর্শন করেছেন এবং পরিশেষে সংসর্গের সম্ভাবনাও যে বৈশেষিকসম্মত সাধ্য হতে পারে না – এই অভিমত প্রতিষ্ঠাপূর্বক স্বমত স্থাপন করেছেন। কিন্তু, সংসর্গের নিশ্চয়কে সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠার পর সংসর্গের সম্ভাবনার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি প্রথমে সংসর্গের সম্ভাবনা খণ্ডনপূর্বক বৈশেষিকগণের অভিপ্রেত সংসর্গের নিশ্চয়কে কীভাবে শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সে বিষয়ে আলোকপাতে সচেষ্ট হয়েছেন। শঙ্কর মিশ্রের মতে সংসর্গের সম্ভাবনা নয়, সংসর্গের নিয়ম বা নিশ্চয়ই

[৫] "*নন্বেতে পদার্থাঃ সংসৃষ্টা এবেতি বা সাধ্যম্ সম্ভাবিতসংসর্গা ইতি বা?*" – শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*, নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৪৯৮।

শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্য। সংসর্গের সম্ভাবনাকে কেন সাধ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না সেই প্রশ্নে তিনি উদয়নাচার্যেরই অনুবর্তী হয়েছেন। তিনিও মনে করেন সম্ভাবনাকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেবে। কারণ, হেতুর বিষয়ীভূত "আকাঙ্ক্ষাদি" শব্দের দ্বারা যোগ্যতাকেও বোঝায়। আমরা দেখেছি যোগ্যতা বলতে বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত এক পদার্থের সঙ্গে অপর পদার্থের সম্বন্ধের সম্ভাবনাকে বোঝায়। ফলে, হেতুর বিষয়ীভূত "যোগ্যতা" শব্দের দ্বারাই সাধ্য (পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সম্ভাবনা) সিদ্ধি হয়ে যাওয়ায় পুনরায় সাধ্য সিদ্ধিরজন্য হেতু প্রয়োগ করলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেয়।[৬] সুতরাং, পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়ই শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্য। পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়কে সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলা যায়, পূর্বপক্ষিগণ কর্তৃক উত্থাপিত ব্যাভিচার দোষ অনাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বাক্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও আপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বাক্যের ক্ষেত্রে নয়।[৭] কিন্তু, প্রশ্ন হল – আপ্তরূপে আমরা কাকে গ্রহণ করবো? এর উত্তরে উপস্কারকার আপ্তের লক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কেবলমাত্র অপ্রতারক ব্যক্তি আপ্ত নয় কারণ, এমনও হতে পারে বক্তা প্রবঞ্চক না

---

[৬] "*ন দ্বিতীয়ঃ, যোগ্যতামাত্রসিদ্ধাবপি সংসর্গানিশ্চয়ান্নিষ্কম্পপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, যোগ্যতায়াশ্চ পূর্বমেব হেতুবিশেষণত্বেন জ্ঞাতত্বাত্ কিমনুমানেনেতি চেত্ ...... ।*" – শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার,* নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৪৯৯।

[৭] "*ননু নদীতীরে পঞ্চ ফলানি সন্তীত্যনাপ্তবাক্যে ব্যভিচারান্নেদমনুমানমিতি চেন্ন, আপ্তোক্তত্বেনাপি বিশেষণাত্, ... ।*" – শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার,* নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৪৯৭।

হলেও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান তাঁর নেই। তাই উক্ত ব্যক্তির বাক্য থেকে শ্রোতা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন না। তাঁর মতে বক্তা যে বাক্য প্রয়োগ করছেন সেই বাক্যার্থ বিষয়ে যদি প্রকৃত জ্ঞানবান হন এবং তিনি যদি প্রবঞ্চক না হন তাহলেই তাঁকে আপ্তবক্তারূপে গণ্য করা হবে, অন্যথায় নয়।[৮] *ন্যায়-সূত্রভাষ্যে* বাৎস্যায়নও আপ্তের লক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে অনুরূপ অভিমতই পোষণ করেছেন। তাঁর মতে যিনি সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা পদার্থকে জেনেছেন এবং যে রূপে পদার্থকে জেনেছেন সেইরূপেই উপদেশ করেন অর্থাৎ যিনি প্রবঞ্চক নন এবং যথার্থরূপে উপদেশের সামর্থ্যও যার আছে তিনিই আপ্ত।[৯] চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই বর্তমানে আপ্তবিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা থেকে নিবৃত্ত হলাম।

উদয়নাচার্য পূর্বোক্ত প্রকার সমাধানের সম্ভাবনা অনুধাবন করেছিলেন এবং উক্ত সমাধানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, কোন একজন বক্তা যখন বাক্য প্রয়োগ করেন তখন তাঁর বাক্য শ্রবণপূর্বক বাক্যার্থ উপলব্ধির পূর্বে শ্রোতার পক্ষে বক্তার আপ্তত্ব নিশ্চয় সম্ভব নয়। ফলে "আপ্তোক্তত্ব"কে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করলে বাক্যার্থ বোধের পূর্বে অর্থাৎ, সাধ্য সিদ্ধির পূর্বে আপ্তোক্তত্বের জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় হেতুর বিশেষণের জ্ঞান সম্ভব হবে না। বিশেষণের জ্ঞান সম্ভব না হলে বিশেষণ বিশিষ্ট

---

৮ "*আপ্তত্ব হি প্রকৃতবাক্যার্থগোচরযথার্থবাক্যার্থজ্ঞানবত্ত্বং ন ত্বপ্রতারকত্বমাত্রম্।*" – শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*, নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৪৯৬।

৯ "*আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা।*" – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১, *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ১৮৯।

বিশেষ্যরূপ হেতুর জ্ঞানও সম্ভব হবে না। ফলে উক্ত হেতুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধিই সম্ভব হবে না। সুতরাং, আপ্তোক্তত্বকে পদার্থসমূহের সংসর্গবোধের সাধক হেতুর বিশেষণরূপে গণ্য করা যায় না।[১০] আর স্থল বিশেষে যদি আমরা কোন একজন বিশেষ বাক্যের বক্তাকে আপ্তরূপে গণ্যও করি, যেমনটি উপস্কারকার পরবর্তীকালে প্রদর্শন করেছেন, তাহলেও ব্যভিচারের আশঙ্কা থেকেই যায়। যেমন, সাধারণত আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে তাঁদের বক্তব্য বিষয়ে অভ্রান্ত বা আপ্তরূপে গণ্য করি।[১১] তবে অনেক সময় দেখা যায় তাঁদের বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের অভাব রয়েছে। তবে এমন নয় যে তাঁরা কখনোই কোন বিষয়েই আপ্ত নন। অনেক বিষয়েই তাঁরা আপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি যাঁরা আধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয়ে থাকে তাঁরাও কোন কোন সময় আপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু, অসর্বজ্ঞ পুরুষমাত্রেরই যেহেতু ভ্রান্তি হতে পারে তাই ভ্রান্তি বশতঃ তাঁরা কোন একটি বাক্য বিষয়ে অনাপ্ত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রযুক্ত বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের অভাব থাকায়

---

[১০] "*আপ্তোক্ত্যা বিশেষণিয়মিতি চেন্ন, বাক্যার্থপ্রতীতেঃ প্রাক্ তদসিদ্ধেঃ।*" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৮।

[১১] "*অয়মত্রাভ্রান্ত ইতি সামান্যতো গ্রহণসম্ভবাৎ, ... ।*" – শঙ্কর মিশ্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), কলিকাতা: বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রোমেসিন প্রেস, পৃষ্ঠা: ৪৪২।

নারায়ণ মিশ্র সম্পাদিত *উপস্কারে* "অয়মত্রোভ্রান্ত" – এইরূপ পাঠ লক্ষ্য করা যায়। যা সঠিক নয় বলেই মনে হয়।

ব্যভিচার দোষ দেখা দেবে। সুতরাং, সামান্যতঃ আপ্তত্ব নিশ্চয়ের মাধ্যমে হেতুর নিশ্চয়ের যে উপায় বৈশেষিকগণ প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।[১২]

বিশিষ্ট নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর *শব্দশক্তি প্রকাশিকা* শীর্ষক গ্রন্থে এই পদার্থপক্ষক অনুমানটিকেই ভিন্ন এক আকারে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বিশেষ ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। পদার্থপক্ষক অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এই আকারটি অভিনবত্বের দাবী রাখে, তাই এখানে জগদীশ প্রদত্ত আকারটি উল্লেখ করা হল: – "গৌরস্তিতাবান্ স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্বাত্ ঘটবত্, অস্তিপদসমভিব্যাহৃতগৌঃপদস্মারিতত্বাদ্ বা চক্ষুর্বদিত্যাদ্যনুমানত এবাস্ত্বন্বয়ধিয়োঽন্যথাসিদ্ধিঃ" – এইরূপ অনুমানের দ্বারা গো প্রভৃতি ধর্মীতে অস্তিত্বের অনুমিতি সম্ভব হওয়ায় অনুমিতির অতিরিক্ত বাক্যার্থবোধ নামক পৃথক প্রমিতি স্বীকার ব্যর্থ।[১৩] বৈশেষিক সম্মত এইরূপ অনুমানের দ্বারা গো পদার্থরূপ পক্ষে অস্তিত্বরূপ সাধ্য অনুমিত হয় বলে উক্ত অনুমানটি পদার্থপক্ষক অনুমানরূপে প্রসিদ্ধ। উক্ত অনুমানের হেতু হয়েছে, স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্ব। "স্ব" পদের দ্বারা গো প্রভৃতি ধর্মীকে বোঝান হয়েছে। "স্বধর্মিকাস্তিত্ব"-এর দ্বারা অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো বুঝতে হবে। অর্থাৎ অস্তিত্বটি গো প্রভৃতি ধর্মীর বিশেষণ। গো প্রভৃতি ধর্মীতে অস্তিত্বরূপ

---

[১২] "*ন হ্যবিপ্রলম্ভকত্বমাত্রমিহাপ্তশব্দেন বিবক্ষিতং, তদুক্তেরপি পদার্থসংসর্গব্যভিচারাৎ।*" – উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৮।

[১৩] জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৪।

বিশেষণের যে অন্বয় সেই অন্বয়বোধের জনক যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় হল "গো" পদ এবং "অস্তি" পদ। উক্ত পদের দ্বারা গো পদার্থ ও অস্তিত্ব পদার্থ স্মারিত হওয়ায় গোরূপ পক্ষে স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্বরূপ হেতুটি বিদ্যমান থাকায় তার দ্বারা গোরূপ পক্ষে অস্তিত্বরূপ সাধ্য অনুমিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাপ্তির আকারটি হলো: – "যঃ স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়–বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্ববান্ সোঽস্তিত্ববান্" যথা:– ঘট (অন্বয় দৃষ্টান্ত)। অস্তিত্বের সঙ্গে উক্ত হেতুর ব্যাপ্তি ঘটাদি পদার্থে দৃষ্ট হয় বলে এখানে দৃষ্টান্তরূপে ঘটের উল্লেখ করা হয়েছে। মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রথম অনুমান প্রদর্শন করার পর অস্তিপদ সমভিব্যাহৃত গৌঃ পদস্মারিতত্বকে হেতুরূপে এবং চক্ষুকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে শাব্দবোধের অনুমিতিত্বসাধক "অস্তিপদসমভিব্যাহৃতগৌঃ পদস্মারিতত্বাৎ চক্ষুর্বৎ" – এইরূপ অনুমানান্তর প্রদর্শন করেছেন। এখানে গৌঃ পদস্মারিতত্বমাত্রকে হেতু বুঝতে হবে, সমভিব্যাহৃতত্ব অংশ উপলক্ষণরূপে গৃহীত হবে।[১৪] এখন প্রশ্ন হতে পারে, গ্রন্থকার কী কারণে প্রথম অনুমান প্রদর্শন করার পর দ্বিতীয় অনুমানটির উপস্থাপনা করলেন? তার উত্তরে বলা যায়, প্রথম অনুমান হতে দ্বিতীয় অনুমানটি বিলক্ষণ। প্রথম অনুমানটি (যে স্বধর্মিক অস্তিত্বের অন্বয়বোধের অনুকূল পদ হতে উপস্থাপিত হবে, সে অস্তিত্ববিশিষ্ট

[১৪] 'উপলক্ষণ' শব্দের অর্থ হল পরিচায়ক। যা বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত না হয়েও ইতরব্যবর্তক, তা উপলক্ষণ। যেমন 'কাকৈর্গৃহং পশ্য (কাকযুক্ত গৃহকে দেখ) এস্থলে কাক গৃহের অঙ্গীভূত পদার্থ না হওয়ায় বিশেষণ নয়, কিন্তু উপলক্ষণ; যেহেতু কাক গৃহের অঙ্গ না হয়েও অন্য গৃহ থেকে উপলক্ষিত গৃহের ভেদবুদ্ধি জন্মাচ্ছে। আবার 'স্বগ্রাহকত্বে সতি স্বেতরগ্রাহকত্বম্ উপলক্ষণম্' অর্থাৎ যে নিজের এবং নিজ থেকে ভিন্নেরও গ্রাহক হয়, তাকে উপলক্ষণ বলে। যেমন 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' এস্থলে 'কাক' পদটি কাক ও তদিতর কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি দধ্যুপঘাতক প্রাণীকে বোঝায়।

হবে – এইরূপ) সামান্য ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক; আর দ্বিতীয় অনুমানটি সামান্য ব্যাপ্তিগ্রহমূলক নয়, বরং সাধ্য ও হেতুবিশেষের বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক। ফলতঃ দ্বিতীয় অনুমানস্থলে ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকূল তৃতীয় অবয়ব নিদর্শন বাক্যটি হবে – 'যঃ যঃ অস্তিপদসমভিব্যাহৃত গৌঃ পদস্মারিতত্ববান্ সঃ সঃ অস্তিতাবান্ যথা চক্ষুঃ'। এখানে আশঙ্কা করা যেতে পারে, চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ে অস্তিপদ সমভিব্যাহৃত গৌঃ পদস্মারিতত্বরূপ হেতুটি কীভাবে থাকবে? যদি তা না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ ঘটবে। এর উত্তরে বলা যায়, 'গো' শব্দটি ক্ষেত্রেবিশেষে বিবিধ অর্থের বোধক হয়ে থাকে। কোষে 'গো' শব্দটি পশুবিশেষ, সূর্য, চন্দ্র, বাণী, দিক্, ভূমি, মাতা, কিরণ, চক্ষু, জল, যাগবিশেষ, গায়ত্রী প্রভৃতি নানা অর্থের বাচকরূপে উল্লিখিত হয়েছে। অমরকোষেও বলা হয়েছে 'দিঙ্ নেত্র ঘৃণি ভূজলে'। সুতরাং 'গো' শব্দের বাচ্য যেমন পশুবিশেষ (গরু) তেমনি চক্ষুরিন্দ্রিয় হওয়ায় 'গো' পদ দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপস্থিতি অর্থাৎ স্মৃতি হবে। ফলে অস্তিপদসমভিব্যাহৃত গৌঃ পদস্মারিতত্ব হেতুটি যেমন গরু নামক পশুবিশেষে থাকে, তেমনি চক্ষুরিন্দ্রিয়েও থাকায় তাদৃশ স্মারিতত্ব হেতুটি দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হবে না। উক্তপ্রকার সামান্যানুমান ও বিশেষানুমানের দ্বারাই যখন 'গৌরস্তি' ইত্যাদি স্থলীয় অন্বয়বুদ্ধির উৎপত্তি হতে পারে তখন অন্বয়বুদ্ধিকে অনুমিতিত্বরূপ বিজাতীয় প্রমিত্যান্তর বলে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং বৈশেষিক মতে অনুমানের দ্বারা অন্বয়বোধ অন্যথাসিদ্ধ হয়।

বৈশেষিক সম্মত অর্থপক্ষক অনুমানটি নৈয়ায়িকগণ যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে গোরূপ পক্ষে হেতু তাদৃশ পদস্মারিতত্বের অর্থাৎ পদ জন্য স্মৃতিবিষয়ত্বের অভাব নিশ্চয় থাকলেও "গৌরস্তি" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ জন্য বাক্যার্থের বোধ হয়ে থাকে।[১৫] কিন্তু, বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলে তা সম্ভব নয়। কারণ, অনুমিতি উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণরূপে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ অপেক্ষিত। পরামর্শের কারণরূপে পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। পক্ষে হেতুর জ্ঞান না থাকলে "হেতুমান্ পক্ষ" – এই আকারের পক্ষধর্মতার জ্ঞান হতেই পারে না। পক্ষধর্মতার জ্ঞান না থাকলে ব্যাপ্তি স্মরণ এবং ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ উৎপন্ন হবে না। ফলে সাধ্যের অনুমিতি হবে না। আলোচ্য স্থলে গোরূপ পক্ষে হেতু তাদৃশ পদ জন্য স্মৃতিবিষয়ত্বের অর্থাৎ পদস্মারিতত্বের অভাব নিশ্চয় কালে উক্ত হেতু ও পক্ষকে অবলম্বন করে পক্ষধর্মতার জ্ঞান হবে না। পক্ষধর্মতার জ্ঞান পূর্বে না থাকলে ব্যাপ্তি স্মৃতি ও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না।[১৬] পরামর্শের অভাব জন্য "গৌরস্তি" এই বাক্য থেকে "অস্তিত্ববান্ গো" এইরূপ অনুমিতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পক্ষধর্মতাজ্ঞানের অভাবের কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে নৈয়ায়িকগণ বলেন, "গৌরস্তি" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ জন্য "অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো"রূপ

---

[১৫] "তন্ন, গবাদেঃ পদস্মারিতত্বাদ্যভাবগ্রহদশায়াম্ উৎপন্নস্য গৌরস্তি ইত্যাদ্যন্বয়বোধস্য উক্তহেতুনাপি অনিষ্পত্তেঃ।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৮।

[১৬] উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯৭, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (ভল্যুম – IV) শব্দখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি '*রহস্য* বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), কলিকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোস্যাইটি অফ বেঙ্গল, পৃষ্ঠা: ৩৯ -৪০।

বাক্যার্থের বোধ হয়ে থাকে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত বাক্যার্থবোধের প্রতি বাক্যান্তর্গত পদ জন্য পদার্থের স্মৃতি করণ হলেও সেটি অজ্ঞায়মান হয়েই বাক্যার্থবোধের করণ হয়ে থাকে, জ্ঞায়মান হয়ে নয়। অর্থাৎ, বাক্যার্থবোধের পূর্বে আমাদের এইরূপ বোধ হয় না যে বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থগুলি স্মৃত। পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের স্মৃতি হওয়া আর 'উক্ত পদার্থগুলি স্মৃত' – এই বোধ হওয়া এক বিষয় নয়। প্রথমটি স্মৃতিরূপ জ্ঞান কিন্তু, দ্বিতীয়টি স্মৃতিরূপ জ্ঞানের জ্ঞান (অনুব্যবসায়)। প্রথম জ্ঞানের বিষয় এবং কারণ সমূহের মধ্যেও প্রভেদ বিদ্যমান। প্রথম জ্ঞানের বিষয় বাক্যান্তর্গত "গো" ইত্যাদি পদ যে গো ইত্যাদি পদার্থকে বোঝায় সেই পদার্থ। এবং এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সংস্কারাদি কারণ। অপরদিকে দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় হল স্মৃতিরূপ জ্ঞান। সুতরাং, পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের বোধ (স্মৃতি) হওয়া এবং উক্ত বোধ যে স্মৃতি – এইরূপ বোধ এক বিষয় নয়। তাই বাক্যান্তর্গত পদ জন্য পদার্থের বোধ হলেও উক্ত বোধ যে স্মৃতি এইরূপ বোধ হয় না। কারণ, বাক্যার্থবোধের প্রতি পদ জন্য পদার্থের স্মৃতি কারণ হলেও সেটি জ্ঞাত রূপে কারণ নয়। অপরদিকে অনুমিতির প্রতি হেতু স্বরূপসৎরূপে কারণ নয়, জ্ঞাত রূপেই কারণ। সুতরাং, বৈশেষিক মতানুসারে "গৌরস্তি" এই বাক্য শ্রবণ জন্য গো প্রভৃতি অর্থে অস্তিত্বাদির অনুমিতি স্বীকার করলে মেনে নিতে হবে যে গো প্রভৃতি অর্থে (পক্ষে) পদ জন্য স্মৃতি বিষয়ত্বের জ্ঞান (হেতুর জ্ঞান) আছে। কিন্তু,

আমরা দেখলাম উক্ত প্রকার জ্ঞান থাকে না। তাই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।[১৭]

পূর্বোক্ত দোষ পরিহারের জন্য বৈশেষিকগণ বলতে পারেন না যে বাক্যার্থবোধের প্রতি পদার্থ স্মৃতি কারণ নয়, জ্ঞায়মান পদার্থ স্মৃতি কারণ। বৈশেষিকমতে এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিকূল কোন প্রমাণ নেই। তাই বাধক প্রমাণাভাবকে জ্ঞায়মান পদার্থস্মৃতিগত কারণতার অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে, নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক প্রদত্ত উক্ত যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে বৈশেষিকগণের উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পদজন্য স্মৃতিবিষয়ত্বের অভাব থাকা কালেও ভ্রমাত্মক তাদৃশ পদজন্য পদার্থস্মৃতিবিষয়ত্বের জ্ঞান থেকে বৈশেষিকমতে অন্বয়বোধের আপত্তি হবে। যেমন, 'গো' প্রভৃতি পদার্থ 'গো' ইত্যাদি পদজন্য স্মৃতির বিষয় না হলেও ভ্রম বশতঃ আমাদের এইরূপ বোধ হতে পারে 'গো' প্রভৃতি অর্থ 'গো' ইত্যাদি বৃত্তিমৎ পদজন্য উপস্থিত হয়েছে। এই জ্ঞানটি ভ্রমাত্মক হলেও এটি জ্ঞায়মান পদার্থস্মৃতি হওয়ায় এই ভ্রমাত্মক স্মৃতিবিষয়ত্ব থেকে অন্বয়বোধের আপত্তি হবে।[১৮] অতএব বৈশেষিক সম্মত অর্থপক্ষক অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[১৭] "পদজন্যা হি পদার্থস্মৃতিঃ, স্বরূপসত্যেবান্বয়বুদ্ধৌ উপযুজ্যতে, ...।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৮।

[১৮] "...... ন তু জ্ঞাতা; প্রমাণাভাবাৎ, পদৈঃ অস্মারিতস্যাপি তৎস্মারিতত্বগ্রহদশায়াম্ অন্বয়ধীপ্রসঙ্গাচ্চ।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৮।

বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে পদার্থপক্ষক অনুমান প্রদর্শিত হয়েছে সেই অনুমানের হেতুরূপে 'গোধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্ব' গ্রহণ করেছেন। এখন পদজন্য পদার্থের জ্ঞানকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলে 'গোধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্ব' হেতুরূপে গ্রহণ করা সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখেছি কোনও কোনও বৈশেষিক আচার্যগণ পদজন্য পদার্থের স্মরণ স্বীকার না করে অনুমিতি স্বীকার করেছেন। পদপক্ষক অনুমানের আলোচনা কালে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দেখানো হয়েছিল যে "স্মারিতত্ব"কে হেতুর অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত নয়। পদার্থপক্ষক অনুমানেও স্মরিতত্ব হেতুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনুরূপ আপত্তি বর্তমান স্থলেও প্রাসঙ্গিক। এই সমস্যার সমাধানে বৈশেষিকগণ যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়েও সংশয়ের অবকাশ রয়েছে; যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ)

নৈয়ায়িক কর্তৃক বৈশেষিক সম্মত বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্বের প্রতিপাদক পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক অনুমানের বিরুদ্ধে পৃথক্ পৃথক্ আপত্তি নিয়ে আলোচনার পর সামান্যতঃ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলে কীরূপ সমস্যার উদ্ভব হয় তা আলোচনা করে দেখা যাক্। অর্থাৎ সামান্যতঃ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতি স্বীকার পক্ষে কি

কি অসুবিধা আছে তা আলোচনাপূর্বক বৈশেষিক পক্ষ থেকে তার কোনও সমাধান প্রদান করা সম্ভব কি না তাও আলোচনা করে দেখতে হবে।

বাক্যার্থের জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক – এই পক্ষের বিরুদ্ধে প্রথমেই বলা চলে যে, পরার্থানুমান নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায় স্বীকৃত। প্রাচীন ন্যায় দর্শনে অবয়বগুলির স্বরূপ আলোচিত হলেও সেই অবয়ব সমুদয় রূপ ন্যায়বাক্য শ্রবণ জন্য অনুমানের উৎপত্তি কীরূপে হয় সেই প্রক্রিয়া সম্যকভাবে আলোচিত হয়নি। সেই আলোচনা আমরা পাই প্রখ্যাত নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের "*তত্ত্বচিন্তামণি*" নামক গ্রন্থে। বৈশেষিক দর্শনে বাক্যার্থবোধ অনুমিত্যাত্মক বলে স্বীকৃত। পরার্থানুমানের স্থলে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হওয়ার কথা বৈশেষিকগণও স্বীকার করে থাকেন। "বাক্যার্থবোধ অনুমিতি" বৈশেষিকগণের এই মত স্বীকার করলে কিন্তু পঞ্চাবয়বের অন্তর্গত প্রতিটি বাক্য শ্রবণজন্য পৃথক্ পৃথক্ অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই পঞ্চ বাক্যের সমুদয় রূপ যে ন্যায়বাক্য তা শ্রবণজন্য অতিরিক্ত অনুমান উৎপন্ন হয় এই কথা স্বীকার করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরার্থানুমানের উৎপত্তির প্রক্রিয়া কীরূপ জটিল হবে তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এইরূপ আলোচনা কোনও বৈশেষিক গ্রন্থে করা হয়ে থাকলেও সেইরূপ আলোচনা অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় পরার্থানুমানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। বর্তমানে এইটুকু বলাই সম্ভব যে, বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মত স্বীকার করলে তাকে অত্যন্ত জটিল বলেই স্বীকার করতে হবে।

বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিবিশেষ বলে গ্রহণ করলে আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, অনুমিতির ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞান কারণরূপে আবশ্যক নয়; যা বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। উপরন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি আবশ্যক যা বাক্যার্থবোধস্থলে অপ্রয়োজনীয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বাক্যার্থবোধ এবং অনুমিতি উভয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী আবশ্যক। বাধাভাব অনুমিতির কারণকূটের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কারণ বাধ হলো অনুমিতির প্রতিবন্ধক। কিন্তু বাধ শাব্দবোধের প্রতি প্রতিবন্ধক না হওয়ায় তার অভাবকে শাব্দবোধের কারণ বলে স্বীকার করা হয় না। নৈয়ায়িক মতে অনুমিতি উৎপত্তির প্রক্রিয়াই যে কেবলমাত্র বাক্যার্থবোধ উৎপত্তির প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন তা নয়, উভয়ের কারণকূট, করণ অংশেও প্রভেদ বর্তমান। সেই বিষয়টি নৈয়ায়িক সম্মত অনুমান ও শব্দ প্রমাণের আলোচনা থেকেই যে স্পষ্ট তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাক্যার্থবোধ স্বরূপ অংশেও যে অনুমিতির থেকে ভিন্ন তা পরবর্তী অধ্যায়ে ন্যায়মতের পক্ষে সাধক যুক্তির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে বাক্যার্থবোধকে কি অনুমিতিরূপে গণ্য করা সঙ্গত? এছাড়াও বাক্যার্থবোধ যে অনুমিতিবিশেষরূপে সর্বথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না – এর সপক্ষে বিবিধ যুক্তি উপস্থাপন করার অবকাশ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ -

প্রশ্ন উঠতে পারে শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলে স্বীকার না করেও শব্দের মাধ্যমেই নিজ পক্ষ সাধন করার চেষ্টা – এটি কি বৈশেষিক পক্ষে এক অর্থে

স্ববিরোধিতা নয়? তাছাড়া কেবলমাত্র আগমগম্য পদার্থ (যথাঃ অদৃষ্ট, অপ্সরা, অমরাবতী, উত্তরকুরু,[১৯] সপ্তদ্বীপ, সমুদ্র, স্বর্গ, যথাসন্নিবিষ্ট ভূলোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি লোকসন্নিবেশ ইত্যাদি) –এর ক্ষেত্রে বৈশেষিকের মত কি হবে? আগম বা, শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার না করে নিলে সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান আমরা কীরূপে লাভ করতে পারি, তার সঠিক ব্যাখ্যা বৈশেষিক পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা সেই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়।

[১৯] উত্তরকুরু জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।১৪) উত্তরকুরুর উল্লেখ আছে। রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে (৩৯।১৮), কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৫৩।৩৭।৩৮) উত্তরকুরুর উল্লেখ আছে। মহাভারত ভীষ্মপর্বে আছে (পঞ্চম অধ্যায়)। সুমেরুর উত্তর ও নীল পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরকুরু অবস্থিত। হরিবংশে আছে – "ততোহর্ণবং সমুত্তীর্য্য কুরূনপ্যুত্তরান্ বয়ং। ক্ষণেন সমতিক্রান্তা গন্ধমাদনমেব চ।।" (১৭০।১০)। এর দ্বারা বোঝা যায়, সমুদ্রতীর হতে গন্ধমাদন পর্বত পর্যন্ত সমুদয় ভূখণ্ড উত্তরকুরু। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আছে – "তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।" (৪০।৫৪)। – ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০০০ *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৮৪।

সপ্তম অধ্যায়

বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়মতের পক্ষে সাধক যুক্তি

বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হয়েছে তার অংশবিশেষে বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়পক্ষের কোনও কোনও সাধকযুক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা সেবিষয়ে মনোনিবেশ করতে চলেছি। ইতিপূর্বে নৈয়ায়িকসম্মত অনুমান ও শাব্দবোধের আলোচনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে উভয় জ্ঞানের প্রক্রিয়া অংশে তফাৎ আছে, এমনকি করণ ও কারণকূট অংশেও বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমানে আমরা উভয় জ্ঞানের স্বরূপাংশে যে ভেদ আছে সেই বিষয় উল্লেখ করবো। যেমন, 'ঘটাদন্যঃ' এইরূপ বাক্যস্থলে পঞ্চম্যন্ত 'ঘট' পদের পর প্রথমান্ত 'অন্য' পদের প্রয়োগ হয়েছে। ফলে আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞানজন্য ঘটগত প্রতিযোগিতার নিরূপক যে ভেদস্বরূপ 'অন্যত্ব' সেই অন্যত্বকে বিশেষণ করে তার আশ্রয়ের অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যত্বের আশ্রয় হল বিশেষ্য। তবে এই আশ্রয়টি যে কোন্‌টি তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না বলে উক্ত বিশেষ্যের কোন অবচ্ছেদক স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ উক্ত বিশেষ্যটি নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতারূপে প্রতীয়মান হবে।

ফলে 'ঘটাদন্যঃ' বাক্যজন্য শাব্দবোধটি নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক হবে।[১] কিন্তু অনুমিতি কখনোই নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক হয় না। কিন্তু, 'ঘটাদন্যঃ' এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হলে তা হতে 'ঘটভিন্ন' বা 'ঘটভেদবিশিষ্ট' – এইরূপ শাব্দবোধে পটাদি পদার্থ বিষয় হলেও পটত্বাদিরূপে বিষয় হয় না। কারণ, পটাদি পদার্থের উপস্থাপক কোনও শব্দ (পটাদি শব্দ) এই বাক্যে নেই। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' – এই বাক্যের অর্থ (ঘটভেদবিশিষ্ট) বিশেষণ হওয়ায় এখানে বিশেষ্য বাচক পটাদিপদ অধ্যাহার করতে হয়। নিয়ম হল, যে ধর্মরূপে যে পদার্থ কোন পদের দ্বারা উপস্থিত হয়, সেই ধর্মরূপে সেই পদার্থই শাব্দবোধের বিষয় হয়। উক্ত স্থলে 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যে পট পদ নেই। সুতরাং পটত্বাদিরূপে পটাদি পদার্থ এখানে কোনোভাবেই উপস্থিত হতে পারছে না এবং পটত্বাদিরূপে পটাদি পদার্থও শাব্দবোধের বিষয় হতে পারে না। এই পটাদি পদার্থবিষয়ক শাব্দবোধে পটত্বরূপ ধর্মের দ্বারা পটপদার্থ অবচ্ছিন্ন না হওয়ায় এই বোধ নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক শাব্দবোধই হবে। কিন্তু অনুমিতির বিশেষ্য সবসময় বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবেই। যেমন – 'পর্বতো বহ্নিমান্' – এই অনুমিতিতে পর্বতে বহ্নি বিশেষণরূপে বিষয় হওয়ায় পর্বত হয় বিশেষ্য, আর পর্বতত্ব হয় বিশেষ্যতার অবচ্ছেদক। এখানে পর্বতত্ব ধর্মবিশিষ্ট পর্বতে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের জ্ঞান হয় বলে পর্বতত্বরূপেই পর্বতে বহ্ন্যনুমিতি হয়; কেবল 'বহ্নিমান্' –এরূপ অনুমিতি কখনও হয় না। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' –এই বাক্যের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন

---

[১] "কিঞ্চ ঘটাদন্য ইত্যাদি বাক্যাদ্ ঘটপ্রতিযোগিতাকান্যত্বাদিপ্রকারেণ নিরবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাকো ঘটান্যস্য বোধঃ সর্বজনসিদ্ধঃ, ...।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৯।

বিশেষ্যতাক শাব্দবোধ অনুমানের দ্বারা কিছুতেই নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। কেবল 'বহ্নিমান্' –এরূপ অনুমিতি যেমন অসম্ভব, তেমনি কেবল 'ঘটভেদবিশিষ্ট' – এইরূপ অনুমিতিও অসম্ভব। অনুমিতি পক্ষেই হয়ে থাকে এবং অনুমানবাক্যে পক্ষ (বিশেষ্য) পদের উল্লেখ থাকায় তা অনুমিতিতে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক পর্বতত্বাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবেই। সুতরাং শব্দপ্রমাণকে অনুমান হতে অতিরিক্ত প্রমাণরূপেই স্বীকার করতে হয়।

বৈশেষিকগণ বলতে পারেন 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্য থেকে শাব্দবোধের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যজন্যবোধকে অনুমিতির অন্তর্ভাব প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, বৈশেষিকগণের অভিপ্রায় হল – বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব প্রতিষ্ঠার বাধক দৃষ্টান্তরূপে নৈয়ায়িকগণ যে বাক্য প্রদর্শন করেছেন সেই বাক্যের দ্বারা বাক্যার্থবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রদর্শিত না হলে পূর্বোক্ত আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং নৈয়ায়িকগণকে 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যজন্য বাক্যার্থবোধের স্বরূপ ব্যক্ত করতে হবে।

বৈশেষিকগণের উক্তপ্রকার অভিপ্রায় উপলব্ধি করেই নৈয়ায়িকগণ বলেন পঞ্চম্যন্ত 'ঘট' ইত্যাদি সাকাঙ্ক্ষপদোত্তর 'অন্য' পদ প্রয়োগজন্য আকাঙ্ক্ষাদিজ্ঞানত্বপুরস্কারে 'ঘটপ্রতিযোগিতাক অন্যত্বপ্রকারক তদাশ্রয় বিশেষ্যক বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হতে পরে। এক্ষেত্রে বাক্যার্থবোধে বিশেষ্যটি কোন অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়নি। ফলে নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ন্যায় এবং বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে, নিরবচ্ছিন্ন

বিশেষ্যতাক অনুমিতি স্বীকার করা যায় না। বৈশেষিকগণ নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক অনুমিতি স্বীকার না করায় 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যস্থলে উৎপন্ন নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক অন্বয়বোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই 'বাক্যার্থবোধ অনুমিতি' বৈশেষিকগণের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।[২] এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, পঞ্চম্যন্ত ঘটপদসাকাঙ্ক্ষ অন্যপদস্মারিতত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করে ভেদত্বপুরস্কারে ভেদে (পক্ষে) ঘটপ্রতিযোগিতাকত্ব সিদ্ধ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে অনুমানের আকারটি হবে 'ভেদো ঘটপ্রতিযোগিতাকঃ পঞ্চম্যন্তঘটপদসাকাঙ্ক্ষান্যপদস্মারিতত্বাৎ'। সুতরাং বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত প্রমিতিরূপে স্বীকার করা অনাবশ্যক; এটি অনুমিতিরই অন্তর্ভুক্ত।

বৈশেষিকগণের এইরূপ অভিপ্রায় কল্পনা করে নৈয়ায়িকগণ বলতে পারেন পূর্বোক্ত প্রকার অনুমানের দ্বারাও বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ, 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি স্থলে ঘটপ্রতিযোগিতাকভেদবান্-এইরূপে যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় সেই শাব্দবোধে ঘটপ্রতিযোগিতাক ভেদ বা অন্যত্ব প্রকার হয়ে থাকে। ফলে উক্ত বোধে ভেদ বা অন্যত্বটি নিরবচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ শুদ্ধরূপে ভাসমান হয়। তাই উক্ত অনুভবে শুদ্ধ ঘটান্যত্বপ্রকারে ঘটান্যের অর্থাৎ পটাদির বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু 'ভেদো ঘটপ্রতিযোগিতাকঃ' ইত্যাদি অনুমিতিতে ভেদ বা অন্যত্বটি নিরবচ্ছিন্নরূপে ভাসমান হয়

[২] "স চাস্মাকং তাদৃশানুপূর্বীকপদজ্ঞানত্বেন তথাবিধান্বয়বোধং প্রতি হেতুত্বাদুপপদ্যতে।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৯।

না, ভেদত্বপুরস্কারে ভেদ বা অন্যত্বই ভাসমান হয়। সুতরাং ‘ঘটাদন্যঃ’ ইত্যাদি স্থলে উৎপন্ন বোধকে অনুমিতিরূপে গণ্য করা যাবে না।[৩] উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৈশেষিক পক্ষ অবলম্বন করে বলা যেতে পারে ‘ঘটাদন্যঃ’ ইত্যাদি বাক্য থেকে কোন বিশিষ্টবোধই উৎপন্ন হয় না। তাঁদের মতে, ‘অন্য’ পদটি শক্ত নয়, লাক্ষণিক পদ। এই লাক্ষণিক পদের দ্বারা ঘটান্যরূপ অর্থের বোধ হয়। অপরদিকে ‘ঘট’ পদটি লাক্ষণিক অর্থের তাৎপর্যের গ্রাহক। সুতরাং ‘ঘটাদন্যঃ’ বাক্য থেকে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ঘটান্যত্বপুরস্কারে ঘটের স্মরণাত্মক বোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে, কোন বিশিষ্ট বোধ (শাব্দবোধ বা অনুমিতি) উৎপন্ন হয় না। এইরূপ অভিমতের বিরুদ্ধে বলা যায় বিশিষ্ট অর্থের বোধক বাক্যস্থলে যদি একটি পদের বিশিষ্ট অর্থ স্বীকার করা হয় তা হলে ‘ঘটঃস্তি’ ইত্যাদি সকল বাক্যস্থলেও বিশিষ্ট অর্থের অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট ঘটের স্মরণ স্বীকার করতে হবে। ফলে ‘অস্তিত্ববিশিষ্ট ঘট’ – এই আকারের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বাক্যার্থবোধ স্বীকার করা যাবে না। অর্থাৎ বাক্যার্থবোধের বা অন্বয়বোধের অপলাপের প্রসক্তি হতে পারে। সুতরাং ‘ঘটাদন্যঃ’ ইত্যাদি বাক্যজন্য লক্ষণার দ্বারা ঘটান্যত্বপুরস্কারে ঘটান্যের বিশিষ্ট স্মৃতি

---

[৩] “পরেষান্তু ভেদো ঘটপ্রতিযোগিতাকস্তত্সাকাঙ্ক্ষান্যপদস্মারিতত্বাদিরীত্যা অনুমিত্যা ন তন্নির্বাহঃ, পক্ষবিধয়াঽন্যত্বস্য ভানেঽপ্যন্যত্বপ্রকারেণান্যস্য তত্রাভানাত্।” – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৯।

উৎপন্ন হবে, বাক্যার্থবোধরূপ বিশিষ্ট অনুভব হবে না – বৈশেষিকগণের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।[৪]

'ঘটাৎ ভিন্ন' – এই প্রকার বাক্য থেকে যে অন্বয়বোধ বা, বাক্যার্থবোধই হয়, অনুমিতি হতে পারে না তার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে আরও বলা যায়, 'ঘটাৎ ভিন্ন' – এখানে বিশেষ্যের কোনো উল্লেখ নেই। তাই সেই বিশেষ্যটির বিশেষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্য নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তাই এখানে অনুমান সম্ভব নয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝানো যায়। যেমন, আমরা যখন পর্বতে বহ্নির অনুমান করে বলি "পর্বতঃ বহ্নিমান্" অর্থাৎ পর্বতে বহ্নি আছে তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে যা বোঝাতে চাই তা হলো: পর্বতত্বাবচ্ছিন্ন পর্বতে বহ্নি আছে। অর্থাৎ অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ্যের উল্লেখ আবশ্যক এবং উক্ত বিশেষ্যটির বিশেষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্য নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। যদিও বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে তার আবশ্যকতা নেই। যদি কেউ বলেন, অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ্যতা নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান স্বীকার করবো না, তাহলে তার উত্তরে বলা

---

[৪] "নচ, তত্রান্যপদমেব ঘটান্যত্বপ্রকারেণ ঘটান্যস্য লক্ষকম্, ঘটাদিত্যস্য ব্যর্থতাপত্তেঃ, অন্যথা, ঘটোঽস্তীত্যাদাবপি ঘটাদিপদস্যৈবাস্তিত্বাদিবিশিষ্টঘটাদিলক্ষকত্বসম্ভবাত্, তত্রাপি অস্তিত্বঘটয়োঃ অন্বয়বোধাপলালাপত্তেঃ.....।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৯।

তত্ত্বচিন্তামণিতেও এই পক্ষ উত্থাপিত হয়েছে।

যায়, অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ্যতা নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান যদি না মানা হয়, তাহলে পক্ষের দোষ বা, হেত্বাভাস স্বীকার করা যাবে না।

সুতরাং বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুসারে বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলে 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যজন্য বোধের উপপাদন সম্ভব নয়।[৫] অতএব সাকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদার্থের উপস্থিতি মূলে তৎ তৎ পদার্থের সংসর্গ বিষয়ক যে বিশিষ্ট বোধ উৎপন্ন হয় তা প্রত্যক্ষত্বাদি বিলক্ষণ শাব্দত্বজাত্যবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রমিতি। এই আকারের শাব্দবোধ সম্ভব হলেও এই আকারের অনুমিতি কখনোই সম্ভব নয়। সেই কারণে বাক্যার্থবোধকে অনুমিতি স্বরূপ বলা যাবে না।

নৈয়ায়িক মতের সপক্ষে আরও বলা যায় যে, নৈয়ায়িকগণের যে ব্যাখ্যা তা লৌকিক বাক্যের ক্ষেত্রেও যা, বৈদিক বাক্যের ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং সেখানে একটা সঙ্গতি বা, সামঞ্জস্য বা অভিন্নতা আছে। কিন্তু বৈশেষিকগণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁদের দর্শনের পূর্বস্বীকৃতির সাথে বিরোধিতা দেখা দেয়। ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত। অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান অভ্রান্ত এবং সর্ববিষয়করূপে স্বীকৃত হয়েছে। তার থেকে ঈশ্বরের সর্ববিষয়ে জ্ঞানপূর্বকত্বও অনিবার্যভাবে প্রতিপাদিত হয়। ইতিপূর্বে পদপক্ষক অনুমানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল যে, বৈদিক বাক্য শ্রবণের অনন্তর যদি পদপক্ষক অনুমান স্বীকার করা হয়

---

[৫] ভট্টাচার্য, গোপিকা মোহন, ১৯৭৭, "শাব্দবোধ অ্যাস এ সেপারেট টাইপ অফ প্রমা", *জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি,* ভল্যুম – ৫: পৃষ্ঠা ৮২।

তাহলে বলতে হবে, এই বাক্য থেকে শ্রোতার, বক্তার বাক্যার্থ জ্ঞানের অনুমান হয়। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ; যিনি সর্বজ্ঞ তিনি বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞানবান এটির দ্বারা অভিনব কোনো জ্ঞান হচ্ছে না। কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, ঈশ্বরের বাক্যার্থ জ্ঞানের জ্ঞান অনুমানের সাহায্যে স্বীকার করার কোনো আবশ্যকতা আছে কী? উপরন্তু জীবের পক্ষে ঈশ্বরের জ্ঞানকে জানা কতোটা সম্ভব সেই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়।

নৈয়ায়িকগণের মতে বৈশেষিকগণ যদি বাক্যার্থবোধকে সাকাঙ্ক্ষপদজন্যত্বরূপ লিঙ্গজন্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে তাঁদের প্রথমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বাক্যার্থবোধ অনুমিতি। কারণ, বাক্যার্থবোধ অনুমিতিরূপে সিদ্ধ হলে তবেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বাক্যার্থবোধ সাকাঙ্ক্ষপদজন্যত্বরূপ লিঙ্গজন্য। অর্থাৎ আগে বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব সিদ্ধ হলে তবেই সেই অনুমিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ কী? উক্ত অনুমিতির লিঙ্গ বা, হেতু কোনটি? তা অনুসন্ধানের প্রসঙ্গ উঠতে পারে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে বৈশেষিকগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করার চেষ্টা করলেও তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত সম্ভাব্য আপত্তি উপস্থাপিত হতে পারে তার সমাধান বৈশেষিক পক্ষ থেকে কতদূর সম্ভব সেই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। যদি বৈশেষিকমতে বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিবিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলেই সেই অনুমিতির পক্ষে হেতুর অনুসন্ধান সম্ভব।[৬] কিন্তু বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্বই সিদ্ধ

[৬] "বস্তুতো বাক্যার্থবোধস্য অনুমিতিত্বে সত্যেব সাকাঙ্ক্ষপদজন্যত্বাদিলিঙ্গকত্বং কল্প্যম্, ...।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৩।

না হওয়ায় তার পক্ষে প্রয়োজনীয় লিঙ্গের অনুসন্ধানের কোনও অবকাশ নেই। তাই নৈয়ায়িকগণ প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে বাক্যার্থবোধ অনুমিতি নয়।

কেউ বলতে পারেন, শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে মানি না। শব্দ তেমন বিষয়েই প্রবৃত্ত হয় যে বিষয়টি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত। অতএব, শব্দ হলো অনুবাদক; অর্থাৎ জ্ঞাতের জ্ঞাপক, তাই শব্দকে প্রমাণ বলা যায় না। অর্থাৎ শব্দ প্রমাণ দ্বারা আমাদের সেই বিষয়ের বোধ হতে পারে না, যা ইতিপূর্বেই প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হয়নি। সুতরাং শব্দ প্রমাণের নিজস্ব কোনো বিষয় নেই। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ একথা স্বীকার করতে পারেন না। কেননা, ন্যায়মতে পদার্থসংসর্গবোধ বাক্য শ্রবণ হেতুই উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ জ্ঞাত হলেও পদার্থ সংসর্গ কিন্তু অজ্ঞাত। পদার্থ সংসর্গ তাঁদের মতে কোনও পদগম্য নয়। তা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা জ্ঞাত। পদগুলির আনুপূর্বী দ্বারা পদার্থ সংসর্গ নির্ধারিত এবং জ্ঞাত হয়। এই অর্থে বাক্যার্থবোধ অনুবাদক নয়।

শাব্দবোধের বিশিষ্টতা এই অংশে যে, শাব্দবোধ নিয়ন্ত্রিতার্থ। বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে বক্তা যে ক্রমে শব্দপ্রয়োগ করছেন, সেই ক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতরূপেই শ্রোতার বাক্যার্থবোধ হবে; যদিও প্রত্যক্ষ বা অনুমিতির ক্ষেত্রে এই প্রকার নিয়ন্ত্রিতার্থে জ্ঞান লাভ হয় না। যেমন, 'সুরভি চন্দনম্' – এই স্থলে 'সুরভি' হলো বিশেষণ এবং 'চন্দন' হলো বিশেষ্য। আবার, 'চন্দনে সৌরভ' – এই স্থলে কিন্তু 'চন্দন' হলো বিশেষণ এবং 'সুরভি'

হলো বিশেষ্য। পদ ও পদার্থের বোধ প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির দ্বারা সম্ভব হলেও পদ – পদার্থের অন্বয় বা সংসর্গবোধ কিন্তু আকাঙ্ক্ষাভাস্য।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি বাক্য শ্রবণ হেতুক উৎপন্ন জ্ঞান জন্য শ্রোতা প্রবৃত্ত হয়। বাক্যার্থ বিষয়ে শ্রোতা অবগত হন এবং সেই জ্ঞান অনুসারে প্রবৃত্ত হন। জ্ঞানের আশ্রয় ও প্রবৃত্তির আশ্রয় অভিন্ন। কিন্তু বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান শ্রোতার প্রবৃত্তির কারণ কী করে হবে? উপরন্তু বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান আছে জানা সত্ত্বেও শ্রোতার বাক্যার্থ বিষয়ে প্রবৃত্তি নাও হতে পারে। কিন্তু নৈয়ায়িকের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা নেই। কেননা ন্যায়মতে যে বস্তু যে ধর্মবিশিষ্ট, সেই ধর্মকে প্রকার করে সেই বস্তুকে বিশেষ্য করে যে জ্ঞান হয় তাই বস্তু বিষয়ে প্রবৃত্তির জনক। ফলে এক্ষেত্রে সামানাধিকরণ্য আছে। এই পক্ষে বৈশেষিক মতের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করা যায় সেই আপত্তির অবকাশ নেই। এই কথা স্বীকার করলে বৈশেষিকমতে বাক্যার্থের জ্ঞান কখনোই কর্মের প্রবর্তক হতে পারবে না। কারণ বৈশেষিকমতে বস্তু যে ধর্মবিশিষ্ট, সেই ধর্মকে প্রকার করে বক্তার বাক্যজন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তা বক্তার বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান দেয়। তাতে বক্তার জ্ঞানের বিষয়ে বর্তমান ধর্ম প্রকার হয় না। বস্তুতঃপক্ষে বৈশেষিক মতে বাক্যার্থ জ্ঞান কোনও রকমেই প্রবর্তক হতে পারে না। সুতরাং হয় স্বীকার করতে হয় বাক্যার্থের জ্ঞানজন্য প্রবৃত্তি হয় না অথবা বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মত স্বীকার্য নয়। এই অসুবিধে কিন্তু ন্যায়মতে প্রবৃত্তির জনক রূপে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সেই জ্ঞান স্বীকার পক্ষে নেই। সেই জ্ঞান কিন্তু বাক্য শ্রবণ

হেতু উৎপন্ন অতিরিক্ত শাব্দবোধই। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মত বাক্যার্থজ্ঞান জন্য উৎপন্ন প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। অপরপক্ষে, বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়মত কিন্তু এই প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে, এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য – এই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে কি?

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা আরও দেখি যে কোনও বাক্য প্রযুক্ত হলে শ্রোতা সেই বাক্য শ্রবণ জন্য জ্ঞান বিশেষ লাভ করেছেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় তিনি কীভাবে উক্ত বিষয়টি জানলেন? তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতা উত্তর দেন, শব্দের সাহায্যে বা, বাক্যের সাহায্যে তিনি উক্ত জ্ঞান লাভ করেছেন। কাজেই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার দ্বারা এটিই প্রতিপাদিত হয় যে বাক্যার্থবোধ, শব্দ তথা বাক্য শ্রবণজন্যই উৎপন্ন হয়েছে। তাই 'বাক্যার্থবোধ অনুমিত্যাত্মক' – একথা প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সেই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়।

প্রশ্ন হতে পারে – বাক্যশ্রবণজন্য উৎপন্ন বাক্যার্থবোধের স্বরূপ কী? এর উত্তরে বলা যায় যে কোনো বোধের স্বরূপ নির্ধারণের উপায় হল ঐ বোধ বিষয়ক অপর একটি বোধ বা অনুব্যবসায়। সুতরাং, বাক্যার্থবোধের স্বরূপও অনুব্যবসায়ের দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব। নৈয়ায়িক বলেন, 'গৌরস্তি' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতার যে বোধ উৎপন্ন হয় সেটি যদি অনুমিতি হোত তাহলে আমাদের 'অস্তিত্বেন গামনুমিনোমি' বা 'অস্তিত্বেন গৌরনুমিতঃ' এই আকারের অনুব্যবসায় হোত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় 'গৌরস্তি'

ইত্যাদি বাক্য শ্রবণজন্য শ্রোতার যে বোধ উৎপন্ন হয় সেই বোধকে বিষয় করে 'অস্তিত্বেন গাং শাব্দয়ামি' অথবা অস্তিত্বেন গৌঃ শ্রুতঃ'[৭] এই আকারের অনুব্যবসায় হয়, 'অস্তিত্বেন গামনুমিনোমি' বা 'অস্তিত্বেন গৌরনুমিতঃ' এই আকারের নয়।[৮] বৈশেষিকগণ 'অস্তিত্বেন গামনুমিনোমি' এই আকারের অনুব্যবসায়কে ভ্রান্ত অনুভবও বলতে পারেন না। কারণ, উক্ত অনুভবের বাধক কোন প্রমাণ অনুভবসিদ্ধ নয়।[৯] সুতরাং, 'গৌরস্তি' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করলে শ্রোতার যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় সেই বোধ বিষয়ে 'অস্তিত্বেন গাং শাব্দয়ামি' অথবা অস্তিত্বেন গৌঃ শ্রুতঃ' – এই আকারের অনুব্যবসায় হলো প্রমাণ। অর্থাৎ 'অস্তিত্বেন গৌর্ন (গৌঃ ন) অনুমিতঃ' – এইরূপ অনুমিতিবিষয়ক অনুব্যবসায়ের প্রতিকূল বাধক জ্ঞান থাকায় বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে গণ্য করা যায় না। বৈশেষিকগণ বলতে পারেন 'গৌরস্তি' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করলে শ্রোতার যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় সেই বোধ বিষয়ে 'অস্তিত্বেন গামনুমিনোমি' বা 'অস্তিত্বেন গৌরনুমিতঃ' – এই আকারের অনুব্যবসায়ই হয়, 'অস্তিত্বেন গাং শাব্দয়ামি' অথবা

---

[৭] 'অস্তিত্বেন গৌঃ শ্রুতঃ' এই অনুব্যবসায় প্রকাশক বাক্য ঘটক 'শ্রু' ধাতুর দ্বারা এখানে শ্রবণেন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষকে বোঝানো হয় নি, বরং শাব্দবোধকে বোঝানো হয়েছে। এর সপক্ষে শ্রৌত প্রমাণ প্রদর্শন করতে গিয়ে জগদীশাচার্য বলেছেন – "'শ্রোতব্য মন্তব্য' ইত্যাদিপ্রয়োগদৃষ্ট্যা শাব্দত্বস্যাপি শৃণোতেঃ শক্যতাবচ্ছেদকত্বাৎ'। – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৪।

[৮] "অস্তিত্বেন গাম্ অনুমিনিমীত্যাদেরনুব্যবসায়স্য তত্র অসত্ত্বাৎ। প্রত্যুত গৌরস্তীতি বাক্যাদ্ অস্তিত্বেন গৌঃ শ্রুত ন তু অনুমিত ইত্যনুভবাচ্চ।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৩ – ৪৪।

[৯] "ন চাসৌ ভ্রান্তিঃ, বাধকাভাবাৎ" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৪।

অস্তিত্বেন গৌঃ শ্রুতঃ' – এই আকারের নয়। উক্তরূপ অনুব্যবসায়ের দ্বারাই বৈশেষিকগণ বাক্যার্থ বোধের অনুমিতিত্ব স্থাপন করেন। অর্থাৎ বাক্যার্থ বোধের উৎপত্তির পর যাঁর সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে তাঁর "অহং অনুমিনোমি" – এই আকারের অনুব্যবসায় উক্ত উৎপন্ন জ্ঞানের অনুমিতিত্বের পক্ষে প্রমাণ। অপরপক্ষে, বাক্যার্থবোধ উৎপত্তির পর নৈয়ায়িকগণ উৎপন্ন জ্ঞানের শাব্দত্বের পক্ষে "অহং শাব্দয়ামি" – এই আকারের অনুব্যবসায়কে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করেন। উভয় পক্ষই যদিও অনুব্যবসায়কে বাক্যার্থের স্বরূপ নির্ণায়ক যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কেবলমাত্র অনুব্যবসায় স্বীয় অভিমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; কেননা বাক্যার্থবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের পন্থা বিষয়ে বৈশেষিকগণ যেমন অনুব্যবসায়ের আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনই নৈয়ায়িক পক্ষেও বক্তব্য হলো যে, উক্ত জ্ঞানের স্বরূপ অনুব্যবসায়ের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং উৎপন্ন জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনুব্যবসায়ের ভূমিকা বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই বিশিষ্ট নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার বাক্যার্থবোধের উৎপত্তির প্রক্রিয়া, করণ, কারণকূট এবং বাক্যার্থবোধের স্বরূপ – এই সবই যে অনুমিতির থেকে ভিন্ন তা প্রমাণ করার জন্য যুক্তি দিয়েছেন। বর্তমান গবেষণাপত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, কেবলমাত্র অনুব্যবসায় যে উৎপন্ন জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারকরূপে গৃহীত হতে পারবে না শুধু তাই নয়, উপরন্তু উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হবে তার যথাযথ সমাধান যে পক্ষের দিক থেকে করা যাবে, তার বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্যরূপে

গৃহীত হবে। সম্ভবতঃ এই বিষয়টিই জগদীশ তর্কালঙ্কার বলতে চেয়েছেন, যখন তিনি "বিশিষ্টমতেরানুভবিকত্বাদন্যথানুমিতেরপ্যপলাপাপত্তেঃ..." – এইরূপ উক্তি করেছেন।[১০] এক্ষেত্রে বৈশেষিক মতের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সম্ভব, তাদের যথাযথ উত্তর বৈশেষিক পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব কি না, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার ন্যায়মতের বিরুদ্ধেও সেই সকল আপত্তির অবকাশ আছে কি না সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। উভয় মতের সবিচার পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাক্যার্থের স্বরূপ বিষয়ে আমি নৈয়ায়িকের মতকেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি। অন্য ভাষায় বাক্য শ্রবণজন্য বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত শাব্দবোধ বলে গণ্য করতে হবে – এই পক্ষকেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি।

[১০] জগদীশ তর্কালঙ্কার, *শব্দ শক্তি প্রকাশিকা* (প্রথম খণ্ড), মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ১৪।

উপসংহার

সম্পূর্ণ আলোচনার ভিত্তিতে কিছু বক্তব্যের উপস্থাপনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। বৈশেষিকসম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপ এবং পদ পক্ষক ও পদার্থপক্ষক অনুমানের স্বরূপ পর্যালোচনার পর আমরা আলোচনার প্রথমাংশে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম যে বৈশেষিক দর্শনে বাক্যার্থবোধকে অনুমান বলে স্বীকার করার দরুণই কি পরার্থানুমান স্বীকৃত হয়েছে অথবা এই দুই স্থলে অনুমানের স্বরূপ ভিন্ন তার উত্তর এইভাবে উপস্থাপনা করতে পারি –

বাক্যশ্রবণ জন্য বাক্যার্থের অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানের স্বরূপ পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক অনুমানের দ্বারা যেরূপে উপস্থাপিত হয়েছে সেই স্থলগুলি বস্তুতঃ পরার্থানুমানের স্থল থেকে ভিন্ন। বাক্যশ্রবণজন্য যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়, তাকে বৈশেষিক অনুমিতিরূপে স্বীকার করেন। আবার পরার্থানুমিতিও যে বাক্যশ্রবণ হেতুক উৎপন্ন হয়ে থাকে একথাও বৈশেষিক সমর্থন করেন। তবে উক্ত বাক্যার্থবোধ এবং পরার্থানুমিতির স্বরূপগত কিছু পার্থক্য আছে বলে তাঁরা মনে করেন। কেননা, বাক্যার্থবোধের অনুমিতি এবং পরার্থানুমিতি – এই উভয় ক্ষেত্রে শব্দের পৃথক্ পৃথক্ ভূমিকা স্বীকৃত হয়ে থাকে। বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে শব্দ অনুমানের অঙ্গরূপে (যেমন – কখনও পক্ষরূপে আবার, কখনও বা ব্যাপ্তির আশ্রয় তথা হেতুরূপে) ভূমিকা পালন করে

থাকে। অপরপক্ষে, পরার্থানুমিতির ক্ষেত্রে শব্দ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বজন্য শ্রোতার অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হতে সহায়তা প্রদান করে।

ইতিপূর্বে আমরা নৈয়ায়িকগণকে অনুসরণপূর্বক বৈশেষিকগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক অনুমানের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয় তার আলোচনা করে এসেছি এবং ঐ আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, "বাক্যার্থবোধ হলো অনুমিতিবিশেষ" – এইরূপ বৈশেষিক অভিমত প্রশ্নাতীত নয়।

সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি বাক্যার্থের জ্ঞানের যথাযথ গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হয় তবে সেক্ষেত্রে দুটির মধ্যে কোন্‌টি স্বীকার করলে লাঘব পক্ষ রূপে বিবেচিত হবে – এই প্রশ্নের অবকাশ থাকে। কিন্তু বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক পক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলির কতদূর যথাযথ উত্তর প্রদান সম্ভব তা কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়। তার বিরুদ্ধে নানা আপত্তির অবকাশ বিদ্যমান। এমতাবস্থায় বাক্যার্থবোধের স্বরূপ স্বীকার পক্ষে বৈশেষিক প্রদত্ত লাঘব যুক্তি কতোটা কার্যকর হবে – এই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়।

ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকার করা হয়েছে যে, বক্তার উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ হেতুক শ্রোতার বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ঐ জ্ঞান শ্রোতাকে কর্মে প্রবৃত্ত

করে। এবং আমরা দেখেছি উভয় মতেই কিন্তু প্রবৃত্তি বিষয়ক মতকে জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা কখনওই প্রবৃত্তির আলোচনা নিরপেক্ষভাবে করা সম্ভব নয়।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয়েই কোনও জ্ঞানের স্বরূপ অনুব্যবসায়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় – এই কথা স্বীকার করবেন। নৈয়ায়িক মতে বাক্যার্থের জ্ঞান শাব্দবোধ ও বৈশেষিক মতে বাক্যার্থবোধ অনুমিতি রূপে অনুব্যবসায়ে জ্ঞাত হয়। এক্ষেত্রে উৎপন্ন অনুব্যবসায়ের আকার হবে নৈয়ায়িক মতে, "অহং শাব্দয়ামি" অথবা, "আমার শাব্দবোধ হয়েছে" – এই আকারের। অপরপক্ষে, বৈশেষিক স্বীকৃত উক্ত অনুব্যবসায়ের আকার হবে "অহং অনুমিনোমি" বা, "আমি অনুমান করেছি"। কিন্তু কোনও জ্ঞান একইসঙ্গে শাব্দবোধ ও অনুমিতিরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না – এই বিষয়ের উল্লেখ আমরা আগেই করে এসেছি। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে কেবলমাত্র অনুব্যবসায় বাক্যার্থবোধের স্বরূপ নির্ধারক রূপে গৃহীত হতে পারে কি? কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে কেবলমাত্র অনুব্যবসায়কে উৎপন্ন জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় পক্ষে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলে গ্রহণ করলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এই ক্ষেত্রে উভয়েরই বিরোধী অনুব্যবসায় হচ্ছে। কিন্তু কারও পক্ষেই অপরের এরকম অনুব্যবসায় হতে পারে না এরূপ আপত্তি করা সম্ভব না। অথচ উভয়কে সত্য বলে মেনে নিলে বাক্যার্থের জ্ঞানকে একইসঙ্গে শাব্দ ও অনুমিতি বলে মেনে নিতে হয়। তাও সম্ভব নয়। তাই সেই স্থলে দুটি পক্ষের দিক

থেকেই স্বীকার করতে হবে যে উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই বহু আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার অবকাশ আছে। সেই আপত্তিগুলির যথাযথ উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র অনুব্যবসায় দ্বারা নিজ পক্ষ সমর্থনযোগ্য হবে না। সম্ভবতঃ এই বিষয়টিই জগদীশ তর্কালঙ্কার বলতে চেয়েছেন, যখন তিনি "বিশিষ্টমতেরানুভবিকত্বাদন্যথানুমিতেরপ্যপলাপাপত্তেঃ..." – এইরূপ উক্তি করেছেন।[১]

---

[১] – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দ শক্তি প্রকাশিকা* (প্রথম খণ্ড), মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ১৪।

অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মুখোপাধ্যায় জগদীশের উক্তিটিকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন –

But following Phaṇibhūṣaṇa Tarkavāgīśa one may say that according to the Vaiśeṣika–s every śabda jñāna is apprehended in second order perception as anumiti (cf. Phaṇibhūṣaṇa first edition Vol. 2, p.280). A Naiyāyika, however, would still offer the argument which Jagadīśa noted in the passage "Viśiṣṭamaterānubhavikatvāt anyathā anumiterapyapalapāpatteḥ" (Jagadīśa 1973, p. 7). I would therefore suggest that a more reasonable formulation of the Vaiśeṣika position would be that we do indeed have anuvyavasāya or second order perception of the form "śābdayāmi". But since strong reasons are there to the contrary this experience (or, the form of it) cannot be taken literally. It is to be carefully analysed before it can be accepted as an evidence (pramāṇa) for certain distinct objective property (śābdatva) of a distinct kind of experience (called śābda). Thus we do not admit darkness to have movement even though taken apparently and in its face value the experience "Tamaścalati", seems to reveal such a thing. – মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত কুমার, ১৯৯১, *দ্য ন্যায় থিওরি অফ লিঙ্গুয়িস্টিক পারফরমেন্স (এ নিউ ইন্টারপ্রিটেশন অফ তত্ত্বচিন্তামণি)*, কলকাতা: কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী (ফর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি), পৃষ্ঠা: ৩৫৫।

গ্রন্থপঞ্জী

অন্নং ভট্ট, ২০১১, *তর্কসংগ্রহ [কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৮৭] (উইথ ন্যায়বোধিনী অফ গোবর্ধন মিশ্র, বাক্যবৃত্তি অফ মেরু শাস্ত্রী, নিরুক্তি অফ জগন্নাথ শাস্ত্রী, পট্টাভিরামটিপ্পণী অফ পট্টাভিরাম শাস্ত্রী) অ্যান্ড তর্কসংগ্রহদীপিকা অফ অন্নমভট্ট (উইথ রামরুদ্রীয় অফ রামরুদ্র, নৃসিংহপ্রকাশিকা অফ রায় নরসিংহ শাস্ত্রী, নীলকণ্ঠপ্রকাশিকা অফ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী অ্যান্ড পট্টাভিরামপ্রকাশিকা অফ পট্টাভিরাম শাস্ত্রী),* শ্রী সৎকরিশর্মা বঙ্গীয় (সম্পাদিত), বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান।

অন্নং ভট্ট, ২০১৩, *তর্কসংগ্রহ (উইথ তর্কসংগ্রহদীপিকা অফ অন্নমভট্ট, ন্যায়বোধিনী অফ গোবর্ধন মিশ্র, পদকৃত্য অফ চন্দ্রজ সিংহ, অ্যালঙ্গ উইথ কারিকাবলী, ন্যায়পদার্থকোশ, ভেরিয়াস নোটস অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিক্স),* শ্রী গোবিন্দাচার্য্য (সম্পাদিত), বারাণসী: চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন।

অন্নং ভট্ট, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, *তর্কসংগ্রহ,* শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

ইনগালাল্লি, আর. আই., ২০০৬, "ইনডিপেনডেন্স অফ শব্দপ্রমাণ (টেস্টিমোনি অ্যাজ অটোনোমাস সোর্স অফ নলেজ)" ইন *শাব্দপ্রমাণ ইন ফিলোজফি,* মুকুলিকা

ঘোষ অ্যান্ড ভাস্বতী ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী (এডিটেড), নিউ দিল্লি: নর্দান বুক সেন্টার, পেজেস: ৯০-৯৭।

উত্তমূর শ্রীবীররাঘবাচার্য্য, ১৯৫৮, *কণাদমুনিপ্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ শ্রীবীররাঘবাচার্য্যবিরচিত রসায়ন টীকাসহ,* ম্যাড্রাস: শ্রীবৎস প্রেস।

উদয়নাচার্য, ১৯৩৮, *ন্যায়পরিশিষ্ট, বর্দ্ধমান উপাধ্যায় রচিত প্রকাশ টীকাসহ,* নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড।

উদয়নাচার্য, ১৯৯৬, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ ন্যায়বার্ত্তিতাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলসফিক্যাল রিসার্চ।

উদয়নাচার্য, ১৯৬৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ ন্যায়বার্ত্তিতাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), বৈশালী: প্রাকৃত জৈন ইন্সটিটিউট।

উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী,* নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯০, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (শব্দপ্রামাণ্যবাদাদি উচ্ছন্ন – প্রচ্ছন্নবাদান্ত) শব্দখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি *'রহস্য'* বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ভল্যুম – IV : পার্ট 1), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), দিল্লী: ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯০, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (শব্দপ্রামাণ্যবাদাদি উচ্ছন্ন – প্রচ্ছন্নবাদান্ত) শব্দখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি *'রহস্য'* বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ভল্যুম – IV : পার্ট 2), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), দিল্লী: ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯০, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (অনুমিত্যাদি-বাধান্ত) অনুমানখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি *'রহস্য'* বাই শ্রী মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ভল্যুম – II : পার্ট 1), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), দিল্লী: ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯০, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (ভল্যুম – II) অনুমানখণ্ড* উইথ এক্সট্রাক্টস্ ফ্রম দ্য কমেন্টারিস বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ অ্যান্ড জয়দেব মিশ্র, পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ডং*, শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯৭, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি শব্দখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি *'রহস্য* বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ভল্যুম – IV : পার্ট 2), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), কলিকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোস্যাইটি অফ বেঙ্গল।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৮৯০ শকাব্দাঃ, *সামান্য-নিরুক্তি প্রকরণ* উইথ দ্য দীধিতি টীকা অফ রঘুনাথ শিরোমণি অ্যান্ড টীকাভাষ্য অফ জগদীশ তর্কালঙ্কার (দীধিতি ব্যাখ্যা) অ্যান্ড "তাৎপর্য দীপিকা" অফ যাদবেন্দ্রনাথ রায় ন্যায়তর্কতীর্থ দেবশর্মা, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

কর, গঙ্গাধর, ২০০৬, "দ্য জেনেসিস অফ এ ভার্বাল কগনিশন অ্যান্ড দ্য টেম্পোরাল সিকোয়েন্স অফ ইটস্ অ্যান্টসিডেন্টস্" ইন *শব্দপ্রমাণ ইন ফিলোজফি,* মুকুলিকা ঘোষ অ্যান্ড ভাস্বতী ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী (এডিটেড), নিউ দিল্লি: নর্দান বুক সেন্টার।

কর, গঙ্গাধর, ২০০৩, *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা,* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

কবিরাজ, গোপীনাথ, ১৯৮২, *দ্য হিস্টোরি অফ বিবলিওগ্রাফি অফ ন্যায় বৈশেষিক লিটরেচার,* বারণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি।

কিথ, আর্থার বেরিয়েডেল, ১৯৭৭, *ইন্ডিয়ান লজিক অ্যান্ড অ্যাটোমিসম্,* নিউ দিল্লী: ওরিয়েন্টাল বুকস্ রিপ্রিন্ট কর্পোরেশন।

কেশবমিশ্র, ২০০৮, *তর্কভাষা,* শ্রী গঙ্গাধরকর ন্যায়াচার্য (বঙ্গানুবাদক ও বিবৃতিকার), প্রথম খণ্ড, কলকাতা: সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা শহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী।

গিলন, এস. (সম্পাদিত), ২০১০, *লজিক ইন আরলিয়েস্ট ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়া,* দিল্লী: মোতিলাল বানারসিদাস পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড।

গুহ, দীনেশ চন্দ্র, ২০১৬, *নব্য ন্যায় সিস্টেম অফ লজিক (বেসিক থিওরিস অ্যান্ড টেকনিকস),* দিল্লী: মোতিলাল বানারসিদাস পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড।

গৌতম, ১৯৪৪, *ন্যায়দর্শনম্ (বাৎস্যায়নভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা ও বিশ্বনাথকৃত বৃত্তিসহ),* তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড।

চক্রবর্ত্তী, অরিন্দম, ১৯৯৪, “টেলিং অ্যাস লেটিং নো” ইন *নোয়িং ফ্রম ওয়ার্ডস্ ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফিলোজফিকাল অ্যানালিসিস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড টেস্টিমোনি,* বিমলকৃষ্ণ মোতিলাল অ্যান্ড অরিন্দম চক্রবর্তী (এডিটেড), ডর্ডরেচট, দ্য নেদারল্যান্ডস: ক্লুয়ার অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স।

চক্রবর্তী, তপন কুমার, ২০১৪, “শব্দ, শব্দশক্তি ও শক্তিগ্রহোপায়”, ইন *ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা,* রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তলা ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কোলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

চট্টোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ (সাধারণ সম্পাদক), ২০০৩, *হিস্টোরি অফ সাইন্স, ফিলোজফি অ্যান্ড কালচার ইন ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন,* (ভল্যুম ২ পার্ট ৪), *অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বৈশেষিক সিস্টেম* বাই অনন্তলাল ঠাকুর, দিল্লী: প্রজেক্ট অফ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়ান সাইন্স, ফিলোজফি অ্যান্ড কালচার (পি. এইচ. আই. এস. পি. সি.), সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সিভিলাইজেশনস।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ১৮৮৭, *কণাদমহর্ষি–প্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্যসমেতম্,* কলিকাতা: সেরপুরনিবাসী শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।

চন্দ্রানন্দ, ১৯৬১, *বৈশেষিকসূত্রবৃত্তি,* মুনি শ্রী জম্বুবিজয়জী (সম্পাদিত), বরদা: ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট বরদা।

জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দ শক্তি প্রকাশিকা* (প্রথম খণ্ড), মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

জগদীশ তর্কালঙ্কার, ২০১৪, *শব্দ শক্তি প্রকাশিকা (শব্দপ্রামাণ্যনিরূপণম্),* শ্রী গঙ্গাধরকর ন্যায়াচার্য (বঙ্গানুবাদক ও বিবৃতিকার), প্রথম খণ্ড, কলকাতা: সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা শহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী।

জয়ন্তভট্ট, ১৯৭৮, ন্যায়মঞ্জরী, জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক), ভল্যুম – I, দিল্লী: মোতিলাল বানারসিদাস।

ঝালাকিকর, ভীমাচার্য্য, ১৯৭৮, *ন্যায়কোষ,* পুণা: ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ।

ঝাঁ, গঙ্গানাথ, ১৯৯৯, *দ্য ন্যায়সূত্র অফ গৌতম (উইথ দ্য ভাষ্য অফ বাৎস্যায়ন অ্যাণ্ড দ্য বার্ত্তিক অফ উদ্দ্যোতকর, উইথ নোটস্ ফ্রম বাচস্পতি মিশ্রস্ ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা, উদয়নস্ 'পরিশুদ্ধি' অ্যাণ্ড রঘুত্তমস্ ভাষ্যচন্দ্র),* ভল্যুম – ১, দিল্লী: মোতিলাল বানারসীদাস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ঝাঁ, গঙ্গানাথ, ১৯৮৪, *দ্য ন্যায়সূত্র অফ গৌতম (উইথ দ্য ভাষ্য অফ বাৎস্যায়ন অ্যাণ্ড দ্য বার্ত্তিক অফ উদ্দ্যোতকর, উইথ নোটস্ ফ্রম বাচস্পতি মিশ্রস্ ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা, উদয়নস্ 'পরিশুদ্ধি' অ্যাণ্ড রঘুত্তমস্ ভাষ্যচন্দ্র),* ভল্যুম – ২, দিল্লী: মোতিলাল বানারসীদাস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ঝা, ভি. এন., ১৯৯৬, "ন্যায় বৈশেষিক থিওরি অফ মিনিং", *অ্যানালস অফ দ্য ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট,* ভল্যুম–৭৭ নম্বর–১/৪ : পৃষ্ঠা ২৮১ – ২৮৪।

টেবার, জন এ., ১৯৯৬, "ইস ভার্বাল টেস্টিমোনি এ ফর্ম অফ ইনফারেন্স?", *স্টাডিস ইন হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোস্যাল সাইন্সেস,* ভল্যুম-III নম্বর–২ : পৃষ্ঠা ১৯ – ৩১।

পঞ্চানন তর্করত্ন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, *পরিষ্কার, বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*-এর উপর রচিত, কলিকাতা: বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রোমেসিন প্রেস।

পদ্মনাভ মিশ্র, ১৯২৫, *সেতু*, প্রশস্তপাদভাষ্য-এর উপর রচিত টীকা, গোপীনাথ কবিরাজ এবং ঢুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

প্রশস্তপাদ, ১৯৬৩, *প্রশস্তপাদভাষ্য*, বারাণসী: বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১৯৩৬, *ন্যায়পরিচয়*, যাদবপুর: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১, *ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্য* [বিস্তৃত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও টিপ্পনী সহিত] (প্রথম খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০০০ *ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্য* [বিস্তৃত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও টিপ্পনী সহিত] (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

ভট্টাচার্য, গোপিকা মোহন, ১৯৭৭, "শাব্দবোধ অ্যাস এ সেপারেট টাইপ অফ প্রমা", *জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি*, ভল্যুম – ৫: পৃষ্ঠা ৭৩ – ৮৪।

ভট্টাচার্য, পঞ্চানন, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী*র উপর *মুক্তাবলী-সংগ্রহ*, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ, *ন্যায়সূত্র-বৃত্তি*, শ্রী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), বেনারস: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু (অনুবাদক), ১৯৯৩, *অনুমানচিন্তামণি* অনুবাদ ও বিবৃতিসহ, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।

ভট্টাচার্য, শিবজীবন, ১৯৯৪, "এপিস্টেমোলজি অফ টেস্টিমোনি অ্যান্ড অথরিটি: সাম ইন্ডিয়ান থিমস অ্যান্ড থিওরিস" ইন *নোয়িং ফ্রম ওয়ার্ডস্ ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফিলোজফিকাল অ্যানালিসিস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড টেস্টিমোনি*, বিমলকৃষ্ণ মোতিলাল অ্যান্ড অরিন্দম চক্রবর্তী (এডিটেড), ডর্ডরেচট, দ্য নেদারল্যান্ডস: ক্লুয়ার অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স।

ভট্টাচার্য, শিবজীবন, ১৯৯৮, *ল্যাঙ্গুয়েজ, টেস্টিমোনি অ্যান্ড মিনিং*, নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ।

ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন, ১৯৭৮, এবং শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন কোষ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা –গ্রন্থাঙ্ক: ১১৭।

ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন, এবং শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, *ভারতীয় দর্শন কোষ* (তৃতীয় খণ্ড–প্রথম ভাগ), কলকাতা: কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা – গ্রন্থাঙ্ক: ১২১।

ভট্টাচার্য, হরিদাস, ১৯৬২, *হরিদাসী*, বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্ত শিরোমণি (সম্পাদিত), বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যভবনম।

ভরদ্বাজ উদ্দ্যোতকর, ১৯৯৭, *ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলসফিকাল রিসার্চ।

মল্লিক, ঝুমুর, ২০১৭, *দ্য বৈশেষিক থিওরি অফ নলেজ (অ্যাকর্ডিং ট্যু প্রশস্তপাদ),* কলকাতা: মহা বোধি বুক এজেন্সি।

মিশ্র, শ্যামাপদ, ২০০৯, "শাব্দবোধের প্রমান্তরত্বসিদ্ধি" ইন *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* ইন্দ্রাণী সান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা (সম্পাদিত), কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত কুমার, ১৯৯১, *দ্য ন্যায় থিওরি অফ লিঙ্গুয়িস্টিক পারফরমেন্স (এ নিউ ইন্টারপ্রিটেশন অফ তত্ত্বচিন্তামণি),* কলকাতা: কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী (ফর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি)।

মেলর, ডি. এইচ., ২০১২, *মাইন্ড, মিনিং অ্যান্ড রিয়েলিটি* এসেজ ইন ফিলোজফি, ইউনাইটেড কিংডম: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

মোহান্তি, জীতেন্দ্রনাথ, ১৯৬৬, *গঙ্গেশস থিওরি অফ ট্রুথ,* শান্তিনিকেতন: সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন ফিলোসফি বিশ্বভারতী।

মোহান্তি, জে. এন., ১৯৯৪, "ইস দেয়ার অ্যান ইররিডিউসেবল মোড অফ ওয়ার্ড–জেনারেটেড নলেজ?" ইন *নোয়িং ফ্রম ওয়ার্ডস্ ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফিলোজফিকাল অ্যানালিসিস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড টেস্টিমোনি,* বিমলকৃষ্ণ মোতিলাল অ্যান্ড অরিন্দম চক্রবর্তী (এডিটেড), ডর্ডরেচট, দ্য নেদারল্যান্ডস: ক্লুয়ার অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স।

রুচিদত্তমিশ্র, ১৯৯১, *শব্দচিন্তামণি প্রকাশ, অন দ্য শব্দখণ্ড অফ তত্ত্বচিন্তামণি,* বাই গঙ্গেশ উপাধ্যায়, সুখরঞ্জন সাহা অ্যান্ড পি. কে. মুখোপাধ্যায় (এডিটেড), ক্যালকাটা:

যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবোরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ, ২০২৩, প্রবন্ধাবলি, সৌরীন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকপ্রভা, ২০১৪, "প্রাচীন ন্যায়ে শব্দ প্রমাণ", ইন *ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা,* রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তলা ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কোলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বানী, ২০১৪, "ন্যায়মতে শাব্দবোধ প্রক্রিয়া", ইন *ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা,* রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তলা ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কোলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৯৬, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ।

বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৮২, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,* নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৩৮, *যুক্তিদীপিকা,* পুলিনবিহারী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা – ২৩, কলিকাতা: মেট্রোপলিটন্ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্।

বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ।

বিশ্বনাথ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী,* শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

বিশ্বনাথ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, *ভাষাপরিচ্ছেদ কারিকাবলী,* শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

ব্রোডি, আলেক্সান্ডার, ১৯৯৫, "ইনট্রোডকসন ট্যু মেডাইভ্যাল লজিক", *ইন ফিলসফিক্যাল রিভিউ,* ই. জে. অ্যাসওয়ার্থ (সংশোধিত), (সেকেন্ড এডিসন), ভল্যুম – ১০৪, সংখ্যা – ১ : পৃষ্ঠা ১২০–১২২।

শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার,* নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

শঙ্করমিশ্র, ১৯৭২, *আমোদ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলির* টীকা, শ্রী মহাপ্রভুলাল গোস্বামী (সম্পাদিত), দারভাঙ্গা: মিথিলা বিদ্যাপীঠ।

শর্মা, ই. আর. শ্রীকৃষ্ণ (অনুবাদক), ১৯৬০, *মণিকণা* এ নব্যন্যায় ম্যানুয়াল, ম্যাড্রাস: আড্যার লাইব্রেরী অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার।

শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদাচার্যকৃত প্রশস্তপাদভাষ্যম্ [পদার্থধর্মসংগ্রহ] ন্যায়কন্দলী টীকাসহিত,* দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ১৯৭১, *এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লজিক,* দিল্লী: মোতিলাল বানারসীদাস।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ১৯৯৩, *গৌতমীয় ন্যায়সূত্র,* দিল্লী: মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

হবহাউস, এল. টি., ১৮৯৬, দ্য থিওরি অফ নলেজ, লন্ডন: মেথুয়েন অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড।

Signature of the Candidate with Date: